বিমল মিত্র

 উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ❋ কলিকাতা-৭

\
SAMI-STREE SAMBAD
Tales of Husband & Wife
(A twin Bengali novels)
by Bimal Mitra

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৭০

Published by—
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College Street Market.
Calcutta-7 (1st floor)

প্রতিষ্ঠাতা :
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা :
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭ (দ্বিতলে)

মুদ্রণে :
নির্মলচন্দ্র শীল
ইম্প্রেসন সিণ্ডিকেট
কলিকাতা

প্রচ্ছদ চিত্র :
অমিয় ভট্টাচার্য

স্বামী-স্ত্রী সংবাদ

অনেক গল্প আছে যার আরম্ভটা পড়লে বেশ ভাল লাগে, কিন্তু শেষে গিয়ে মেলে না। কিন্তু শেষটাই হল আসল। শেষ না ভেবে লিখলে লেখার ওই দশাই হয়। আমি একজন বিখ্যাত লেখককে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম— আপনি কি শেষটা ভেবে নিয়ে লেখেন ?

তিনি বলেছিলেন, না—

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—কেন ? শেষ না ভাবলে আপনি পাঠককে ধরে রাখবেন কী করে ? গল্পের চাবিকাঠি তো শেষেই থাকে। গল্পের শুরুতে যে গেরোটা বেঁধে দেবেন, সেই গেরোটা শেষকালে তো খুলতেই হবে। আগে থেকে সমস্তটা প্ল্যানিং করে নিলে, তবেই তো খুলতে পারবেন গেরোটাকে।

সেই বিখ্যাত লেখক বলেছিলেন—জীবন তো ফরমুলা নয় হে, আগে থেকে শেষটা ভেবে নিয়ে লিখলে গল্পটা ফরমুলা হয়ে যাবার ভয় থাকে।

আমি বলেছিলুম—কিন্তু সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা যে ফরমুলায় চলেছে। সূর্য-নিয়ম করে পূর্বে উঠে সন্ধ্যেবেলা পশ্চিমের আকাশে ডুবে যাচ্ছে। নিয়ম করে শীত পড়ছে, গ্রীষ্ম পড়ছে, বর্ষা হচ্ছে। সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্টির সমস্ত কিছুর মধ্যেই এই-ই যখন নিয়ম, তখন গল্প সৃষ্টির মধ্যেই বা কেন এই নিয়ম থাকবে না ?

তা যার যা খুশী সে সেইভাবে লিখুক, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। গল্পের একটা শেষ থাকতে হবে, এটাই আমার নিয়ম।

তাঁর নামটা বলবো না, কিন্তু কোথায় গেল সেই বিখ্যাত লেখক ? তাঁর নাম বললেও কেউ আর এখন চিনতে পারবে না। অথচ আশ্চর্য, তিনি সশরীরে বেঁচে আছেন।

কিন্তু এ তো গেল ভূমিকা। যাকে অন্য ভাষায় বলা হয় গৌরচন্দ্রিকা। আমার এ গল্প যাঁরা পড়বেন, তাঁরা এ লাইনগুলো না পড়লেও পারেন। কারণ গল্প ওতে আরম্ভ হয় নি। গল্প আরম্ভ হচ্ছে এইবার। এই আমি যখন পুরীতে গেলাম।

এমন বাঙালী খুব কম আছে যে পুরীতে দু'একবার না গেছেন।

পুরী এমনই একটা জায়গা, যা কোনও দিন পুরনো হয় না। ওখানে আমি প্রায় পনেরো-ষোল বার গিয়েছি। স্বর্গদ্বারের বড়-বড় হোটেল থেকে

আরম্ভ করে ছোট প্রাইভেট হোটেল পর্যন্ত সর্বত্র আমি থেকেছি। কোথাও দৈনিক পঁচাত্তর টাকা রেট, আবার কোথাও দিনে মাথা-পিছু দু'টাকা।

সেবার এমন এক হোটেলে গিয়ে উঠলাম, যার কোনও সাইনবোর্ড নেই। লোকের মুখে যে নামটি চালু, তা হল 'মাসিমার হোটেল'।

মাসিমার হোটেলের ঠিকানা আমাকে আমার এক বন্ধু দিয়েছিল। সেখানে থাকা-খাওয়ার রেট যেমন সস্তা, ব্যক্তিগত সেবা-যত্নও তেমনি পাওয়া যায় অজস্র। ছোট সরু গলির মধ্যে একতলা বাড়ি। ভেতরে সাতটা কি আটটা ঘর। দেখাশোনা করেন একজন মহিলা। তাঁকে সবাই 'মাসিমা' বলেই ডাকে। কী যে তার নাম, তা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না।

মহিলা নিজের হাতে রান্না করেন, নিজে সামনে বসে প্রত্যেককে খাওয়ান। জোর করে আপনাকে পেট ভরে খাওয়াবেন। যতক্ষণ না আপত্তি করবেন আপনি, ততক্ষণ আপনাকে জোর করে খাওয়াবেন।

আমি স্টেশন থেকে সাইকেল রিক্সা চেপে যখন সেই আসল ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সাইকেল রিক্সাওয়ালাও জানতো না যে, সেটা একটা হোটেল। কারণ বাইরে কোন সাইনবোর্ড নেই, আড়ম্বর তো নেই-ই। শুধু বাড়ীর সামনে একটা ঝাঁকড়া মাথা তুলসী গাছ। তার তলায় একটা বিরাট বেদী। দেখেই বোঝা যায়, কেউ যেন সকালবেলা ফুল-বেলপাতা দিয়ে গাছটাকে পূজো করেছে। কারণ গাছটার তলায় কয়েকটা গাঁদা ফুল আর বেলপাতা পড়ে আছে। আর গাছটার গোড়ায় সিঁদুরের কয়েক ফোঁটা তখনও লেগে আছে। গাছটাকে পূজো না করলে অমন সিঁদুরের দাগ আর ফুল-বেলপাতা পড়ে থাকে না।

রিক্সাওয়ালাই আমার স্যুটকেশ আর হোল্ড-অল্‌টা নিয়ে ভেতরের একটা ঘরে তুলে দিলে। আমার আসার খবর পেয়েই একজন মাঝ-বয়েসী মেয়েমানুষ হন্ত-দন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন—কোত্থেকে এসেছেন আপনি?

আমি বললাম—কলকাতা থেকে—

মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন—আমার ঠিকানা কোত্থেকে পেলেন?

বললাম—আমার কলকাতার এক বন্ধুর কাছ থেকে—

—তার কী নাম?

বললাম—মহেশ। মহেশ চৌধুরী—

মহিলাটির মনে পড়ে গেল। বললেন—হ্যাঁ, তিনি খুব ভালো লোক, আমার মনে আছে। এই পাঁচ-ছ'মাস আগে এসে আমার এই হোটেলে উঠেছিলেন।

বললাম—হ্যাঁ, তার কাছে আপনার প্রশংসা শুনেই আমি এসেছি—

মহিলাটি বললেন—তা'হলে তো আপনার সবই জানা আছে—

বললাম—হ্যাঁ, সবই আমার জানা আছে।

বললেন—সকাল বেলা ট্রেন থেকে নেমেছেন, চা-টা কিছুই তো পেটে পড়ে নি বোধ হয়। একটু চা করে দিচ্ছি, কিন্তু চা'য়ের সঙ্গে আপনি কী খাবেন? ছ'টো পরোটা আর আলু ভাজা করে দেব?

বললাম—না-না, ওসব কিছু করতে হবে না। শুধু চা হলেই চলবে।

মহিলাটি কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললেন—তা কখনও হয়। শুধু চা কখনও ভদ্রলোককে দেওয়া যায়? আমি নিজের হাতে তা কাউকে দিতে পারব না। তার আগে আপনি ওই কলতলায় মুখ হাত-পা ধুয়ে নিন—

তারপর বললেন—কোন্ ঘরটা আপনি বলুন ছ'টো ঘর খালি আছে—

আমি বললাম—যেটা আপনার ইচ্ছে, আমার কোনও ঘরেই আপত্তি নেই।

মহিলাটি বললেন—আমার বাড়িটা খারাপ, কোনও ঘরেই আপনি সমুদ্রের হাওয়া পাবেন না।

বললাম—আমি সব জানি। মহেশ আমাকে সমস্ত বলেছে—

একটা ঘর আমি বেছে নিলাম। ঘরের ভেতরে একটা তক্তপোষ, একটা ছোট টেবিল, হাতলহীন চেয়ার।

বললাম—আমি তো ঘরের মধ্যে শুধু রাত্তিরটুকু থাকব। আর সারাদিন বাইরে সমুদ্রের ধারে কিম্বা জগন্নাথের মন্দিরে কাটাব। রাত্তিরে বাড়ি ফিরে এসে খাব আর ঘুমোব—

মহিলাটি বললেন—রাত্তিরে আপনি কী খান? ভাত না রুটি?

বললাম—যেটা আপনার খুশী, আমার কোনও পছন্দ নেই। যা করতে আপনার কষ্ট হবে না, তাই দেবেন—বলে আমি সমুদ্রের দিকে চলে গেলাম।

সমুদ্রটা 'মাসিমার হোটেল' থেকে দূরে। গলিটা ঘুরে-ঘুরে গিয়ে দশ মিনিট হেঁটে তবে দেখতে পাওয়া যায়।

সেখানে গিয়ে দেখি তখন ঘাটে মানুষের মেলা বসেছে। মানুষের ভীড়ে সমুদ্রের জল কালো হয়ে গিয়েছে। সমুদ্রের ধারে মানুষের মাথা গিজ গিজ করছে! বেশির ভাগ দক্ষিণ ভারতের লোক। গভীর রং-এর শাড়ি পরা, তারা জগন্নাথদেবের দর্শনপ্রার্থী তীর্থযাত্রীর দল।

আমি তাদের পাশ কাটিয়ে সোজা বালি ভেঙে-ভেঙে পূর্ব দিকে চলতে লাগলাম। সেই একই দৃশ্য। প্রত্যেকবারই এসেছি আর একই দৃশ্য দেখেছি। কোথাও কোনও ব্যতিক্রম দেখি নি। তারপর যখন বেশ বেলা হয়ে এল, তখন হোটেলে ফিরে এলুম।

হোটেলে আর যারা ছিল, তারা সবাই বোধ হয় তখন মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে গেছে। এখানে নিয়ম এই যে, ভোর চারটের সময় গিয়ে জগন্নাথ

দেবকে দর্শন করবার জন্যে যাবে। পুরীতে এসে মন্দিরে দেব-দর্শন না করা অপরাধ।

মাসিমা তখন বাজার করে নিয়ে এসেছে। সংসার করতে ব্যস্ত তখন। হোটেলের দোতলার ওপর ছোট ঘর। যদিও বাড়িটা একতলা। কিন্তু নীচে থেকেই দেখতে পেলাম ওপরে ছাদের পাশেই একখানা ঘর। বুঝতে পারলুম, ওই ঘরেই মাসীমা রাতটা কাটায়। বিধবা মানুষ, তবে স্বাস্থ্য ভাল।

কিন্তু হঠাৎ একটা ছবি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মধ্যবয়সী একজন পুরুষের বুক পর্যন্ত ছবি। বেশ দামী ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো।

একটা ফুলের মালা ঝুলছে ফ্রেমের ওপর। দেখে মনে হল ফুলের মালাটা টাটকা ঝোলান হয়েছে। আমি অবাক হয়ে সেই দিকে চেয়ে আছি, দেখে মাসিমা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—কী দেখছেন?

বললাম—ওই ফটোটা দেখছি—

মাসীমা বললেন—আমার কর্তার ছবি—বলে ফটোটার দিকে চেয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করে আবার বললেন—কর্তা বড় ভাল লোক ছিলেন—

আমার বিস্ময় অন্য কারণে। বললাম—মেসোমশাই কী করতেন?

মাসিমা বললেন—কর্তা রেলে চাকরি করতেন—

সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল গোলোক মজুমদারের কথা। সেই গোলোক মজুমদার। আমি তার সঙ্গে রেলের অফিসে এক টেবিলে কাজ করতুম। সেই গোলোক মজুমদারই কি এই মাসিমার স্বামী?

অথচ···অথচ আমি তো তা জানতাম না। গোলোক মজুমদারের সঙ্গে প্রায় বারো বছর একসঙ্গে মুখোমুখি বসে চাকরি করেছি। তখন দেখছি গোলোক কাজে খুব পটু। তাড়াতাড়ি ফাইল ক্লীয়ার করতে পারত।

আমাদের রবিনসন সাহেব খুব ভালোবাসত গোলোক মজুমদারকে।

চাপরাশি দিয়ে ডেকে পাঠাত গোলোককে। গোলোক তাড়াতাড়ি দৌড়ে যেতে সাহেবের ঘরে। রবিনসন সাহেব জিজ্ঞেস করত—গোলোক—

গোলোক বলত—ইয়েস স্যার?

হাতের একটা কাগজ দিয়ে বলত—এই স্টেটমেণ্টটা করে দিতে পারবে তুমি? তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দিতে আমার ভরসা হয় না। কবেকার মধ্যে তৈরী করে দিতে পারবে বলো তো?

গোলোক জবাব দিত—আজকের মধ্যেই কী করে দিতে হবে স্যার?

সাহেব বলত—না, এখন তো বিকেল চারটে, আর একঘণ্টা মাত্র বাকি আছে ছুটি হতে। আজকে আর এটা শেষ করতে পারবে না। কালকে ফার্স্ট আওয়ারে দিলেই চলবে। এই বেলা বারোটার মধ্যে দিলেই ভাল হয়, রেলওয়ে বোর্ডে পাঠাতে হবে—

—ঠিক আছে স্যার। আমি কালকে বারোটার মধ্যে দিয়ে দেব আপনাকে।

কিন্তু মুখ বড়ই মিষ্টি ছিল গোলোক মজুমদারের। আর ওই মিষ্টি মুখের জন্যই সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিল সে। সাহেবের ঘর থেকে ফিরে এসে গোলোক মজুমদার আমাকে বলতো—মিত্তির, বড় বিপদে পড়ছি ভাই—

আমি বলতাম—কী বিপদ?

গোলোক মজুমদার বলত—আরে ভাই, সাহেব আমাকে এই স্টেটমেন্টটা করে দিয়ে যেতে বলছে—

বলতাম—কখন চাই?

গোলোক বলতো—কাল সকাল এগারোটার মধ্যে। এখন ঘড়িতে চারটে বাজে, কখন করবো বলো তো ভাই?

—কী স্টেটমেন্ট, দেখি?

দেখলাম অন্তত খুব তাড়াতাড়ি করলেও চার ঘণ্টার কম হবে না।

গোলোক মজুমদার আমার হাত দু'টো জড়িয়ে ধরত। বলতো—ভাই মিত্তির, তুমি একটু হাত লাগাবে? তোমাকে আমি কাল ক্যানটিনে এক প্লেট মাংস আর পরোটা খাওয়াব, আমাকে একটু বাঁচাও ভাই—

আমি একটু বিব্রত হয়ে পড়লাম। গোলক মজুমদারের হাত এড়ানো শক্ত ছিল। আমাকে মাংস-চপ কাটলেট খাইয়ে অনেকবার অনেক কাজ করিয়ে নিয়ে নিজে সাহেবের কাছে বাহাদুরি পেয়েছে।

গোলোক বলত—করবে তো ভাই? তুমি কথা দিলে?

আমি বলতাম—তা এখনও তো ছুটি হতে একঘণ্টা সময় আছে। তুমি ততক্ষণ নিজেই হাত লাগাও না।

গোলোক মজুমদার বলত—আরে, তা'হলে তো কোনও কথাই ছিল না? আমার যে শ্যামবাজারে একটা জরুরী কাজ আছে।

—শ্যামবাজারে তোমার আবার কী এমন জরুরী কাজ?

গোলোক মজুমদার বলত—আরে তুমি তো আর সংসার করলে না, তুমি সংসার করার জ্বালা বুঝবে কি করে? তোমার বৌদিকে নিয়ে একটা সিনেমা দেখতে হবে শ্যামবাজারে গিয়ে। সেখানে কি একটা নতুন ছবি এসেছে—

আমি চুপ করে থাকতুম। কিছু বলতে পারতুম না! বলতে গেলে গোলোকদাই আমাকে হাতে-কলমে কাজ শিখিয়েছিল। আমি যখন নতুন অফিসে ঢুকি, তখন কাজের কিছুই জানি না।

ওই গোলোকদাই আমাকে বলেছিল—মন দিয়ে কাজ করবে ভাই, কাজই হলো লক্ষ্মী। এই আজ আমাকে দেখ, সব কাজে সাহেব আমাকে ডাকে। কারণ আমি কাজ জানি। বড়বাবু রয়েছে,সবাই রয়েছে, কিন্তু আমাকে ছাড়া সাহেব কাউকে ডাকবে না, দেখে নিও—

সত্যিই গোলোকদা ছিল কাজের ঘুণ। তা সেদিন বিকেল পাঁচটা বেজে গেল। আর সবাই অফিস থেকে চলে গেল।

দু'-একজন জিজ্ঞেস করলে—কী হে, তুমি এখনও বসে আছো যে?

বললাম—গোলোকদার কাজ করছি—

একজন বললে—গোলোকের পাল্লায় পড়েছ, ওই তোমাকে ডোবাবে!

কী জানি কেন অফিসের লোকের কারোর ভাল ধারণা ছিল না গোলোক মজুমদার সম্বন্ধে। সকলের একই ধারণা গোলোক মজুমদার সম্বন্ধে। আমি রাত ন'টা পর্যন্ত অফিসে বসেই স্টেটমেন্টটা শেষ করে ফেললুম। তারপর কাগজপত্র ড্রয়ারের মধ্যে রেখে চাবি দিয়ে বাড়ি চলে গেলুম।

পরের দিন আমি ঠিক সাড়ে দশটায় অফিসে গিয়ে হাজির হয়েছি। কিন্তু গোলোকদার তখনও দেখা নাই। আধ-ঘণ্টা পরে যখন দৌড়তে-দৌড়তে এলো, তখন দেখি একেবারে ভূতের মতন চেহারা।

বললাম—এ কী গোলোকদা, তোমার এ-রকম চেহারা হলো কী করে?

গোলোকদা বললে—তোমার বৌদির শরীরটা খুব খারাপ ভাই। কাল সারা রাত তাকে সেবা করতে গিয়ে এক মিনিট ঘুমোতে পারি নি। চৌপর রাত জেগে কেটেছে—

বললাম—বৌদির কী হয়েছিল?

—আরে ভাই, তোমার বৌদি সব যা-তা খাবে, আর ভোগান্তির বেলায় সেই আমিই। রাত দুপুরে তখন ডাক্তারের বাড়ি যাই, তাকে ডেকে আনি, তখন ওষুধ দেওয়াতে ব্যথা কমে। রাত যখন চারটে তখন একটু ঘুম আসে, আর সে-ঘুম যখন ভাঙে তখন সকাল দশটা। তখন আর চান-করবার, ভাত খাবার সময় নেই। ঘুম থেকে উঠেই সোজা অফিসে চলে এলুম—

—একেবারে না খেয়ে এসেছ?

গোলোকদা বললে—আসব না? সাহেব স্টেটমেন্ট চেয়েছে বারোটার মধ্যে. সে-কথাটা মনে পড়ে গেল। তাই দৌড়ে চলে এলুম—

—তা'হলে সারা দুপুর আজ উপোস?

—না, উপোস কেন হবে। ক্যান্টিনে গিয়ে পরোটা-মাংস তোমায় নিয়ে খেয়ে নেব।

—আর বাড়িতে? বাড়িতে রান্না করবে কে?

গোলোকদা বললে—রান্না হবে না আজকে—

বললাম—রান্না না হলে চলবে কী করে? বৌদি কী খাবে?

গোলোকদা বললে—আমি সেই সন্ধ্যেবেলা বাড়ি যাবো, তখন রান্না করবে।

—তুমি রান্না করতে পারো?

গোলোকদা বললে—আরে, অর্ধেক দিন তো আমিই রান্না করি। আমি

ভাত-ডাল-চচ্চড়ি-কুমড়োর ঘন্ট-মাছের কালিয়া সব কিছু রান্না করতে পারি—আমার রান্না খেলে কেউ ভুলতে পারবে না। তোমাকে একদিন খাওয়াব, দেখবে আমার কেরামতি—

এতক্ষণে যেন কাজের কথা মনে পড়ে গেল।

বললে—যাক্ গে, ভালো কথা, আমার স্টেটমেন্ট কী হলো?

আমি স্টেটমেন্টটা বার করে দিলুম। দেখে গোলোকদার এক গাল হাসি। বললে—ফিনিশ্‌ড্?

বললাম—হ্যাঁ, কাল রাত ন'টার সময়েই শেষ করে দিয়েছিলুম –

গোলোকদা আমার পিঠ চাপড়ে দিলে।

বললে—তুমি ভাই বাহাদুর ছেলে। তুমি আমার মান বাঁচালে—

ততক্ষণে রবিনসন সাহেবের চাপরাশি এসে হাজির। এসেই বললে – গোলোকবাবুকে বড়া সাহেব সেলাম দিয়া—

গোলোকদা আমার হাত থেকে স্টেটমেন্টটা কেড়ে নিয়ে বললে—দাও-দাও, শীগগির দাও হে। কোনও ভুল-টুল নেই তো হে? দেখো, শেষকালে যেন আমি বিপদে না পড়ি—

বললাম—না-না, ভুল নেই। আমি দু'বার চেক করে দিয়েছি—

আমার কথা শেষ হবার আগেই সেটা নিয়ে গোলোকদা রবিনসন সাহেবের ঘরে গিয়ে হাজির। সাহেব বলে—এই যে গোলোক, আমার স্টেটমেন্ট রেডি?

গোলোকদা বললে—ইয়েস স্যার, রেডি।

সাহেব স্টেটমেন্টটা খুলে বললে—বাঃ, ভেরি গুড্! কখন করলে তুমি এত বড় স্টেটমেন্ট?

গোলোকদা ঝট্ করে বলে দিলে—আমি স্যার এখানে রাত ন'টা পর্যন্ত অফিসে কাজ করেছি, তারপর কাগজগুলো রাত্রে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলুম, সেখানে হোল নাইট জেগে শেষ করেছি, কালকে রাত্রে ঘুমোই নি স্যার—

—হোল নাইট কাজ করেছ?

গোলোকদা বললে—হ্যাঁ স্যার, হোল নাইট জেগে-জেগে চেকিং করেছি, পাছে যদি কোনও ভুল থাকে।

সাহেব বললে—ঠিক আছে, থ্যাঙ্ক ইউ গোলোক, আমি দেখবো তোমার জন্য কী করতে পারি—

তারপর গোলোকদা হাসতে-হাসতে ফিরে এল।

বললাম—কী হলো?

গোলোকদা বললে—রবিনসন সাহেব খুব খুশী। আমি সাহেবকে বললুম, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট মিত্তিরই সব করেছে। তোমার নামটাও আমি বলে দিলম—

বললাম—তুমি আমার নামটা করতে গেলে কেন ?

—কেন করব না ? আমি অমন নেমকহারাম নই। যার যা পাওনা, তাকে তা দিতে হবে। তুমি সব করলে আর ক্রেডিট নেব আমি ? আমি বড়বাবুর মত নই। সাহেব জিজ্ঞেস করলে—কোন মিত্তির ? আমি তোমার নাম করে দিলুম। বললাম—বি কে মিত্তির খুব কাজের ছেলে, ও এখনও বি-গ্রেডে কাজ করছে পাঁচ বছর ধরে, ওর দিকে কেউ দেখে না। ওকে প্রমোশন দেওয়া উচিত। সাহেব বললে—অল্ রাইট, আই শ্যাল সী টু ইট। আসল সাহেবের বাচ্চা তো, ও দেখো ঠিক, তোমাকে এবার নেক্সট্ গ্রেডটা দেবে—

আমি কৃতজ্ঞতায় হতবাক হয়ে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি সাহেবকে বললে ওই কথা ?

গোলক মজুমদার বললে—বলবো না ? আমি কি নেমকহারাম ? তুমি কাজ করলে আর ক্রেডিট নেব আমি ? আমি এক বাপের ছেলে, কারোর পরোয়া করি না আমি—

কিন্তু আশ্চর্য, রবিনসন সাহেবের চাপরাশি দ্বিজপদের কাছে আমি অন্য কথা শুনলাম। আমি দ্বিজপদকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম বললাম—

—তুমি তো সাহেবের ঘরে তখন ছিলে দ্বিজপদ, সাহেব কী বললে গো ?

দ্বিজপদ বললে—গোলোকবাবুর সব কথা মিথ্যে।

আমি বললাম—কেন, গোলোকবাবু রবিনসন সাহেবকে আমার কথা বলে নি ?

দ্বিজপদ বললে—না বাবু, গোলোকবাবু আপনার নামই উচ্চারণ করে নি সাহেবের কাছে গিয়ে বললেন—আমি সারারাত জেগে এটা শেষ করেছি।

আমি বললাম—ওসব কথা ছেড়ে দাও দ্বিজপদ, সব অফিসে এই-ই হয়।

দ্বিজপদ বললে—না বাবু, আমি যে নিজে দেখেছি আপনি কাল রাত্তির সাড়ে ন'টা পর্যন্ত এই চেয়ারে বসে কাজ করেছেন। কাল সাহেব অনেকক্ষণ অফিসে ছিল, তাই আমাকেও থাকতে হয়েছে—

গোলোক মজুমদারকে তবু আমি খুব ভালবাসতুম। দিলখোলা মানুষ। গোলোকদা মাঝে-মাঝে এসে বলত—কাল রাত্রে একটু মাল খেয়েছি ভাই—

—মাল ? মানে ?

গোলোকদা হাসতে হাসতে বলল—তুমি দেখছি একেবারে আনাড়ী। মাল মানেও বোঝ না ? মদ হে, মদ।

আমি বলতুম—তা হঠাৎ মদ খেলে কেন ? ওটা খাওয়া কি ভালো ?

গোলোকদা বলত—আমি তো প্রায়ই খাই। খেলে ঘুমটা ভালো হয়—

বলতুম—কিন্তু শেষকালে যদি নেশা হয়ে যায় তখন ?

গোলোকদা বলত—নেশা হলে ক্ষতি কী? ও এখন আমার ডাল-ভাত হয়ে গেছে—

—কিন্তু শেষে যদি লিভার পচে যায়? শুনেছি বেশি মদ খেলে নাকি লিভারে ঘা হয়, ক্যানসার হয়।

গোলোকদা বলত—সে তো আলোচালের ভাত খেলেও লিভারে ঘা হয় লোকে বলে। যারা বেশি ফল খায়, প্রোটিন খায় না, তাদেরও লিভারে ঘা হয়। আর তা ছাড়া একদিন তো মরতে হবেই সবাইকে, তার আগে যদ্দিন বাঁচি, একটু মৌজ করে খাই—

আমি বলতুম—কিন্তু টাকা? মদের তো শুনেছি অনেক দাম।

গোলোকদা বলত—তা আমি কি বেশি খাই হে? বেশি মদ খেলে বেশি টাকা খরচ। আর আমি তো বিলিতি খাই না, দিশি খাই, ওতে খরচা কম—

আমি তবু সাবধান করে দিতুম। বলতুম—না-না গোলোকদা, ও-সব ছাই-পাঁস না খাওয়াই ভালো। ওতে নিজের শরীরও খারাপ হয়, আবার পয়সাও নষ্ট হয়—

গোলোকদা বলতো—তুই তো বড়-বড় উপদেশ ঝাড়ছিস, তা'হলে রবিনসন সাহেব খায় কেন? সাহেবরা খেলে কোনও দোষ নেই, আর আমরা কেরাণীরা খেলেই যত দোষ?

আমি বলতুম—ওদের কথা ছেড়ে দাও, ওরা তো গরুর মাংস খায়? ওদের পেটে সব হজম হয়, আমাদের বাঙালীদের পেট কী ওই রকম?

তা সেই গোলোকদার ফটোগ্রাফ এই মাসিমার হোটেলে টাঙানো দেখে বড় অবাক হয়ে গেলাম। আবার ফটোগ্রাফের ফ্রেমের চারিদিকে ফুলের মালা জড়ানো দেখে আরো অবাক হয়ে গেলাম। গোলোকদার ছবি এই মাসিমার হোটেলে কেন এল?

মনে আছে, হঠাৎ একদিন কামাই করলে গোলোক মজুমদার।

সাধারণতঃ গোলোকদা কামাই বড় করত না। অফিস আসতে মাঝে-মাঝে লেট করতো বটে, কিন্তু তা বলে কামাই?

তার পরদিনও কামাই! রবিনসন সাহেব সেদিন ডেকে পাঠালে গোলোকদাকে। দ্বিজপদ এসে খবর দিয়ে গেল, সাহেব গোলোকবাবুকে সেলাম দিয়েছে।

আমি বিপদে পড়লাম। বড়বাবুকে গিয়ে বললাম, রবিনসন সাহেব গোলোকদাকে ডেকেছে। বড়বাবু বললে—তা গোলোকবাবু অফিসে নেই, তার বদলে তুমিই যাও না—

আমি তখন অফিসে নতুন। সাহেবের ঘরে কখনও যাই নি। ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে দ্বিজপদ'র পেছনে-পেছনে গিয়ে-গিয়ে সাহেবের ঘরে ঢুকলুম।

একেবারে লালমুখো সাহেব মিস্টার রবিনসন। যেতেই সাহেব মুখ ভেঙচে উঠলো—হোয়ার ইজ্ গোলোক ? গোলোক কোথায় ?

আমি বললুম—হি হ্যাজ্ নট্ কাম টু অফিস স্যার। তিনি অফিসে আসেন নি।

সাহেব রেগে গেল। বললে—হু আর ইউ ? তুমি কে ?

আমি বললুম—আই অ্যাম্ হিজ্ অ্যাসিসট্যান্ট স্যার।

সাহেব খুশী হলো না। যেন বিরক্ত হল খুব গোলোকদাকে না পেয়ে। আমাকে বললে, ইউ, মে গো—

আমি সাহেবের ঘর থেকে চলে এলাম। আমার গায়ে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সেই যে গোলোকদা কামাই করলে, তারপর থেকে তিন দিন কেটে গেল,তবু আসে না।

এমনি করে সাতদিন যখন কেটে গেল, তখন রবিনসন সাহেবও বিরক্ত, অফিসের সবাই বিরক্ত। যেন গোলোক মজুমদার না এলে রেলের চাকা বন্ধ হয়ে যাবে। শেষকালে বাড়ি ফেরার পথে একদিন মাঝখানে নেমে পড়লাম! ভাবলাম, যাই গোলোকদার খবরটা নিয়ে যাই—

গোলোকদার বাড়ীর ঠিকানা জানতুম না। কিন্তু জায়গাটার একটা আন্দাজ ছিল। গলির-গলি, তস্য-গলির ভেতরে বাড়িটা।

এক-একটা বাড়ীর সামনে গিয়ে কড়া নাড়ি আর জিজ্ঞেস করি—এ-বাড়ি-তে কি গোলোক মজুমদার থাকেন ?

তারা বলে—কে গোলোক মজুমদার ?

এঁর পরে আর আমার জিজ্ঞেস করার কিছু থাকে না।

আবার আর একটা বাড়ীর সামনে গিয়ে ওই একই প্রশ্ন। কিন্তু কেউ বলতে পারে না। সমস্ত গলিটার সব বাড়ী খুঁজতে-খুঁজতে বেশ অন্ধকার হয়ে গেল। রাস্তার গ্যাসের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল কর্পোরেশনের গ্যাস-ওয়ালা। ভেবেছিলাম, ফিরে আসব। কিন্তু পাশের বস্তির কাছে গিয়ে একটা বাড়ির সদর দরজার কড়া নাড়তে লাগলুম।

ভাবলুম, এই-ই শেষবার, আর চেষ্টা করব না।

একটা ছোট তিন বছরের ছেলে দরজা খুলে দিতেই আমি জিজ্ঞেস করলুম—খোকা, তোমার বাবার নাম কি গোলোক মজুমদার ?

ছেলেটা কোনও জবাব না দিয়ে ভেতরে চলে গেল। যেতে-যেতে বলতে লাগল—মা-ওমা, কে বাবাকে খুঁজতে এসেছে—

তার কথা শুনে আর একটা ছেলে বেরিয়ে এল। তার বয়েস একটু বেশী। আমার দিকে চেয়ে বললে—আপনি কাকে চান ?

আমি বললাম—গোলোক মজুমদার তোমার কে হয় ?

সে ছেলেটাও আমার কথার জবাব না দিয়ে ভেতরে মা'কে ডাকতে চলে গেল। এবার ময়লা শাড়ি পরা এক মহিলা এসে হাজির হলো।

বললে—আমি বলেছি তোমাকে বাবু বাড়ি নেই, তবু বার-বার টাকার তাগাদা করতে এসেছ? বাবু না এলে টাকা পাবে না!

আমি বুঝতে পারলাম অন্ধকারে আমাকে পাওনাদার ভেবেছেন মহিলা।

বললাম—আপনি ভুল করছেন, আমি পাওনাদার নই—

মহিলাটি আমার কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠল—ও'রকম সবাই বলে। কর্তা কার কাছে কত টাকা ধার করেছে, তা আমি কি করে জানব? যে টাকা ধার করেছে, তার কাছে যাও—

আমি তো মহিলার কথা শুনে অবাক।

মহিলাটি আমার কথা শোনার আগে আমার মুখের ওপর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল। আমি কি করবো বুঝতে পারলুম না। খানিকক্ষণ বোকার মতো সেখানে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভাবলাম, আর দরকার নেই, চলেই যাই। আমার কিসের দায় গোলোক মজুমদারের খবর নেওয়ার? আমি ভেবেছিলুম গোলোকদার অসুখ, তাই শুধু দেখতে এসেছিলুম। বাড়িতে যখন নেই, তখন বুঝতে হবে শরীর ভালই আছে তার।

কিন্তু আবার ভাবলাম একবার যখন এসেছি, তখন খবরটা নিয়েই যাই গোলোকদা কেমন আছে, কিম্বা কোথায় গেছে। আর জেনে যাই শরীর যদি ভাল থাকে, তা'হলে অফিসেই বা যাচ্ছে না কেন?

হঠাৎ ভেতর থেকে একটা ছেলের কথা শোনা গেল—ও-মা, লোকটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে—

ভেতরে আর কি কথা হলো আমি শুনতে পেলুম না।

অগত্যা আবার কড়া নাড়াতে হল। এবার খটাং করে দরজা খোলার শব্দ হল, আর তার পরেই সেই মারমূর্তি মহিলা। বললে—বার-বার কড়া নাড়াচ্ছ কেন বাপু? আমি তো বলেছি বাবু বাড়ি নেই, তবু কেন জ্বালাচ্ছ?

আমি বললুম—দেখুন ভুল করছেন, আমি পাওনাদার নই—

মহিলাটির যেন ততক্ষণে হুঁশ হল। বললে—তা'হলে আপনি কে?

বললাম—আমি গোলোকবাবুর অফিস থেকে এসেছি।

মহিলাটি বললে—ও, আমি তা বুঝতে পারি নি।

বললাম—সাতদিন গোলোকদা অফিস যান নি, কোনও খবরও দেন নি। তাই ভাবলুম একবার দেখে যাই কেমন আছেন—

মহিলাটি বললে—সাতদিন বাড়িতেও আসেন নি।

বললাম—বাড়িতে সাতদিন আসেন নি আর অফিসেও সাতদিন যান নি তা'হলে তিনি কোথায় ? আপনাদের চলছে কী করে ?

মহিলাটি বললে—চলছে না তো ! কোথায় যে গেলেন তিনি, বুঝতে পারছি না।

বললাম—জলজ্যান্ত মানুষটা তো হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে না।

মহিলাটি বললে—যদি আপনাদের আপিসে আসেন তো একবার বলবেন তাকে, আমাদের বড় দুরাবস্থা চলছে। কাচ্চা-বাচ্ছা নিয়ে আমি একেবারে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি !

বললাম—তা'হলে আপনাদের বাজার-টাজার কে করছে ? আপনাদের খাওয়া-দাওয়া কী হচ্ছে ?

মহিলাটি বললে—কোনওরকমে যা জুটছে, তাই বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছি। একটা টাকা হাতে নেই যে, রেশনের দোকান থেকে রেশন নিয়ে আসি। কী বিপদেই যে পড়েছি আমি।

আমার পকেটে গোটা কুড়ি টাকা ছিল, তাই বার করে দিলাম মহিলাটির হাতে। বললাম—এই কুড়িটা টাকা রাখুন,আপনি লজ্জা করবেন না—

মহিলাটি দুটো দশ টাকার নোট নিয়ে নিলে। বললে—এ টাকা কবে আপনাকে শোধ দিতে পারবো বলতে পারছি না। আরো পাঁচটা টাকা হলে একটু সুবিধে হতো—

বললাম—আর তো টাকা আমার পকেটে নেই এখন, কাল বরং এই সময়ে এসে দিয়ে যাব—

বলে চলে এলাম। আমার বড় অবাক লাগল কাণ্ডটা দেখে। গোলোক-দার নিজের বাড়ির লোকেরাই জানে না যে কোথায় গেছে কর্তা, তা অফিসের লোকেরা জানতে পারবে কেমন করে ?

পরের দিন যেতেই অনেক কাজ এসে পড়ল আমার ঘাড়ে ।

আমার নিজের বরাদ্দ কাজ তো ছিলই, তার ওপরে গোলোকদার ভাগের কাজও করতে হল। কাশীনাথবাবু আমাদের বড়বাবু ৷৷

তিনি বললেন—মিত্তিরবাবু, আজকে দু'জনের কাজ শেষ করতে হবে আপনাকে। রবিনসন সাহেবর অর্ডার।

তখন কেরাণী ছিলুম। হুকুম পালন করাই ছিল আমার কাজ। যে কোন অপরাধেই চাকরি চলে যেতে পারে। ভয়ে-ভয়ে সব কাজ শেষ করতে আমার সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেল। পাঁচটার সময় যে-যার বাড়ি চলে গেছে। সমস্ত অফিসে আমি একলা। কাজ করতে-করতে কখন সন্ধ্যে হয়েছে, কখন অন্ধকার হয়েছে, কখন সাতটা বেজেছে, খেয়াল ছিল না। কাজ শেষ করে যখন মাথা তুললাম, তখন ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেছে।

গোলোকদার বাড়ীতে গিয়ে পাঁচটা টাকা দিয়ে আসবো কথা দিয়ে এসেছি, তাই অফিস থেকে উঠে রাস্তায় বাস ধরলুম। সেই বাস খিদিরপুরে নেমে আবার অন্য বাস ধরতে হবে, তবে গোলোকদার বাড়ি পৌঁছতে পারব।

গোপালনগরের মোড়ে নেমে প্রায় পনেরো মিনিট হেঁটে তবে গোলোকদার বাড়ি পৌঁছুতে হয়। গোলকদার বাড়ির কাছেই একটা বাজার। বাজারটা বাঁয়ে রেখে যখন বস্তির মধ্যে ঢুকছি, তখন বেশ ঘন অন্ধকার হয়ে এসেছে চারিদিকে। গোলোকদার বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি বেশ কথা কাটাকাটি চলছে। একদিকে একটা লোক খুব চোট-পাট করছে, আর আর অন্য দিকে গোলোকদার বউ।

লোকটাকে দেখে মনে হলো পাওনাদার। সে টাকার তাগাদা করছে. আর গোলোকদার বউ ক্ষীণ মেয়েলী গলায় তার প্রতিবাদ করছে।

লোকটা বলছে—আজ টাকা না পেলে আমি যাবোই না—

আর গোলকদার বউ বলছে—আমার কাছে টাকা থাকলে তো তবে দেবো। বাবু বাড়িতে এলে তুমি তোমার টাকা পেয়ে যাবে।

—তা বাবু কবে আসবে?

গোলোকদার বউ বলছে—বাবু কবে আসবে, তা আমি কি করে বলবো? আপিসের কাজে বাবু কলকাতার বাইরে গেছে, বাবু ফিরলে সব কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দেবে—

লোকটা বলছে—তা বাবু যদি না ফেরে তো পাওনা টাকা পাবো না?

গোলোকদার বউ বলেছে—আমি মেয়েমানুষ, আমি কোথায় টাকা পাবো?

—দুধ খাওয়ার সময় তো আপনার সে কথা মনে ছিল না?

লোকটার গলা এবার কঠোর হয়ে উঠলো।

এই সময় আমি সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। বললাম—এত চেঁচামেচি কীসের? মেয়েমানুষের সঙ্গে অত হম্বি-তম্বি করছো কেন?

লোকটা আমাকে দেখে একটু নরম হলো যেন।

বললে—দেখুন না বাবু, মাইজী দুধ কিনেছে আমার কাছ থেকে, দাম চাইতে এসেছি, মাইজী বলছেন বাবু বাড়ি নেই—

আমি বললাম—বাবু বাড়ি নেই, সত্যি কথাই তো! তোমার কত টাকা পাওনা হয়েছে?

লোকটা বললে—তিরিশ টাকা। টাকা যদি না-ই থাকে তো দুধ খাবার মত সখ কেন?

আমি তখন পকেট থেকে দশ টাকা বার করে লোকটার হাতে দিতে গেলাম। বললাম—এই টাকা ক'টা এখন নাও, পরে বাবু এলে তোমার পুরো টাকা পাবে। এখন যাও—

হঠাৎ পেছন থেকে গোলোক্‌দার গলা শোনা গেল।

আমি অবাক হয়ে দেখি গোলোকদা এসে হাজির।

গোলোকদা গলা চড়িয়ে দিয়ে বলছে—এখানে এত হল্লা কিসের? কী হয়েছে এখানে? তারপর আমার দিকে চেয়ে আমাকে চিনতে পারলে বললে—আরে মিত্তির, তুমি এখানে?

বললাম—তোমার খোঁজে—

গোলোকদা বললে—আমি আউটডোর ডিউটিতে গিয়েছিলুম, রবিনসন সাহেব আমাকে সেখানে ওয়াগন চেকিং করতে পাঠিয়েছিল—

বললাম—তা বাড়িতে বলে যাও নি কেন? সবাই ভাবছিল। তুমি অফিসে সাতদিন ধরে আসছো না দেখে আমি কালকে তোমার বাড়িতে খোঁজ নিতে এসেছিলুম। এসে দেখি, কাল তোমার স্ত্রী'র রেশন তোলবার টাকা নেই, আমি কুড়ি টাকা স্ত্রীকে দিয়ে গেলুম—

এতক্ষণে গোলোকদার নজর পড়লো গয়লার দিকে।

গয়লা বললে—আমি টাকা চাইতে এসেছি--

—কত টাকা বাকি বলো?

গয়লা বললে—তিরিশ টাকা—

গোলোকদা বললে—তিরিশ টাকার জন্যে তুমি হামলা করছো? বলে পকেট থেকে তিনটে দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিলে।

নোটগুলো হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিল, গয়লা সে টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আমাকে দশ টাকা দিয়ে বাকিটা ট্যাঁকে গুঁজে চলে গেল।

গয়লা চলে যেতেই গোলোকদা বললে—তুই কত দিয়েছিস বউকে, বল—

আমি বললাম—বউদির কাছে রেশন আনবার টাকা ছিল না, তাই পঁচিশ টাকার দরকার ছিল, আমি কাল কুড়ি টাকা দিয়ে ছিলুম। আজকে আরো পঁচিশ টাকা দেব বলে এসেছিলুম—

গোলোকদা তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কুড়িটা টাকা আমার হাতে দিয়ে দিলে। বললে—এই নে, তোর টাকা—

বললে—টাকাই যত নষ্টের মূল, জানিস? সারা পৃথিবী কেবল টাকার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। যেন টাকাটাই সংসারে সব—

তারপর বললে—তুই যখন এসেছিস, তখন না খাইয়ে তোকে ছাড়বো না—

বলে বউকে ডাকলে। বললে, আজকে মাংস খাব। এই মিত্তিরও আমাদের সঙ্গে খাবে। রান্না চাপাও, এক্ষুনি বাজার থেকে মাংস আনছি—

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—চল, আমার সঙ্গে বাজারে চল, মাংস কিনে নিয়ে আসি—

বলে আমার সঙ্গে বেরোল। তারপর বাজার থেকে দেড় কিলো খাসির

মাংস কিনলে। তারপর বললে—অনেক দিন মাংস খাইনি, তাই আজকে মাংস কিনলুম।

বাড়িতে তখন মহা ধূমধাম। মাংস হয়েছে, তাই ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের খুব আহ্লাদ। দেখে মনে হলো, অনেক দিন বাড়ির সকলে ভালো করে খেতে পায়নি বলে তাদের এত আনন্দ হয়েছে।

খাওয়ার পর গোলোকদা আমাকে বাস রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিলে।

আমি বললাম—রবিনসন সাহেব আর বড়বাবু তোমার ওপর চটে গেছে—গোলোকদা—

গোলোকদা বললে—তা চটুক গে, আমি কাল অফিসে গিয়ে ঠিক করে নেব—

তারপর বাস আসতেই আমি বাসে উঠে বাড়ি চলে গেলুম।

* * *

পরের দিন অফিসে গিয়ে দেখি, গোলোকদা একমনে কাজ করতে লেগে গেছে। আমি হাজিরা খাতায় সই করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলুম। গোলোকদা তখন এত ব্যস্ত যে আমাকে দেখতেই পেলে না।

আমি অবাক হয়ে গেলাম সব ব্যাপার দেখে। এমন তো হয় না! বড়বাবু তো কিছুই বলছে না গোলোকদাকে।

পঞ্চাননবাবু এসে বললে—কী হে গোলোক, তুমি য্যাদ্দিন কোথায় ছিলে? তোমাকে যে বড়বাবু খুব খুঁজছিল! তুমি যে বড় খবর না দিয়ে ডুব মেরেছিলে?

গোলোকদা রেগে গেল। বললে, আমি খবর না দিয়ে ডুব মেরেছিলুম কে বললে? আমি তো ডিউটিতে খড়্গাপুরে গিয়েছিলুম!

পঞ্চাননবাবু তবু ছাড়বার পাত্র নয়। সোজা বড়বাবুর কাছে গেল। গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা বড়বাবু, আপনি যে বলেছিলেন গোলোকবাবু খবর না দিয়ে ডুব মেরেছে—

কাশীনাথবাবু বললেন—না-হে, আমি গোলোককে খড়্গাপুরে পাঠিয়েছিলুম—ওয়াগনের ফিগার আনতে। খড়্গাপুরে সব ওয়াগন আটকে গেছে সাইডিংএ, কিছুতেই জবাব দিচ্ছিল না, তাই গোলোককে ফিগার আনতে পাঠিয়েছিলুম—

টিফিনের সময় আমি আমার সঙ্গে গোলোকদারও চা এনে দিলুম।

বললাম—একটা কথা বল তো গোলোকদা—

—কী কথা?

বললাম—যে বড়বাবু তোমার ওপর এত হম্বি-তম্বি করছিল, যে রবিনসন সাহেব তোমার ওপর এত চটে গিয়েছিল, তারা তো আর কিছু বলছে

না। বউদিও তো কিছু জানতো না, যে তুমি খড়্গাপুরে গিয়েছিলে। ব্যাপারটা কী ?

গোলোকদা বললে—তোর বউদির কথা ছেড়ে দে। তোর বউদি মেয়েমানুষ, তাকে যা-তা একটা বুঝিয়ে দিলেই হলো।

—কিন্তু বড়বাবু ? তুমি অফিসে আসবার আগে বড়বাবু তোমার ওপর এত রেগে গিয়েছিল। আর তুমি আসবার পর তো কিছুই বলছে না—

গোলোকদা বললে—বলবার কি মুখ আছে রে ?

বলাম—কেন, বলবার মুখ নেই কেন ?

গোলোকদা বললে—তা'হলে তোকে চুপি-চুপি বলি, কাউকে বলিস নে যেন। আমি তো খড়্গাপুরে যাইনি যে—

আমি বললাম—সে কী ? বড়বাবু যে পঞ্চাননবাবুকে বললেন—তোমাকে ওয়াগন-এর ফিগার আনতে খড়্গাপুরে পাঠিয়েছিলেন ?

গোলোকদা বললে—বলবেই তো ! টাকায় সবাই বশ।

বললাম—তার মানে ? তুমি কি বড়বাবুকে ঘুষ দিয়ে এসেছ ?

গোলোকদা বললে—না রে, আমি এক কাজ করেছি আজ। ভোরবেলা বাজার থেকে দু'সেরি ইলিশ মাছ বড়বাবুর বাড়িতে গিয়ে দিয়ে এসেছি।

আমি শুনে তো অবাক ! বড়বাবু ঘুষ নিলে ? বললাম—দু'সেরি একটা ইলিশ মাছ দিয়েই তোমার সাত-খুন মাফ ?

গোলোকদা বললে—তা নয় তো কী ? দশ টাকা দামের একটা গঙ্গার ইলিশ কি সোজা কথা নাকি ?

তখনকার দিনে দশ টাকার অনেক দাম। সত্যিই তারপর থেকে গোলোকদার ওপর আর কোন শাস্তি হতো না। কত যে কামাই করতো গোলোকদা তার ঠিক নেই। কিন্তু আমরা হলে আমাদের ওপর এতদিনে চার্জশীট এসে যেত।

আজ এতদিন পরে মাসিমার হোটেল সেই গোলোকদার ছবি দেখে তাই অবাক হয়ে গেলাম। এই মাসিমার সঙ্গে গোলোকদার কীসের সম্পর্ক ?

আরো মনে আছে, সেদিন শনিবার। অফিসের শেষ মুহূর্তে বড়বাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—কাল রবিবার। কাল তুমি একবার অফিসে আসতে পারবে ? একটা জরুরী কাজ আছে।

বললাম—আপনি যদি বলেন তো আসবো—

বড়বাবু বললেন—তা'হলে তোমার গোলোকদাকেও একবার বাড়ি যাওয়ার সময়ে বলে যেও তো, যেন সেও একবার আসে। তার বদলে অন্য একদিন তোমাদের ছুটির ব্যবস্থা করবো সাহেবকে বলে—

আমি নতুন লোক। বড়বাবু যা হুকুম করবে, তাই-ই বাধ্য হয়ে মানতে

হবে। তা তাই-ই সই। বাড়ি যাবার পথে আবার সেদিন ঠিক জায়গায় বাস থেকে নামলুম। তারপর হাঁটতে-হাঁটতে গেলাম, সেই বাজারের পাশ দিয়ে গোলোকদার বাড়ি।

সেদিনকার মতই বাড়ির সদর দরজায় কড়া নাড়তে লাগলুম।

ভেতর দিকের জানলার ফাঁক দিয়ে দেখে একটা ছোট ছেলের গলা শুনতে পেলুম—ওমা, আবার সেই লোকটা এসেছে—

—কোন্ লোকটা রে?

ছেলেটা বললে—সেই যে আমাদের বাড়িতে লুচি-মাংস খেয়ে গেল।

তারপর সদর-দরজাটা খুলেই দেখি গোলোকদার স্ত্রী মাথায় ঘোমটা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনি, আবার কি মনে ক'রে?

বললাম—গোলোকদা বাড়ি এসেছে?

গোলোকদার স্ত্রী বললে—কেন তিনি অফিসে যান নি? আজ তো শনিবার—

বললাম—অফিসে এসেছিলেন, কিন্তু ছুটি হবার আগেই চলে গেছেন। কিন্তু কাল রবিবার হলেও কালকে একবার অফিসে যেতে হবে। এইটে বলতেই আমি এসেছি—

গোলোকদার স্ত্রী বললে—আজ শনিবার, আজকে কি আর বাড়ি আসবে? আজকে নাও আসতে পারেন—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—বাড়ি আসবে না?

গোলোকদার স্ত্রী বললে—না আসাই সম্ভব।

বললাম—রাত্রিরে তা'হলে কোথায় থাকবে?

গোলোকদার স্ত্রী বললে—রাত্রিরে বাড়ি না আসাই সম্ভব। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন তো বাইরে রাত কাটায়।

আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম। রাত্রে বাড়ির মানুষ বাড়ি আসবে না তো, কোথায় যাবে?

গোলোকদার স্ত্রী বললে—রেসের মাঠে যদি আজ বেশি টাকা জিতে থাকে তো সোজা শ্যামবাজারে চলে যাবে।

—শ্যামবাজারে?

বললাম—শ্যামবাজারে গোলোকদার কে-কে আছে?

গোলোকদার স্ত্রী বললে—কেন, আপনারা জানেন না কিছু?

বললাম—না, আমরা তো কিছুই জানি না। শ্যামবাজারের কথা তো গোলোকদার মুখে কখনও শুনি নি।

গোলোকদার স্ত্রী বললে—না শুনে থাকেন তো, আর শুনে কাজ নেই। আপনার দাদা মানুষ নয়, একটা জানোয়ার। কিম্বা জানোয়ারের চেয়েও

অধম। এমন মানুষের হাতে পড়েছি, বলেই আমার এই দুর্দশা। এই দেখুন আমার হাত—

বলে একটা হাত বাড়িয়ে দিলে। বললেন···কী দেখছেন? হাতে কি আমার সোনার চুড়ি দেখছেন?

আমি দেখলাম, ভদ্রমহিলার হাতে শুধু শাঁখা। গয়না-টয়না কিছু নেই। গোলোকদার স্ত্রী বলতে লাগল, অথচ আমার বাবা আমার বিয়ের সময়ে পাঁচ ভরি সোনার চুড়ি দিয়েছিল, দশ ভরির একটা সোনার হার দিয়েছিল। আরো কত কী দিয়েছিল। রূপোর থালা-গেলাস বাটি দিয়েছিল। বাড়ি বন্ধক রেখে আমার বিয়ে দিয়েছিল, আপনার দাদার সঙ্গে। কিন্তু আপনার দাদা সব উড়িয়ে দিয়েছে রেস খেলে আর···

কথা বলতে-বলতে আমার সামনেই ঝর-ঝর্ করে কেঁদে ফেললে। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে আবার বলতে লাগল—আপনার বড় সাহেবকে গিয়ে আপনি একটু বলতে পারেন না, আপনার দাদার হাতে মাইনেটা না দিয়ে আমার হাতে দিলে তবু ছেলেগুলো একটু খেতে পায়—আপনি বলতে পারেন না—

আমি আর ওব কী জবাব দেব! চুপ করে রইলাম।

তারপর আবার বলতে লাগল—জানেন, আজ দু'দিন আমাদের বাড়িতে উনুন জ্বলে নি!

বললাম—তা'হলে আপনারা কী খাচ্ছেন?

—কিছুই না।

বললাম—কিছুই না মানে, ছেলেদের মুখে তো কিছু দিতে হচ্ছে—

—কী খাচ্ছি দেখবেন? দেখবেন আপনি? তাহলে আসুন—

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম।

বলতে যাচ্ছিলাম যে, আমি আর কী দেখব?

কিন্তু ততক্ষণে গোলোকদার স্ত্রী আমার হাত ধরে টানতে-টানতে ভেতরে নিয়ে গেল। বাড়ির ভেতরের দৃশ্য দেখে আমারই চোখ দু'টো ভিজে এলো। এই রকম নির্লজ্জ, দারিদ্র্য আগে কখনও কোথাও কোনও মধ্যবিত্ত সংসারে আমি দেখি নি। অথচ গোলোকদাকে দেখে তো এসব কল্পনা করা যায় না। গোলোকদা তো ফর্সা কোট-প্যান্ট পরে থাকে সব সময়। পায়ের জুতোয় সব সময় পালিশ থাকে। গা দিয়ে অনেক সময়ে আতরের গন্ধ বেরোয়। গোলোকদাকে দেখে কে বলবে তারই ভেতরে এই দারিদ্র্য? গোলোকদা অফিসের ক্যানটিনে গিয়ে রোজ মাংস-চপ-কাটলেট উড়োয়, অথচ তারই সংসারের এই হাল? আমরা হলে তো উল্টো করি। নিজে না খেয়ে বউ ছেলে-মেয়েকে আগে খাওয়াই। আমাদের কাছে আগে সংসার, পরে

আমরা। অথচ এই ক'দিন আগে তো এই বাড়িতেই লুচি-মাংস খেয়ে গিয়েছি পেট ভরে। সে টাকাই বা কোথা থেকে এল। কোথা থেকে পকেট থেকে টপাটপ্ টাকা বার করে গয়লার দেনা শোধ করে দিলে?

—এই দেখুন কী খেয়েছি আজ দু'দিন।

বলে গোলোকদার স্ত্রী আমাকে আঙুল দিয়ে দেখালে। দেখলাম, একটা কাসিতে ছাতু মাখা রয়েছে। তখনও যেন আমার নিজের চোখকেও বিশ্বাস হচ্ছিল না।

জিজ্ঞেস করলাম—এ কি ছাতু নাকি?

গোলোকদার স্ত্রী বললে—ছাতু ছাড়া আর কী খাওয়া আছে আমাদের। বাচ্চাদের তো কিছু খাওয়াতে হবে! ওরা তো শুনবে না আমার কথা। কাল দু'বেলা আর আজ দু'বেলা শুধু ছাতু খাইয়েছি ওদের। ছাতু খেয়ে কি ছেলেরা থাকতে পারে? ওরা ভাত খেতে চায়। মাছ খেতে চায়। সে-সব কোথায় পাবো?

বললাম—এ সব কথা তো আমাদের জানা ছিল না। গোলোকদা তা'হলে অত ভালো-ভালো জামা-কাপড় কোট-প্যান্ট কোথা থেকে পায়? গোলোকদাকে দেখে তার সংসারের যে এই হাল, তা-তো বোঝাই যায় না—

গোলোকদার স্ত্রী বললেন—আপনার দাদা হাতে কত টাকা মাইনে পায় বলতে পারেন?

আমি বললাম—সব কিছু কেটে নিয়ে হাতে পায় দেড়শো টাকা।

—কিন্তু আমাকে যে বলেছে মাত্র আশি টাকা! তা আশি টাকাই হোক আর দেড়শো টাকাই হোক, আমাকে যদি পঞ্চাশ টাকাও হাতে দেয় তো, তবু বাচ্চাগুলোর মুখে একটু ভাত দিতে পারি!

বললাম—আপনি এক কাজ করুন, আপনি মাসের পয়লা তারিখে বেলা বারোটার মধ্যে আমাদের অফিসে চলে আসুন। আমি রবিনসন সাহেবকে বলে পুরো মাইনেটা আপনার হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করবো। আমাদের সাহেব খুব ভালো লোক। অবস্থাটা বোঝালে সাহেব গররাজী হবে না—

গোলোকদার স্ত্রী শুনে বললে—আমি আপনাদের অফিসে যাবো?

বললাম—কেন যেতে দোষ কী?

—ও মানুষটা যদি রাগ করে? এখন তো এমনিতেই বাড়ি আসে না, এর পর যদি একেবারেই না আসে আর?

বললাম—বড় সাহেবকে বলে দেব, সাহেব খুব কষে বকে দেবে গোলোকদাকে।

—কিন্তু শেষকালে যদি আপনার দাদার চাকরি চলে যায়? তখন তো এ কুলও যাবে আর ও-কুলও যাবে!

বললাম—না, আমাদের রেলে কারো চাকরি যায় না!

গোলোকদার স্ত্রী বললে—আমি আপনাদের অফিসটা চিনি না!

বললাম—আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। আপনি এখান থেকে বেরিয়ে তিন নম্বর বাস ধরবেন। সে বাসটা খিদিরপুরে গিয়ে শেষ হবে। সেখান থেকে বারো নম্বর বাস ধরে একেবারে গার্ডেনরিচে গিয়ে পৌঁছে যাবেন। দেখবেন একটা তিনতলা বাড়ি, সেটাই আমাদের অফিস—সেইখানেই নেমে পড়বেন!

—আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে?

—হ্যাঁ, সামনে দেখবেন গুর্খা দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে, তারা কিছু বলবে না। আপনি সোজা ভেতরে গিয়ে শুধু বলবেন ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্ট! তা'হলেই সবাই আপনাকে দেখিয়ে দেবে। বারোটার মধ্যে কিন্তু যাবেন। সেই সময়ে আমাদের মাইনেটা দেওয়া হয়—

গোলোকদার স্ত্রী খানিকক্ষণ কী ভাবলে।

তারপর বললে—আচ্ছা, পয়লা তারিখেই আমি যাবো—

এই পর্যন্ত বলে আমি চলে এলুম। রবিবার দিন স্পেশ্যাল ডিউটি করতে গিয়েছি। বড়বাবু ছিল। জিজ্ঞেস করলে—তুমি একলা যে, গোলোক কোথায় গেল? কাল সন্ধ্যাবেলা তার বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে আসোনি।

বললাম—বাড়িতে থাকলে তো তবে খবর দেবো। গোলোকদা তো বাড়িতে ছিল না।

বড়বাবু বললে—তা'হলে তার বউকে বলে এলে না কেন?

বললাম—গোলোকদা তো বাড়িতে রাত কাটায় না!

বড়বাবু বললে—সে-কী? বাড়িতে রাত কাটায় না তো, কোথায় রাত কাটায়?

বললাম—সে-সব অনেক কথা বড়বাবু, গোলোকদার বউ-এর কাছে যা শুনলুম, তাতে তো আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেছে—

—কী-রকম?

বড়বাবুকে সব খুলে বললাম। বড়বাবুও শুনে অবাক হয়ে গেল।

বললে—ভালোই করেছো পয়লা তারিখে আসতে বলে। আমি নিজে গিয়ে রবিনসন সাহেবকে বলে দেব। অথচ জামা-কাপড়ের এমন বাহার তো, কারো দেখা যায় না! তাই ভাবি মাইনে তো মাত্র দেড়শো টাকা, এত বাবুয়ানি কোত্থেকে আসে বলো তো?

বললাম—আমিও তো তাই ভেবে অবাক হই—

—তা গোলোক মজুমদারের বউ কী বললে?

বললুম—গোলোকদার বউ বললে শ্যামবাজারে কোন্ পোড়ারমুখীর কাছে আছে, সে-ই গোলোকদাকে টাকা জোগায়—

কথা এই পর্যন্ত হল। তারপর কাজ করতে বসে গেলুম।

রবিবারের পর সোমবার গোলোকদা অফিসে এলো।

দেখলুম, সে-কি পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার গোলোকদার। নতুন স্যুট তৈরী করিয়েছে। তখন সস্তা-গণ্ডার দিন—তবু মনে হলো, অন্ততঃ শ'দেড়েক টাকা দামের স্যুট হবে। দেখে অফিসের আমাদের সবাই-এর চোখ বড় হয়ে গেল। পঞ্চাননবাবু এগিয়ে এল প্রথমে। জিজ্ঞেস করলে—ক'টাকা পড়ল ভাই গোলোক, এই স্যুটটা তৈরী করতে?

গোলোকদা বললে—এই দেড়শো টাকার মতন—

পঞ্চাননবাবু আবার জিজ্ঞেস করলে—তা হঠাৎ স্যুট তৈরী করলে কেন?

গোলোকদা বললে—এমনি ইচ্ছে হলো।

পঞ্চাননবাবু বললে—ধারে-কিস্তিতে কিনলে না নগদে?

গোলোকদা বললে—ধারে আমি কোনও জিনিব কিনি না, ধারের কারবার আমার নেই, সবই নগদে—

সবাই চলে যাবার পর যেই একটু নিরিবিলি হয়েছে, আমি চুপি-চুপি গোলোকদাকে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা গোলোকদা, শনিবার রাত্তিরে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

গোলোকদা আমার কথা শুনে চমকে উঠল। তারপর বললে—কেন, তুই আমাদের বাড়ি গিয়েছিলি নাকি?

বললাম—হ্যাঁ—

—কেন?

বললাম—বড়বাবু রবিবার অফিসে আসতে বলেছিল, আমাকে আর তোমাকে। শনিবার তুমি সকাল-সকাল বাড়ি চলে গিয়েছিলে। তাই তোমাকে খবরটা দিতে গিয়েছিলুম। তার বদলে বড়বাবু একদিন ছুটি দেবে বলেছিল—

গোলোকদা বললে—আমি তো অফিস থেকে বাড়ি যাই নি—

বললাম—আমি কাউকে বলব না, বলো তো কোথায় গিয়েছিলে? মিথ্যে কথা নয়, সত্যি কথা বলবে—

গোলোকদা বললে—পরে টিফিন-পিরিয়ডে তোকে সব বলবো—

বললাম—এখুনই বলো না! কে আর আসতে পারে?

গোলোকদা বললে—সে একটা গল্প, এখানে ঠিক বললে সুবিধে হবে না। ক্যানটিনে গিয়ে পরোটা আর মাংসের কারি খেতে-খেতে তোকে সব বললে—

তা সেদিন সত্যিই আমার খুব আগ্রহ হয়েছিল কী এমন বিচিত্র গল্প যে অফিসে বসে বলা যায় না। সেদিন যেন টিফিন-পিরিয়ড আর আসতে চায়

না। যখন দেড়টা বাজলো, তখন রবিনসন সাহেব তার কোয়ার্টারে চলে যায় খেতে। আমরাও সেই ফাঁকে বাইরে গেলাম।

বিরাট জায়গা নিয়ে বাগানের মধ্যে ছিলো আমাদের অফিসের ক্যানটিন। আমরা সেখানে একটা নিরিবিলি কোণে গিয়ে বসলাম। তারপর গোলোকদা অর্ডার অনুযায়ী দু'খানা পরোটা আর দু'প্লেট মটন-কারি এল।

তারপর গোলোকদা তার গল্প বলতে লাগলো।

গোলোকদা বললে—আগে প্রতিজ্ঞা কর, তুই কাউকে বলবি না?

বললাম—বলবো না, কাউকে বলবো না প্রতিজ্ঞা করছি—

—মা কালীর দিব্যি কর।

বললাম—মা কালীর দিব্যি কাউকে বলবো না—

গোলোকদা বললে—দেখ্, তুই জানিস না বোধহয়, আমি ছোটবেলা থেকে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতাম। ডন-বৈঠক করতুম, বারবেল ভাঁজতুম। মুগুর ঘোরাতুম। আমাদের পাড়ায় ক্লাব ছিলো। এক্সার-সাইজের জন্য আমি তিনবার প্রাইজ পেয়েছিলুম সেখানে। প্যারালাল বারে আমার কেউ জুড়ি ছিল না। আমার মাশল্ এখনও যা আছে তা তুই টিপে নরম করতে পারবি না।

তারপর যখন একটু বয়েস হল আর বাবা মারা গেলেন, বিধবা মাকে নিয়ে আমি একলা পড়ে গেলুম। টাকা উপায় করবার দরকার হল। কোথায় চাকরি পাই? কে টাকা দেয়? আমি পাড়ার পাব্‌লিক লাইব্রেরীতে গিয়ে খবরের কাগজে 'কর্মখালি'র বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে রোজ দশটা-বারোটা করে দরখাস্ত করতে লাগলাম। কিন্তু সব জায়গা থেকে জবাব আসতে লাগল—'নো ভ্যাকেন্সি, স্যরি'।

সেই সময়ে মা'র শরীর খারাপ হয়ে গেল। মা আর নড়তে-চড়তে পারে না। তখন আমার একটা বিয়ে দিয়ে দিলে মা।

বললাম—সেই অবস্থায় তুমি বিয়ে করে বসলে?

গোলোকদা বললে—কী করবো? বাড়িতে তখন ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, রান্না-বান্না করবার জন্যে একজন বিনে মাইনের ঝি চাই তো! সেই জন্যেই বিয়ে করলাম। বাংলা দেশের মত এত সস্তায় ঝি তো আর কোথাও পাওয়া যাবে না! কিন্তু বিয়ে তো করলাম, খাওয়াব কী? বাবা তো ব্যাঙ্কে টাকা রেখে যায় নি যে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলবো আর খাবো!

শেষকালে সকলের দরজায় ঘুরছি একটা তিরিশ টাকা মাইনের চাকরির জন্যে। কেউ চাকরি দিলে না। কে চাকরি দেবে? ম্যাটিক পাশ করা গরীব ছেলের ওপর কেন লোকে দয়া করবে? তাতে তাদের স্বার্থটা কী?

শেষকালে একটা কাজ পেয়ে গেলাম। কুড়ি টাকা মাইনেতে একজন আমাকে একটা কাজ দিলে।

—কী কাজ ?

—না, লেখাপড়ার কাজ-টাজ কিছু নয়। শুধু এক বড়লোককে ম্যাসাজ করে দিতে হবে। তা কুড়িটা টাকা কি তখন কম আমার কাছে ? আমি রোজ সকালে গিয়ে এক ঘণ্টা ধরে ভদ্রলোককে গা দলা-মলা করে দিতুম। তার বদলে মাসে কুড়ি টাকা পেতুম।

সে কুড়িটা টাকা তখন আমার কাছে কুড়ি হাজার টাকার মত।

ভদ্রলোকের ষ্ট্রোক হয়েছিল। আমি ম্যাসাজ করে দেবার পর থেকে ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে উঠলেন।

তিনি খুশী হয়ে বললেন—তুমি আর একজনের কাছে কাজ করবে ?

বললাম—তিনি কত দেবেন ?

তিনি বললেন—তিনি খুব বড়লোক. তিনি তোমায় পঁচিশ টাকা করে মাসে দেবেন। আমার কাজটা সকালে করবে আর সেখানে বিকেল বেলা—

তারপর থেকে তাই সকালে বিকেলে দু'টো কাজ করতে লাগলুম। দু'বেলা মিলে আমার কুড়ি আর পঁচিশে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাসে মিলতে লাগলো। তখনকার দিনে মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা উপায় করাই অনেক টাকা। তখন চালের মণ তিন টাকা, চার আনা পাল্লা আলু, সরষের তেল পাঁচ আনায় এক সের। দোকানে এক কাপ চায়ের দাম দু'পয়সা।

পঁয়তাল্লিশ টাকা মাসে হাতে পেয়ে আমি যেন চাঁদ পেয়ে গেলুম।

ক্রমে ম্যাসাজিং-এ আমার খুব নাম-ডাক বাড়ল। একজন আর একজনকে রেকোমেণ্ড করতে লাগল। সবাই বড়-বড় লোক। কেবল টাকার পাহাড়, কোনও শারীরিক পরিশ্রম নেই কেবল খায় আর টাকার পাহাড়ের উপর ঘুমোয়, আর সেই রকম লোকের সংখ্যা এখনও যেমন তখনও তেমনি ছিল আর চিরকালই থাকবে।

তেমনি একজন লোক জুটে গেল শ্যামবাজারে। ভদ্রলোকের নাম, নন্দকিশোর দত্ত। সবাই তাকে 'নাদুবাবু' বলে ডাকত।

তিনি একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন।

কী রোগ না তাঁর—মুখে আসে না। আমাকে রোজ রাত্রে সাড়ে ন'টার গিয়ে ম্যাসাজ করে তাঁকে ঘুম পাড়াতে হবে।

আমি গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ফরসা মোটা-সোটা নাদুস-নুদুস গোলগাল চেহারা। কাপড়ের হোলসেল কারবার করে অনেক টাকা করেছেন, কিন্তু শরীরে আর সহ্য হচ্ছে না। খুব ঘি খান। নড়া-চড়া করতে পারেন না। কেবল গদীতে গিয়ে বসা আর বাড়ি এসে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়া।

শরীরে ভীষণ ফ্যাট্ জমে গেছে। দেখলে মনে হবে বুঝি পঞ্চাশ বছর বয়েস, কিন্তু চল্লিশ-একচল্লিশের বেশি নয় বয়েস।

আমাকে নাতুবাবু বললেন—আমাকে বিনা ওষুধে ঘুম পাড়াতে পারবেন ?

বললাম—নিশ্চয়ই পারব। যদি আমার কথামত চলেন।

—আপনি কী করেন ?

বললাম—আমি এই সবই করি। যাদের বসে-বসে কাজ, তাদের আমি ম্যাসাজ করে দিয়ে ভালো করে দিই—

নাতুবাবু বললে—আমার ব্লাড-প্রেসার আছে, কমিয়ে দিতে পারেন বিনা ওষুধে—

বললাম—কিন্তু একটা কাজ করতে হবে আপনাকে—

—কী কাজ ?

বললাম—আপনাকে ঘি খাওয়া ছাড়তে হবে—

নাতুবাবু একটু ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন—আমি তো জয়পুর রাজস্থান থেকে খাঁটি ঘি আনিয়ে খাই। কলকাতার বাজারের ভেজাল ঘি তো খাই না।

আমি বললাম—ভেজাল ঘি খাওয়া তবু চলতে পারে, কিন্তু খাঁটি ঘি একেবারে চলবে না। তাতে আরও ফ্যাট্ বাড়বে, আরো ব্লাড প্রেসার বাড়বে। আমি আপনাকে তা'হলে ঘুম পাড়াতে পারবো না। আপনি ঠাকুরকে বলে দিন, যেন আপনার খাবারে আর ঘি না দেয়—

নাতুবাবু ঠাকুরকে আমার সামনেই ডাকলেন। ঠাকুর এলো।

নাতুবাবু বললেন—ঠাকুর দেখো, কাল থেকে আমার রান্নায় ঘি মোটে দেবে না। এই আমার হুকুম—

ঠাকুর তো অবাক। জিজ্ঞেস করলে—তা'হলে কী দিয়ে রান্না করবো হুজুর ?

আমি বললাম—শুধু সেদ্ধ রান্না করবে—

ঠাকুর বললেন—কিন্তু ডালে ঘি না দিলে কি খেতে ভালো লাগবে ?

আমি বললাম—সরষের তেল মেশাবে দরকার হলে—

—কিন্তু সে কি খেতে ভালো লাগবে ?

বললাম—প্রথম-প্রথম একটু কষ্ট হবে, কিন্তু পরে সহ্য হয়ে যাবে। তা-না হলে আপনাকে ঘুম পাড়াতে পারবো না, এই বলে রাখছি।

তা ঠাকুর তখন রাজী হলো।

নাতুবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কত নেবেন আপনি ?

বললাম—এখন কিছু দিতে হবে না। যেদিন থেকে ঘুম আসবে সেদিন থেকে টাকা দেবেন !

নাতুবাবু বললেন—যদি আমার ঘুম আসে, তা'হলে আপনি যা চাইবেন

তাই-ই দেব। আমি রোজ ইনজেক্‌শন নিয়ে তবে ঘুমোতে পারি, তা জানেন ?

বললাম—ওতে তো আপনার হার্ট দুর্বল হয়ে যাবে।

নাদুবাবু বললেন—আমি তো সেই ভয় পেয়েই আপনাকে ডেকেছি। আমি শুনেছি, আপনি অনেককে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন—

আমি ভাই ছোটবেলা থেকে পাড়ার ক্লাবে শরীর-চর্চা করেছি। মুগুর ভেঁজেছি, ডাম্‌বেল ভেঁজেছি, কুস্তি করেছি। আমার মাশ্‌ল দেখে আমার গুরু পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছে। শরীরের আমার কোনও গণ্ডগোল নেই, শুধু অভাব ছিল টাকার। এমন টাকা ছিল না যে বউকে দু'মাসের মধ্যে একটা শাড়ি কিনে দিই—

নাদুবাবুর সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল তখন নাদুবাবুর বউ পাশের ঘরের দরজা একটু ফাঁক করে উঁকি মেরে আমার দিকে চেয়ে দেখছে। আমি সঙ্গে-সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি, কারণ ভদ্রলোকের বাড়ির অন্দর মহলের দিকে তাকানো উচিত নয়।

নাদুবাবু ডাকল—ওগো শুনছো!

অর্থাৎ নিজের স্ত্রীকে তিনি ডাকলেন। দেখলাম, দরজাটা আরো খানিকটা ফাঁক হল। একজন সুন্দরী মহিলা মাথায় ঘোমটা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। বুঝলাম, ইনিই নাদুবাবুর স্ত্রী। নাদুবাবু যে অত মোটা-সোটা, তাঁর স্ত্রী কিন্তু তেমন নয়। বেশ দোহারা চেহারা। গায়ের রং দুধে-আলতা। সমস্ত শরীরটা একেবারে সোনার গয়নায় মোড়া।

কাছে এসে দাঁড়াতেই নাদুবাবু বললেন—এই দেখো, ইনি বলেছেন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন। আজ থেকে আমাকে ওই ডাক্তারের বিষগুলো আর খাইও না। ওই ওষুধ আর রোজ-রোজ ওই পেথেড্রিন ইনজেকশান আর নেব না। দিন-দিন আমার শরীর কেবল ভেঙেই যাচ্ছে। কোনও উপকার হচ্ছে না। ইনি বলেছেন, রোজ সাড়ে ন'টার পর এসে আমার ঘাড়ে ম্যাসাজ করে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন।

নাদুবাবুর স্ত্রী বললে—তা ভালোই তো, তাই করো না।

নাদুবাবু বললেন—আর একটা কথা, ইনি বলেছেন আমাকে আর ঘি খেতে দিও না। আমি ঠাকুরকে বলেছি, তরকারিতে, ডালে ঘি দেওয়া বন্ধ করে দিতে। যদি দরকার হয়, সরষের তেল ব্যবহার করবে—

স্ত্রী বললেন—ঠিক আছে, আমিও ঠাকুরকে মানা করে দেব ঘি দিতে—

নাদুবাবু বললেন—হ্যাঁ, তুমি মানা করে দিও, আর ঘিয়ের টিনটা লুকিয়ে রেখে দেবে। বেটারা আমাকে ঘি খাইয়ে-খাইয়েই মেরে ফেলতে চায়। আমি মরে গেলেই তো বেটারা সব লুটে-পুটে খেতে পারবে—

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—আপনি কবে থেকে আসছেন ?

আমি বললাম—আমি আজ রাত থেকেই আরম্ভ করতে পারি—

—তা আজকেই আমার ঘুম আসবে ?

বললাম—দু'তিন দিনের মধ্যেই ঘুম এসে যাবে—

—আপনি গ্যারান্টি দিচ্ছেন ?

বললাম—হ্যাঁ, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি—

নাহুবাবু বললেন—তা'হলে ঠিক আছে, আজ রাত থেকেই আরম্ভ করে দিন। রোজ কতক্ষণ ম্যাসাজ করবেন ?

বললাম—আপনি রাত ন'টার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে রেডি থাকবেন, আমি কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে ন'টার সময়ে এসে যাব।

—কতক্ষণ লাগবে ?

বললাম—একঘণ্টা সময় লাগবে। রাত সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে দশটা। তারপর আমি বাড়ী চলে যাব! আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে যাবো।

—ঠিক আছে, তা'হলে আপনি এখন যান।

তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন—ওগো, ওকে কিছু অ্যাডভান্স দাও—

স্ত্রী বললেন—কত দেবো ?

—এই দশ টাকার মতন—

আমি বললাম—না, এখন আমাকে অ্যাডভান্স দিতে হবে না। আগে আপনাকে ঘুম পাড়াই তবে আমি অ্যাডভান্স নেব—

* * *

হঠাৎ পঞ্চাননবাবু এসে বললেন—আরে তোমরা টিফিন-রুমে বসে এতক্ষণ গল্প করছ আর এদিকে যে সাহেব তোমাকে ডাকছে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি আড়াইটে বাজে। গল্প শুনতে-শুনতে কতক্ষণ যে কেটে গেছে, তার খেয়াল ছিল না। আমি বাকিটা শোনবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলুম। গোলোকদা সাহেবের ঘর থেকে একটা ফাইল নিয়ে এসে তাইতেই মনযোগ দিয়ে কাজ করতে লাগলো।

একবার জিজ্ঞেস করলাম—তারপর কী হল গোলোকদা ?

গোলোকদা বললে—দাঁড়া-ভাই, এখন সাহেবের কাজটা শেষ করি। শালার পাঁচশিকে রোজের চাকরির মাথায় মারি ঝাঁটা। এবার চাকরিটা ছেড়ে দেব মাইরি—বলে তাড়াতাড়ি আবার ফাইলের ভেতরে ডুবে গেল।

তার পরদিনও গল্প শোনার সুযোগ হলো না। সাহেবের সেই ফাইলের কাজ তখনও শেষ করতে পারে নি।

পর-পর কয়েক দিনই আর গল্প শোনাবার ফুরসৎ হল না।

সেদিন মাইনের তারিখ। সকাল থেকে আমরা সবাই হাঁ করে বসে

আছি, কখন পে-ক্লার্ক আসবে। হঠাৎ দেখি গোলোকদার বউ অফিসের মধ্যে এসে হাজির। কে বোধহয় আমাদের সেকশানটা দেখিয়ে দিয়েছে তাকে।

অফিসের মধ্যে জীবনেও কখনও ঢোকেনি গোলোকদার বউ। সব দেখে শুনে গেরস্থ মেয়েমানুষ ঘাবড়ে গেছে।

আমাকে দেখে যেন আশার আলো দেখতে পেল।

জিজ্ঞেস করলে—আপনার দাদা কোথায়?

বললাম—ওই যে, ওই চেয়ারে বসে আছে—

দৌড়ে গিয়ে গোলোকদাকে বললাম—গোলোকদা ওই দেখ, তোমার কে এসেছে—

গোলোকদা ফাইল থেকে মুখ তুলে বউকে দেখে অবাক।

জিজ্ঞেস করলে—তুমি? তুমি এখানে?

বৌদি বললে—আজ তোমাদের মাইনের তারিখ, তাই এলুম। বাচ্চাদের মুখে আমি কী খেতে দিই বল তো?

গোলোকদা বললে—তা বলে এখানে কেন? আজ রাত্তিরে তো আমি বাড়িতে যেতুম—

গোলোকদার বউ বললে—তুমি ছাই যেতে। তোমার কথা আমি আর বিশ্বাস করি না।

ততক্ষণে সেকশানের সবাই এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে সেখানে। সকলের মুখেই একই প্রশ্ন—কী হয়েছে? এখানে কী হয়েছে? ইনি কে?

কাশীনাথবাবুও এসে হাজির হলেন। তিনি বড়বাবু।

বললেন—এখানে এত গোলমাল কিসের? ইনি কে?

আমি উত্তর দিলাম। বললাম—ইনি গোলোকদার বউ—

কাশীনাথবাবু বললেন—তা অফিসে কেন?

বললাম—আজকে মাইনের দিন, তাই ইনি এসেছেন গোলোকদার মাইনেটা নিজের হাতে নিতে—

গোলোকদা বড় লজ্জায় পড়ে গেল আমার কথায়। বড়বাবু বললেন—তা গোলোক, তুমি কি তোমার বউকে টাকা দাও না নাকি?

জবাবটা দিলে গোলোকদার বউ। বললে—ইনি মাইনেটা নিয়েই অন্য কোথায় চলে যান, বাড়িমুখো হয় না। আমি বাচ্চাগুলোকে কী খাওয়াই বলুন তো? আপনারা বলে-কয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওর মাইনেটা আমার হাতে দেয় তো বাচ্চাগুলো একটু খেয়ে-পরে বাঁচে—

বড়বাবু এবার গোলোকদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কী হে গোলোক, এ-সব কথা কী শুনছি? তুমি বাড়ীতে টাকা দাও না? কী করো টাকা নিয়ে? রেস খেলে আর মদ খেয়ে উড়িয়ে দাও নাকি?

গোলোকদা সে প্রশ্নের জবাব না নিয়ে বউ-এর দিকে চেয়ে বললে—তুমি আবার অফিসে আসতে গেলে কেন? আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় না? আমি কি মাইনের টাকা অন্য লোককে দিয়ে আসব—

গোলোকদার স্ত্রী বললে—তুমি কি কোনও দিন তোমার মাইনের টাকা আমার হাতে তুলে দিয়েছো? তুমি কি কোনও দিন খেয়াল রেখেছ, আমরা খেতে পাচ্ছি কি খেতে পাচ্ছি না? তুমি ক'টা রাত আমার বাড়িতে কাটিয়েছ ?

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলতে গিয়ে ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললে।

কাশীনাথবাবু এবার গোলোকদার সামনে এসে বললেন—তুমি এ-রকম করো কেন বলো তো? তুমি রাত্তিরে কোথায় থাকো? মাইনেগুলো নিয়েই বা কাকে দাও?

গোলোকদা বড় মুশকিলে পড়ল। বললে—আপনারা যা পারেন করুন, আমিও যা ইচ্ছে তাই করব।

বড়বাবু বললেন—তা'হলে আজকে তুমি নিজের হাতে মাইনে নিতে পারবে না—

গোলোকদা বললে—আমার মাইনে আমি আলবাত্ নেব, দেখি কে—কী করতে পারে, আমার বউ আপনাদের যা কিছু বোঝাবে আর আপনারা তাই-ই বুঝবেন! আমার ফ্যামিলির ব্যাপারে আপনারা কেন সবাই নাক গলাতে আসবেন?

কাশীবাবু বললেন—তা'হলে আমি রবিনসন সাহেবের ঘরে যাচ্ছি তোমার বউকে নিয়ে—

গোলোকদার বউ-এর দিকে চেয়ে বড়বাবু বললেন—চলুন তো আপনি. একবার আমাদের সাহেবের ঘরে চলুন তো?

বড়বাবুর পেছন-পেছন গোলোকদার বউও চলতে লাগল।

পঞ্চাননবাবু বললে—কি হে গোলোক? তোমার কি আবার দুটো সংসার নাকি? তুমি এইরকম ডুবে-ডুবে জল খাও নাকি হে—

অফিসসুদ্ধ লোক তখন গোলোক মজুমদারকে নিয়ে আলোচনা সুরু করে দিয়েছে। এমন ঘটনা অফিসে আগে কখনও কেউ দেখেনি। এমন মুখরোচক ঘটনা আগে কেউ কখনো শোনেনি। কারো পর্দানশীল বউ এমন করে অফিসে এসে স্বামীর মাইনের দাবী করেনি।

সাহেব তো সাহেব রবিনসন সাহেব। সব শুনলেন মহিলাটির কথা।

জিজ্ঞেস করলেন—গোলোক রাত্রে বাড়ি যায় না?

বড়বাবু বললেন—ইনি তো তাই বলছেন স্যার—

সাহেব বললে—তা'হলে ডাকো তো গোলোক মজুমদারকে—

চাপরাশি এসে গোলোক মজুমদারকে ডাকলে। বললে—সাহেব সেলাম দিয়া—

গোলোকদা গিয়ে হাজির হল সাহেবের ঘরে। বললে—গুড্ মর্নিং স্যার—

—গুড্ মর্নিং। ইজ দিস্ ইওর ওয়াইফ্? এই কি তোমার স্ত্রী?

গোলোকদা বললে—ইয়েস স্যার—

—ইনি যা বলছেন সব সত্যি? তুমি বাড়িতে মাইনের একটা পয়সাও দাও না?

গোলোকদা বললে—হ্যাঁ স্যার, দিই—

সাহেব বললে—তা'হলে তোমার ওয়াইফ্ কি বলতে চাও মিথ্যে কথা বলছে! ইজ শী টেলিং লাই?

বড়বাবু গোলোকদা'র বউকে বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন—কী, আপনাকে মাইনের টাকা দেয় না আপনার স্বামী?

গোলোকদার বউ বললে—কখনও কখনও গিয়ে বাজার করে দেয়, দুধের দাম দেয়। রেশনের টাকা দেয়—

বড়বাবু আবার ইংরিজীতে সাহেবকে সব অনুবাদ করে শোনালে।

সাহেব বললে—আর রাত্রে কোনও দিন তুমি বাড়ি থাকো না কেন?

গোলোকদা বললে—রাতের বেলায় আমি স্যার অনেক লোককে ম্যাসাজ করি। ম্যাসাজ করে ঘুম পাড়িয়ে দিই। সেইজন্যে অনেক দিন—রাত্রে বাড়ি ফিরতে পারি না। সেখানেই শুয়ে থাকি—

সাহেব দু'পক্ষের সব কথা শুনলে। শুনে বললে—না, এবার থেকে মাইনেটা গোলোকের বউ এর হাতে দেওয়া হবে, এই আমার অর্ডার—

গোলোকদার বউ বলল—কিন্তু উনি যদি টাকাগুলো আমার হাত থেকে কেড়ে নেন?

সাহেব বললে—তুমি আমার কাছে এসে কমপ্লেন করবে, আমি গোলোকের চাকরিটা খাবো।

তারপর গোলোক মজুমদারের দিকে চেয়ে বকতে লাগলো।

বললে—তুমি এত বড় পাষণ্ড। তোমার ইনোসেন্ট ওয়াইফ্কে তুমি এত কষ্ট দাও? আমাদের সমাজে যদি হতো, তা'হলে তোমার বউ তোমাকে ডিভোর্স করত, তা জানো? আর তাই-ই নয়, তার খেসারতও দিতে হত—

গোলোক মজুমদার মাথা নীচু করে রইল। সাহেবের মুখের ওপর কোনও কথা বললে না। সাহেব বললে—এবারে যাও, সেকশানে যাও—

সবাই নিজের সেকশানে চলে এলো। খানিক পরেই পে-ক্লার্ক এসে হাজির। এক-একজনের নাম ডাকা হচ্ছে, আর এক-একজন করে

মাইনে নিয়ে যাচ্ছে। শেষকালে গোলোক মজুমদারের নাম ডাকলে পে-ক্লার্ক।

গোলোকদা মাথা নীচু করে পাতার ঠিক জায়গাতে নাম সই করে মাইনেটা নিতে যাচ্ছিল। বড়বাবু বললেন, উঁহু-উঁহু, ওকে নয়—ওকে নয়, ওঁর বউকে টাকাটা দিতে হবে—

বলে গোলোকদার বউকে বললে—আপনি টাকাটা নিন—

গোলোকদার বউ প্রথমে দ্বিধা করছিলো। কিন্তু বড়বাবু বললে—ভয় কী, আপনি নিন মাইনেটা। টাকাটা গুণে নিন—ঠিক দেড়'শো টাকা আছে তো?

গোলোকদার বউ টাকাগুলো গুণে নিয়ে মাথা নেড়ে বললে—হ্যাঁ—

বড়বাবু বললেন—যান, এইবার বাড়ি চলে যান। যদি গোলোক মজুমদার আপনার কাছ থেকে টাকা কেড়ে নেন তো আপনি অফিসে আমাকে বলবেন, আমি আপনাকে সাহেবের কাছে নিয়ে যাবো। সাহেব গোলোকের চাকরি খেয়ে নেবে—

গোলোকের বউ বললে—আপনারা একটু বলে দেবেন, যেন উনি রাত্রিরে বাড়ি থাকেন। দিনের বেলায় যেখানে খুশী থাকুন রাত্রিরে যেন বাড়িতে আসেন। আর যেন রেস্ না খেলেন—

বড়বাবু বলে দিলেন—সাহেবকে আমি সব বলে দেবো, সাহেব সব ঠিক করে দেবে। সাহেব আমাদের খুব ভালো লোক। রাত্তিরে বাড়িতে না থাকলে গোলোকের চাকরি খেয়ে নেবে সাহেব—

গোলোকদার বউ ভয় পেয়ে গেল।

বললে—ওঁর চাকরি খাবেন না। চাকরি খেলে আমরা খাবো কি?

সেদিন মাইনেটা নিয়ে গোলোকদার বউ বাড়ি চলে গেলো।

আবার অফিসে কাজ আরম্ভ হয়ে গেলো। তবে মাইনের দিনে অফিসে টিফিন-রুমে যেমন ভীড় বাড়ে, তেমনি অফিসের কাজ করার দিকে তেমন মন থাকে না কারো।

আমি এক ফাঁকে বললাম—তা'হলে তোমার কি হবে গোলোকদা? মাইনেটা তো হাতে পেলে না—

গোলোকদা বললো—মাইনে না পেলুম তো বয়েই গেল।

—সারা মাস তোমার চলবে কী করে?

গোলোকদা বললে—নাতুবাবুর কল্যাণে আমার কি টাকার অভাব আছে রে! এই দেখ্! আমার কত টাকা—বলে পকেট থেকে মানি-ব্যাগ বার করে তার ভেতর থেকে একগোছা নোট বার করলো।

বললে—এই দেখ, আমার কত টাকা আছে—

আমি দেখলাম, এক গাদা নোট !

গোলোকদা বললে—প্রায় পাঁচশো হবে—

জিজ্ঞেস করলাম—এত টাকা কোথা থেকে পেলে—

গোলোকদা বললে—নাতুবাবুর স্ত্রী দিয়েছে—

—নাতুবাবুর স্ত্রী ? তা এত টাকা তোমাকে দিয়েছেন কেন ?

গোলোকদা বললো—আমি যে নাতুবাবুকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি—

বললাম—তা—এত টাকা ? মাসে পাঁচশো টাকা দেয় তোমাকে ?

গোলোকদা বললে—মাইনে তো পঞ্চাশ টাকা মাত্র, কিন্তু নাতুবাবুর বউ আমার ওপর খুশী হয়ে যা চাই, তাই দেয় আমাকে—

আমি তো অবাক। বললাম—কেন ?

গোলোকদা বললে—নাতুবাবু ঘুমিয়ে পড়লে তো নাতুবাবুর বউ-এরই সুবিধে—

—কেন ? নাতুবাবু ঘুমিয়ে পড়লে তার বউ-এর সুবিধে কেন ?

গোলোকদা বললে—আছে—আছে, সে সব অনেক কথা। তোকে অন্য একদিন বলবো সে-কথা ?

জিজ্ঞেস করলাম—আজ রাত্রে বাড়ি গিয়ে বউদির সঙ্গে খুব ঝগড়া করবে তো ?

গোলোকদা বললে—আজ রাত্তিরে তো বাড়ি যাবো না।

বললাম—আজ রাত্তিরে বাড়ি যাবে না তো শোবে কোথায়, খাবে কোথায় ?

গোলোকদা বললে—নাতুবাবুর বাড়িতেই খাব আর নাতুবাবুর বাড়িতেই শোব—

কথাগুলো বলে গোলোকদা এক রহস্যময় হাসি হাসতে লাগলো।

আমার কৌতূহল বেড়ে গেল গোলোকদার রহস্যময় হাসি দেখে।

বললাম—অফিসের পর তোমার বাকী গল্পটা শুনবো গোলোকদা—

গোলোকদা বললে--আজকে সময় হবে না রে, আজকে অফিসের ছুটি হবার সঙ্গে-সঙ্গে ট্যাক্সি ধরতে হবে। খুব তাড়া আছে—

—কীসের তাড়া তোমার এত ?

গোলোকদা বললে—নাতুবাবুর বউকে একটা সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতে হবে—

আশ্চর্য ! আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম গোলোকদার কথা শুনে। অত বড়লোকের বউ গোলোকদার সঙ্গে সিনেমায় যাবে।

আমি বললাম—তুমি যখন এত টাকা পাও, তখন আবার চাকরি করছো কেন ? চাকরি না করলেই হয় তোমার !

গোলোকদা বললে—দেখ, ও-চাকরি কবে আছে, কবে নেই। নাতুবাবু যদি কোনও দিন জেনে যায় তো আমাকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু এ হচ্ছে গভর্মেণ্টের চাকরি, এর মার নেই। এর পেনসন আছে, গ্র্যাচুইটি আছে। ফ্রি পাশ আছে। এ আমার সিঁথির সিঁদুর, এ আমার লক্ষ্মী! এটা কি ছাড়তে আছে?

আমি বললাম—নাতুবাবুর বউ দেখতে কেমন?

গোলোকদা বললে—খুব সুন্দরী। খুব সুন্দরী তো বটেই, তার ওপর ছেলে-মেয়ে নেই বলে খুব আঁট-সাঁট শরীর।

—তা তোমার সঙ্গে সিনেমায় যাবে কেন? আর কেউ নেই?

গোলকদা বললে—আর কে থাকবে? কেবল চাকর-ঝি এই সব। তাদের সঙ্গে তো সিনেমা যেতে পারে না। একজন বিশ্বাসী পুরুষ মানুষ তো চাই—

বললাম—তুমি যে নাতুবাবুর বউকে নিয়ে সিনেমায় যাও, তা নাতুবাবু জানে?

গোলকদা বললে—তা জানবে না? নাতুবাবু তো একমাত্র আমাকেই বিশ্বাস করে। আমি ছাড়া কাউকে বিশ্বাসই করে না—

—কেন?

গোলোকদা বললে—আমি আছি বলে তো নাতুবাবু এখনো বেঁচে আছে। আমি যাবার আগে কত ওষুধ খেয়েছে, কত ইঞ্জেকসান নিয়ে তবে ঘুমোতে পেরেছে। এখন ওষুধও খেতে হয় না, ইঞ্জেকসানও দিতে হয় না। এখন অনেক টাকা বেঁচে গেছে। বলতে গেলে আমি তাঁকে পুনর্জীবন দিয়েছি হে। তাই আমার ওপর খুব কৃতজ্ঞ। তাই আমাকে ছাড়তে চায় না মোটে। এই অফিস থেকে আমি সোজা চলে যাব সেখানে। তারপর সিনেমা দেখে যখন বাড়ি ফিরবো তখন আমরা তিন জনে এক সঙ্গে খেতে বসবো। আমার জন্যে রোজ মুরগী আসবে বাড়িতে। আমার যাতে স্বাস্থ্য ভালো থাকে সেদিকে নাতুবাবুর নজর।

—তারপর?

—তারপর সাড়ে ন'টার পর নাতুবাবু বিছানায় গিয়ে শোবে। আমি তখন তাঁর ম্যাসাজিং শুরু করবো। রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত ম্যাসাজিং করলে তার ঘুম আসবে। ঘুম আসবার আগে আমাকে বলবে—তুমি আজ আর এত রাত্তিরে বাড়ি যেও না গোলক, তুমি এখানেই শুয়ে থাকো আজ। নইলে তোমায় অত দূর যেতে হবে—

ততদিনে গোলকদা বাড়ির গিন্নির সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে ফেলেছে। এক সঙ্গে সিনেমা দেখা, এক সঙ্গে খাওয়া, আর এক সঙ্গে।

নাতুবাবু নিজের স্ত্রীকে বলতো—ওকে একটু ভালো করে পেট ভরে খাওয়াবে—

নাতুবাবুর স্ত্রীকে বলতে হতো না। আগে বলতে গেলে বাড়িতে খাবার লোকই ছিল না। মাত্র তো দু'টি প্রাণী! কর্তা আর গিন্নি। নন্দকিশোর চিরকালের রোগী মানুষ। বেশী খেলে পেটে সহ্য হয় না। একলা স্ত্রী আর কত খাবে? তাই জন্যেই রান্না-টান্নার বেশি বালাই ছিল না।

গোলোকদা যাবার পর থেকেই নাতুবাবুর সংসার আবার জম-জমাট হয়ে উঠলো। বিশেষ করে স্ত্রী'র অন্ততঃ একটা কথা বলার লোক হলো। অন্য দিন ভাত-টাত খেয়ে অফিসে চলে যেতো গোলকদা, ন'টা সাড়ে ন'টার সময় ভাত তৈরী করে দিতো ঠাকুর।

সেই ভাত খেয়ে অফিসে দৌড়তো গোলকদা।

যাবার সময় বৌদি বলতো—আজকে একটু সকাল-সকাল আসবে তুমি, একটা সিনেমা দেখতে যাবো—

গোলকদা বলত—আমি কেন, দাদাকে নিয়ে সিনেমায় যাও না—

নাতুবাবু বলত—না-না, আমি সিনেমায় যাব না, আমার ওসব সিনেমা-টিনেমা দেখতে ভালো লাগে না। তুমিই বরং যাও তোমার বৌদিকে নিয়ে—

আর শুধু কি তাই! কাপড়-চোপড় কেনার কাজ থাকে মানুষের। সঙ্গে কে যাবে? ওই গোলোক। গোলোক মজুমদার আছে! কালী-ঘাটে পূজা দিতে যাবে। সঙ্গে কে যাবে? ওই গোলোক মজুমদার আছে!

একদিন নাতুবাবুর বোধহয় লক্ষ্য পড়ল। বললে—আরে গোলোক, তোমার সার্ট-প্যান্টের এ কী দশা হয়েছে?

গোলোকদা বললে—কী করবো দাদা, সার্ট-প্যান্টের কেনবার পয়সা কোথায়?

নাতুবাবু অবাক হয়ে গেল। বললে—সেকি? তোমার পয়সা না থাকে, আমার পয়সা আছে, তোমার বৌদিকে নিয়ে যাও তুমি, নতুন সার্ট-প্যান্টের অর্ডার দিয়ে এসো—

খাওয়া-পড়ার সমস্ত রকম ঢালোয়া বন্দোবস্ত হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

এসেছিল গা-হাত-পা টিপে দিতে, আর কর্তার ঘুম পাড়িয়ে দিতে। শেষ পর্যন্ত কর্তার ঘুম এসে গেল আর গোলোকদা হয়ে গেল বাড়ির ম্যানেজার, আবার বাড়ির মালিক। বাড়ির মালিকের চেয়েও বেশি ক্ষমতা গোলোক মজুমদারের। বাড়ির চাকর-বাকর-ঝি ঠাকুর সবাই হুকুম পালন করতো গোলোকদার।

ঠাকুর যখন গিন্নিকে জিজ্ঞেস করতো—আজ কী রান্না হবে মা?

গিন্নি বলত—আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন, জিজ্ঞেস করো ম্যানেজারকে—

ম্যানেজারবাবু মানে গোলোকদাকে।

এক-একদিন সময় পেলেই গোলোকদা চাকরদের নিয়ে বাজারে যেতো মুরগী-মাছ-আলু-পটল যাবতীয় তরি-তরকারি কিনে আনত গোলোকদা। নাতুবাবু খেয়ে খুব খুশী। বলতো আজকে তো ভালো রান্না করেছে ঠাকুর—

গিন্নি বলতো—ভালো রান্না করেছে না ছাই। কে বাজার করেছে তাই জিজ্ঞেস করো—

নাতুবাবু বললে—কে বাজার করেছে?

—তোমার গোলোক!

—তাই বলো। এবার থেকে রোজ বাজার করবে গোলোক—

অফিস থেকে ফেরবার পর নাতুবাবু গোলোক মজুমদারকে ডাকলে। বললে—এবার থেকে রোজ তুমি বাজার করবে, বুঝলে? বেটারা সব চোর। আমার টাকাও খাবে, আবার আমার নেমকহারামিও করবে।

সেই থেকে গোলোকদার অন্য সংসার, অন্য জীবন। তখন থেকে নাতুবাবুর সংসারটাই হলো গোলোকদার সংসার। নিজের সংসার দেখার আর সময় পেত না। ওই তখনই নিজের ছেলে-বউ সব পর হয়ে গেল। এই সময়েই গোলোকদা মাঝে-মাঝে বলা-নেই, কওয়া-নেই অফিস কামাই করতে লাগলো।

সেই-ই আমি প্রথম গোলোকদার বাড়ি গিয়ে শুনতে পেলাম গোলোকদা নিজের বাড়ি আসে না। শ্যামবাজারে পড়ে থাকে দিন-রাত। সেই প্রথম জানতে পারলুম কে গোলোকদার স্যুট তৈরি করবার টাকা দেয়।

* * *

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

গোলোকদা বললে—তোকে সব কথা বলছি, যেন কাউকে বলিসনি—

বললাম—না, কাউকে বলব না—

গোলোকদা বললে, না বলিস নি। আমার জীবন ভাই এক অদ্ভুত জীবন। সবাই যেমন বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার করে, তা আমার কপালে নেই। কারণ, ওই নাতুবাবুর বউ। স্বামী থেকেও তার স্বামী নেই, স্ত্রী হয়েও তার ছেলেমেয়ে নেই। বলতে গেলে আমি একেবারে হয়ে গেলাম তার সব কিছু। এ যে কী করতে কী সব হয়ে গেল, তা আমি নিজেও কল্পনা করতে পারি না। অথচ আমার স্ত্রী তো কোনও অন্যায় করেনি, আমার ছেলে থাকতেও তাদের ওপর আমি বাপের কর্তব্য পালন করতে পারিনি। মাঝে-মাঝে তাদের জন্যে আমার খুবই কষ্ট হয় ভাই, কিন্তু আমি কী করবো বল? আমি শ্যামবাজারের নাতুবাবুর বাড়িতে না থাকলে যে ওদের কিছুই চলে না ওদের বাড়িতে সব কাজেই আমাকে চাই। রেণু বৌদি আমাকে কিছুতেই রাতে বাড়ি আসতে দেবে না।

আমি বললাম—রেণু বৌদি ? রেণু কার নাম ?

গোলোকদা বললে—ওই নাতুবাবুর বউয়ের নাম রেণু। আমি ডাকতুম রেণু বৌদি বলে। তা অতবড় বাড়ি। আমি ও বাড়িতে যাবার আগে বাড়িটা খাঁ-খাঁ করতো, আমি যাবার পর থেকে বাড়ির চেহারাই বদলে গেল।

রেণু বউদি বলতো—তুমি আসার আগে এ-বাড়িতে আমার মন টিঁকতো না। এখন যতক্ষণ তুমি অফিসে থাকো, ততক্ষণ আমার খারাপ লাগে। অফিসের পর তুমি বাড়ি এলে আমার আবার সব ভালো লাগতে আরম্ভ করে। তুমি এবার ও-চাকরি ছেড়ে দাও। মাইনে তো মাত্র দেড়শো টাকা পাও, ও-চাকরি করে তোমার কীলাভ ?

আমি বলতাম—চাকরিটা না থাকলে আমার বউ আর ছেলেরা কী খাবে ? বাড়ি-ভাড়া আছে, ছেলেদের ইস্কুলের মাইনে আছে। আমার বউ এসে প্রতি মাসের পয়লা তারিখে অফিস থেকে মাইনেটা নিয়ে যায়। সাহেব সেই অর্ডার দিয়ে দিয়েছে।

আমি বললাম—তা বউ ছেলেদের তুমি শ্যামবাজারে ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে দিতে পারো, তাতে বাড়ি ভাড়াও লাগবে না, আলাদা খাই-খরচও লাগবে না—

গোলোকদা বললে—না ভাই, তা করা সম্ভব নয়—

বললাম—তোমার ওপর তোমার বউ-এরও তো একটা দাবী আছে—

গোলোক বললে—না, মেয়েরা আর সব সহ্য করতে পারে, সতীন কিছুতেই সহ্য করবে না। শ্যামবাজারের নাতুবাবুর অনেক টাকা। টাকাটা আমার কাছে বড়, না বউ বড়, বল ?

আমি আর কী বলবো ? গোলোকদা যা ভাল বুঝবে, তাই করবে! আমার কথা শুনবে কেন ?

গোলোকদা বলতে লাগলো—সেখানে আমার কত খাতির তা জানিস ? আমি মাংস খেতে ভালোবাসি, তাই আমার জন্যে রোজ মাংস আসে। আমার ভাড়াটে বাড়িও তো দেখিস, চারদিকে বস্তি, বাজারের দুর্গন্ধ। আর শ্যামবাজারের সে বাড়ি, সে কী আরামের জায়গা। সে কী গদীওয়ালা বিছানা, সেখানে শুতে যে কী আরাম। সেখানকার ওই আরাম ছেড়ে আমি আমার ওই বস্তির বাড়িতে কী করে থাকি বল ? আমাকে তো নাতুবাবু ছাড়তে চায় না। রেণু বৌদি আমাকে বলে—তুমি চলে যেও না গোলোক, তুমি চলে গেলেই আবার যদি কর্তার ঘুমের ব্যাঘাত হয়, তখন ?

আমি বললাম—কিন্তু তুমি তো তাহলে খুব স্বার্থপর গোলোকদা—

গোলোকদা বললে—আমাকে স্বার্থপর বলছিস তুই ? ধর, নাতুবাবুর তো ছেলে-মেয়ে কেউ নেই, যদি এখন নাতুবাবু মারা যায়। তখন তো ওই

সব সম্পত্তি আমি পাবো! নাতুবাবু তো রোগী মানুষ, কতদিনই বা আর বাঁচবে। সারা জীবন বড়বাজারে গদিতে বসে শরীরটাকে ভেঙেছে! নাতুবাবু মারা গেলে তখন তো রেণু বউদির আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তখন সেই টাকা দিয়ে আমি আমার ছেলেদের মানুষ করবো। তারা টাকার অভাবেই তো অত কষ্ট করছে, তখন আর সে-কষ্ট করতে হবে না—

আমি বললাম—নাতুবাবুর তো এখন ঘুম হচ্ছে, এখন তো তাড়াতাড়ি আর মরছে না নাতুবাবু!

গোলোকদা বললে—তাড়াতাড়ি না-ই বা মরলো। কিন্তু বয়েস তো হয়েছে। রেণু বউদির সঙ্গে নাতুবাবুর কুড়ি বছর বয়সের তফাৎ। নাতুবাবু তো রাত সাড়ে দশটা বাজতে না-বাজতেই ঘুমিয়ে পড়ে, তখন আমি যদি না থাকতুম, তো রেণু বউদির রাত কী করে কাটতো?

গোলোকদার কথা শুনে আমার অবাক লাগলো। জীবনে কত রকম চরিত্র দেখেছি। কিন্তু এ-রকম চরিত্র আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়লো না। তারপর থেকে প্রতি মাসে গোলোকদার বউ এসে গোলোকদার মাইনেটা নিয়ে যেত। কিন্তু তাতে গোলোকদার কোনও অসুবিধা হতো না। দিন-দিন ভালো-ভালো সার্ট-প্যান্ট পরে অফিসে আসতো গোলোকদা। টিফিন রুমে গিয়ে আমাকে মাংস খাওয়াতো, চপ কাটলেট খাওয়াতো।

আমি জিজ্ঞেস করতাম—আচ্ছা গোলোকদা, তোমার রেণু বউদি যে তোমাকে এত টাকা দেয়, তা নাতুবাবু জানে?

গোলোকদা আমার প্রশ্ন শুনে হাসতো।

বলতো—না, নাতুবাবু কিছুই জানতে পারে না। নাতুবাবুর সব টাকা তো রেণু বউদির হাতে থাকে কিনা। আমি যত টাকা চাইবো, তত টাকা দেবে। আমার কোনও টাকার অভাব নেই। এই দেখ—বলে পকেট থেকে ব্যাগ বার করে আমাকে খুলে দেখাতো।

বলতো—এই দেখ, গুণে দেখ, কত টাকা আছে—

আমি দেখতাম। কখনও দেখেছি তিনশো টাকা, কখনো দেড়'শো, আবার কখনও পাঁচশো টাকাও রয়েছে। দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। বলতাম—এত টাকা যখন পাচ্ছো, তখন আর কেন মিছিমিছি চাকরি করছো তুমি? চাকরি ছেড়ে দিলেই তো পারো—

গোলোকদা বলতো—দূর, সেই ভুল কখনও করতে আছে? চাকরি হলো লক্ষ্মী! আর এ-টাকাগুলো হচ্ছে ফাউ। এ কবে আছে, কবে নেই। নাতুবাবু যদি কখনও জানতে পারে, তখন তো আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে—

—কী জানতে পারবে? তুমি তো কোনও অন্যায় করো না—

গোলোকদা বলতো—আমি যে রেণু বউদির সঙ্গে এক বিছানায় শুই, এটা তো জানতে পারে না। নাতুবাবু তো তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়!

আমি আর কী বলবো! এ-কথা শোনবার পর আমার আর কিছু বলবার থাকতো না।

* * *

এ জীবনে কোটিপতির সঙ্গেও মিশেছি, আবার ভিখিরীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হয়েছে আমাকে। তাদের অনেকের কথা নিয়ে অনেক গল্প-উপন্যাস লিখেছি। রাজা-জমিদার-নবাব নিয়ে যখন অনেক লিখেছি, আবার গুণ্ডা-মাতাল-চোরদের নিয়েও অনেক লিখতে হয়েছে।

কিন্তু গোলকদার মত চরিত্র নিয়ে আগে কখনও লেখবার অবকাশ আমার হয় নি। এবার পুরীর 'মাসিমার হোটেলে' না উঠলে আজ সেই গোলোকদার কথা হয়তো লিখতুমও না।

মনে আছে, হঠাৎ একদিন গোলোকদা চাকরি ছেড়ে দিলো।

দেখে আমাদের অফিসসুদ্দু লোক সবাই অবাক হয়ে গেলো। বাঙালীর ছেলে হয়ে চাকরি ছেড়ে দেওয়া একটা অস্বাভাবিক ঘটনা।

অফিসে শেষ দিনটায় আমাকে আড়ালে ডাকলে গোলোকদা।

আমি বললাম—চাকরিটা ছাড়তে গেলে কেন গোলোকদা? বেশ তো চলছিলো। এই রকম করে বরাবর চালিয়ে যেতে পারতে!

গোলোকদা তার শ্যামবাজারের ঠিকানাটা আমাকে দিলো।

আমি আমার নোট বইতে সেটা লিখে রেখে দিলাম।

বললে—তুই সময় পেলে যদি এই ঠিকানায় যাস্ তো আমার সঙ্গে দেখা করিস, তোকে আমি সব বলবো।

বললাম—ঠিক আছে। গোলোকদাকে সবাই সেদিন বিদায় দিলো। সবাই জানতো গোলোকদার চরিত্র, কেউ-কেউ নিন্দা করতে লাগল গোলোকদাকে, কেউ-কেউ আবার হিংসে করতেও লাগলো। পঞ্চাননবাবু বললেন, আমাদের কপালে এ-রকম একজন মেয়ে মানুষ জোটে না রে, কী মন্দ কপাল নিয়ে আমরা জন্মেছি—

গোলোক মজুমদারের ভাগ্য দেখে অফিসসুদ্দু লোক হিংসে করতে লাগলো। কিন্তু লোকে আবার 'ছি,-ছি' ও করতে লাগল। কোথায় দেড়শো টাকা মাইনের একজন কেরাণী, আর কোথায় একেবারে লক্ষপতি মানুষের প্রিয়পাত্র। তখনকার দিনে লক্ষপতি মানুষের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কোটি-কোটি মানুষের মধ্যে খুঁজলে একজন-দু'জন লক্ষপতি পাওয়া যেতো।

সেই রকম একজন লক্ষপতি মানুষের প্রিয়পাত্র হতে পেরেছে গোলোক মজুমদার, এটাতে হিংসে হওয়া স্বাভাবিক। হোক না সে লোকটা চরিত্রহীন,

হোক না সে লোক নিজের সংসার দেখে না, কিন্তু তার নিজের তো ষোল আনা আরাম। নন্দকিশোর দত্ত'র ছেলে-মেয়ে কিছু নেই। ছেলেমেয়ে থাকলে বা একটা কথা ছিল। তার ওপর নাহুবাবুর অসুখ সারিয়েছে, তাতে একটা কৃতজ্ঞতাবোধ তো থাকবেই। সেই কারণেই ও-বাড়িতে তার এতো খাতির, এতো প্রতিপত্তি! এ রকম ক'জনের ভাগ্যে ঘটে?

কাশীনাথবাবু বুড়ো মানুষ, গোলোক মজুমদার চাকরি ছেড়ে দেওয়াতে তিনিও যেন কেমন বিচলিত হয়ে উঠলেন খানিকক্ষণের জন্যে।

বললেন—গোল্লায় যাবে গোলোকটা, দেখে নিও তোমরা, ও ঠিক গোল্লায় যাবে। পাপ ওর কপালে সইবে না। ওর ছেলে-বউ উপোস করে মরবে এবার, তাদের অভিশাপ লাগবে না মনে করেছো—

আমার নিজের একটু অসুবিধে হলো গোলোকদা চলে যাওয়াতে। গোলোকদার সঙ্গেই আমিই যা কিছু গল্প-টল্প করতাম। টিফিন রুমে নিয়ে গোলোকদাই আমাকে খাওয়াতো। নইলে নিজের জীবনের গোপনীয় কথাগুলো একলা আমাকেই বা বলতো কেন?

এর পর একদিন রবিবারে শ্যামবাজারের দিকে গিয়েছিলাম। তাও অনেকদিন পরে। ঠিকানা খুঁজে গেলাম সেই নন্দকিশোর দত্তের বাড়িতে। ভাবলুম যদি দেখা পাই গোলোকদার। বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়াতেই কে একজন এসে দরজা খুলে দিলো।

জিজ্ঞেস করলাম—গোলোক মজুমদারবাবু বাড়িতে আছেন?

লোকটা জিজ্ঞেস করলো—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

আমি বললাম—গিয়ে বলো গে যাও, বি-এন-আর অফিস থেকে মিত্তির এসেছে, ওই বললেই তিনি আমাকে চিনতে পারবেন—

লোকটা ভেতরে খবরটা দিতে চলে গেলো।

আর খানিক পরেই দৌড়তে-দৌড়তে গোলোকদা নিজে এসে হাজির। এসেই আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো। তারপর আমাকে টানতে-টানতে ভেতরে নিয়ে চললো। চলতে-চলতে আমাকে বলতে লাগলো—এখনও তোর মনে আছে আমাকে?

বললাম—মনে থাকবে না? তোমাকে কি ভুলতে পারি? তুমি কত খাইয়েছো আমাকে। কত চপ-কাটলেট খাইয়েছো আমাকে—

গোলোকদা আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। খুব সাজানো ঘরটা। চারিদিকে সোফা-সেট, গদি দেওয়া ডিভান।

গোলোকদা বললো—কত বছর পরে তুই এলি? এখন কোথায় কাজ করছিস্?

বললাম—সেই একই চেয়ারে আর একই টেবিলে—

গোলোকদা জিজ্ঞেস করলো—আর বড়বাবু, সেই কাশীনাথবাবু ?

—তিনি তো রিটায়ার করে গেছেন, তার জায়গায় বসেছেন পঞ্চাননবাবু—

—আর রবিনসন সাহেব ?

—রবিনসন সাহেব বিলেত চলে গেছে, তার জায়গায় এখন কাজ করছেন বি, কে মজুমদার সাহেব।

তারপর সকলের খোঁজ খবর নেবার পর আমি বললাম—এইবার বলো, তুমি কেমন আছো ?

—আমি ভালোই আছি।

জিজ্ঞেস করলাম, আর তোমার সেই নন্দকিশোর দত্ত ? নাড়ুবাবু ?

গোলোকদা বললো—নাড়ুবাবু তো এক বছর হলো মারা গেছে—

বললাম—সে-কী ? তুমি অত চেষ্টা করে তাঁর ঘুম পাড়িয়ে দিতে তবু কী অসুখ হলো শেষকালে ?

গোলোকদা বললো—কী আবার হবে, কিছুই হয়নি। হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা গেলেন। খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ করলুম। অনেক লোক খাইয়েছি। প্রায় দেড় হাজার লোক নিয়ম-ভঙ্গের দিন খেয়ে গেছে—

—আর তোমার সেই বউদি ?

—বউদি সেই রকমই আছে !

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—সারাদিন তুমি সময় কাটাও কী করে।

গোলোকদা বললো—মামলা !

—মামলা ? কার সঙ্গে মামলা—কী নিয়ে মামলা ?

গোলোকদা বললো—জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলা। তারা সব দূর সম্পর্কে আত্মীয়। তারা হাইকোর্টে মামলা জুড়ে দিয়েছে। আমি সারাদিন কোর্টে গিয়ে উকিল-অ্যাটর্নী-ব্যারিস্টারদের সঙ্গে দেখা-শোনা করি। তদ্‌বির-তদারক না করলে কি মামলায় জেতা যায় ? মামলার আসল কাজই তো তদ্‌বির—

জিজ্ঞেস করলাম—আর তোমার বউ আর ছেলেরা ?

গোলোকদা বললো—আমি বউকে ডাইভোর্স করে দিয়েছি, আমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে—

আমি চমকে উঠেছি খবরটা শুনে। বললাম—সে-কী ? কেন ?

গোলোকদা বললো—ডাইভোর্স না করে যে উপায় ছিলো না।

—কেন ?

গোলোকদা বললো—উকিল-ব্যারিস্টাররা যে আমাকে বললো, ডাইভোর্স করতে। না-হলে তো সেই যে রেণু বউদির কথা বলছিলুম, তাকে তো বিয়ে করতে পারতুম না—

গোলোকদার কথায় আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম—

বললাম—তুমি রেণু বউদিকে বিয়ে করেছ নাকি ?

গোলোকদা বললো—না করে যে উপায় ছিলো না। উকিল-ব্যারিস্টাররা আমাকে সেইরকম উপদেশ দিলো যে। তা-না করলে বিধবার সম্পত্তি সব সাত ভূতে লুটে-পুটে খাবে যে !

—তুমি তা'হলে এখন এই বাড়ির মালিক ?

গোলোকদা বললো—সেই জোরেই তো এই মামলা লড়ছি, নইলে জ্ঞাতিরা সব লুট-পাট করে এতোদিনে নিয়ে নিতো।

বললাম—তাহ'লে তোমার আগেকার বউ-ছেলেরা কী করছে ? তাদের অবস্থা কেমন ? তারা কী করে চালাচ্ছে।

গোলোকদা বললো—তারা আরামেই আছে। আমি তাদের পাঁচশো টাকা করে মাসোহারা দিই খোর-পোষ হিসেবে। তাদের কোনও অভাব রাখিনি আমি।

বলতে-বলতে ভেতর থেকে আমার জন্যে জল-খাবার এলো। বড় বড় রাজভোগ চারটে আর তার সঙ্গে দু'টো কাটলেট আর চা এক কাপ।

আমি ইতস্তত করে বললাম—তুমি আবার এ-সব খাবারের ব্যবস্থা করতে গেলে কেন ?

গোলোকদা বললো—ফোকটের খাবার খেয়ে নে-না। এ-কি আমার নিজের উপায় করা টাকা ? এ-তো আমি সব ফোকটে পেয়েছি। আমি যদি এবাড়িতে না-থাকতুম, তা'হলে তো নাদুবাবুর জ্ঞাতি-গুষ্টিরাই তো সব একা-একা ভোগ করতো !

বললাম—কতদিন এ মামলা চলবে ?

গোলোকদা বললো—অনন্তকাল ধরে। হাইকোর্টের সিভিল মামলা কি অল্প দিনে মেটে ? এ মামলা অনাদিকাল ধরে চলবে !

আমি সব শুনে নিজের মনেই ভাবতে লাগলাম, গোলোকদার কী বিচিত্র ভাগ্য। ছিলো রেলের সামান্য একজন কেরাণী, সেই মানুষ হয়ে গেলো লাখপতি। সঙ্গে আবার পরের বউও পেলে।

সেদিন আর বেশিক্ষণ বসিনি সেখানে। বেলা হয়ে যাচ্ছিল। আমি উঠে পড়লাম।

আসবার সময় গোলোকদা বললো—আবার আসিস একদিন। ছুটির দিন দেখে আসবি, তা'হলে আমাকে পাবি। অন্য দিন আমাকে হাইকোর্টে যেতে হয়। এখন হাইকোর্টকেই আমি আমার ঘর-বাড়ি করে ফেলেছি।

আর দাঁড়াই নি সেখানে। সারা রাস্তাটা বাসে আসতে-আসতে আমার কেবল গোলোকদার কথা মনে পড়ছিল।

* * *

সত্যিই, মানুষের ভাগ্য কাকে যে কখন কোন দিকে নিয়ে যায়, তা কেউ

বলতে পারে না। নিজের বউ ছেলেরা পড়ে রইলো, আর কী অদ্ভুত ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে কত টাকার মালিক হয়ে বসলো। গোলোকদার চেহারাটা পর্যন্ত বদলে গেছে। আগে রোগা-রোগা চেহারা ছিল, এখন ঘি-মাছ-মাংস খেয়ে খেয়ে কত মোটা হয়ে গিয়েছে।

এরপর আর বহুদিন শ্যামবাজারের দিকে যেতে পারি নি। আর তখন আমার নিজেরও অনেক সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছিলাম।

সেবার কী একটা কারণে আমার শ্যামবাজারে যাবার দরকার হয়ে পড়েছিল। ভাবলাম—যাই, একবার গোলোকদার সঙ্গে দেখা করে যাই। সেটা ছুটির দিন। ছুটির দিনে কোর্ট খোলা থাকে না, সুতরাং গোলোকদা নিশ্চয়ই বাড়ি থাকবে। আবার সেই আগেকার মতো চারটে রাজভোগ, আর দু'টো কাটলেট আর চা আসবে।

গোলোকদার বাড়িতে যাবার রাস্তায় ভাবছিলাম—কী ভাগ্য সঙ্গে আবার সুন্দরী বউ। এ আবার ক'জনের ভাগ্যে ঘটে!

বাড়ির সামনে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লাম।

ভেতর থেকে উত্তর এলো—কে?

—আমি গোলোক মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

দরজাটা খুলে গেলো। দেখি, একজন বাড়ির কর্মচারী। আমার দিকে চেয়ে বলল—কে আপনি?

আমি বললাম—বলো আমি বি. এন. আর. অফিসে চাকরি করি।

কর্মচারীটি বললে—তিনি তো নেই—

- নেই মানে? কোর্টে গিয়েছেন বুঝি? আজ তো কোর্ট বন্ধ।

লোকটি বললেন—না, তিনি মারা গেছেন—

আমি হতবাক হয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। জিজ্ঞেস করলাম, কবে মারা গেছেন—

লোকটি বললে—এই দিন পনেরো আগে—

—কী হয়েছিল তাঁর?

লোকটি বললেন—তিনি কোর্টে গিয়েছিলেন। সেখানে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, একদিন পরেই তিনি সেখানে মারা যান।

এর পরের ঘটনা সামান্য। পৃথিবীতে কত মানুষের জন্ম হয় প্রতিদিন! আবার প্রতিদিন কত মানুষের মৃত্যু হয়, তা নিয়ে নিজের আত্মীয়-স্বজন ছাড়া কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু মনে আছে, গোলোকদার এই অপঘাত-মৃত্যু আমাকে বড়ই বিচলিত করেছিল। তাই নিয়ে অফিসেও কিছু আলোচনা হয়েছিল।

কিন্তু সব মৃত্যুর পরেই যা হয় গোলোকদার মৃত্যুর পরও তাই হয়েছিল। অন্য ঘটনার চাপে গোলোকদার এই অপঘাত-মৃত্যুর ঘটনাটা চাপা পড়ে গিয়ে-

ছিলো। তা-নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায়নি। বলতে গেলে আমিও ভুলে গিয়েছিলাম গোলোকদার কথা। কিন্তু এত বছর পরে পুরীতে এই মাসিমার হোটেলে উঠে দেওয়ালে টাঙানো গোলোকদার ছবিটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম—এই ছবি এখানে কেন?

কিন্তু কাকেই বা জিজ্ঞেস করবো। সেদিন আমার ফিরে আসার দিন। রাত দশটায় জগন্নাথ এক্সপ্রেসে কলকাতায় ফিরবো।

সকালবেলাই মাসিমাকে বললাম—আজকে আমি চলে যাচ্ছি—

মাসিমা বললে—আজকেই চলে যাবে বাবা। আরো দু'দিন থাকলে না কেন? জগন্নাথ দেবের কৃপা তো সহজে মেলে না। যখন একবার এসেছো, তখন আরো দু'দিন থাকলে পারতে—

বললাম—অফিসের ছুটি ফুরিয়ে গেল, আর তো থাকা যায় না, আমাকে আজ ফিরে যেতেই হবে। তারপর আবার বললাম—এ ক'দিন খুব আরামে কাটলো আপনার জন্যে—

মাসিমা বললে—আবার যদি আসো তো, এখানেই উঠো, তোমরা খুশী হয়েছো এতেই আমি খুশী। তোমাদের সেবা করেই যেন আমার জীবনটা কেটে যায়। শেষ জীবনে এই জগন্নাথ দেবের চরণে এসে ঠাঁই নিয়েছি, সেইজন্যেই।

আমি বললাম সত্যি আপনার হোটেলটা খুব ভালো। এ-রকম সেবা-যত্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না—রেটও সস্তা। আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে সকলকে পুরীতে এসে আপনার এখানেই উঠতে বলবো -

মাসিমা বললে—আমার তো বেশি টাকা-কড়ি নেই বাবা, নইলে আমি সমুদ্রের ধারে একটা হোটেল করতাম। আমার বড় ছেলে খুব চেষ্টা করছে সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ি করতে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—আপনার বড় ছেলে?

—হ্যাঁ, তাকে তুমি দেখ নি বাবা, সে আমার বড় ভালো ছেলে, আমাকে 'মা' বলতে একেবারে অজ্ঞান!

বললাম—তাকে তো আমি একদিনও দেখি নি।

মাসিমা বললে—তাকে তুমি দেখবে কি করে বাবা। তার মাছের কারবার, ভোরে উঠেই সে চলে যায় সমুদ্রের ধারে। সে মাছের কারবার করে, নুলিয়াদের সঙ্গে তার বন্দোবস্ত আছে, তারা যত মাছ ধরবে, সে-তা দাদন দিয়ে রেখেছে, মাছ কিনে নিয়ে বড়-বড় কোম্পানী আছে তাদেরকে বেচবে!

—আপনার কটি ছে'লে?

—দু'টি। বড় ছেলে মাছের কারবার করে, আর ছোটটি ভুবনেশ্বর কলেজে পড়ায়। শনিবার রাত্রে আসে, রবিবারটা বাড়িতে থাকে, আবার সোমবার ভোরের ট্রেনে ভুবনেশ্বর চলে যায়। ওই দু'টো ছেলেই খুব মাতৃভক্ত,

আমাকে ছু'জনেই বড় ভক্তি করে।

আমি বললাম—আজ তো শনিবার, আজই আসবে ?

মাসিমা বললে—হ্যাঁ, আজকেই সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যেই আসবে, আর সোমবার ভোরবেলা চলে যাবে।

বললাম- -তা'হলে তো আমার সঙ্গে আজই দেখা হবে—

—হ্যাঁ, বড় ছেলের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে—

এর পর আর দাঁড়ালাম না সেখানে।

সকালবেলা চা-জলখাবার খেয়েই মন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করতে গেলাম। যে ক'দিন পুরীতে ছিলাম, রোজই ছু'বার করে মন্দিরে যেতাম জগন্নাথ-দর্শন করতে। মন্দিরটা আমার খুবই ভালো লাগত। ভোরবেলা রাত থাকতে উঠে সমুদ্রের সূর্যোদয় দেখতে যেতাম। আর তারপর বাড়িতে চা আর জলযোগ করে চলে যেতুম মন্দিরে। অনেকক্ষণ থেকে বেলা বারোটার সময় হোটেলে এসে ভাত খেয়ে বিকেল চারটে নাগাদ আবার সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতাম মন্দিরে। নাট-মন্দিরে অসংখ্য লোকের ভিড়ের মধ্যে ধূপ-ধূনো আর ঘি-এর প্রদীপের আলোর প্রভাবে আমি যেন আত্মহারা হয়ে যেতাম।

সেদিন শেষবারের মত পুরী বাস! মন্দির থেকে যখন উঠলাম তখন রাত আটটা প্রায়। আর দেরি করা চলবে না। হোটেলে গিয়ে খাওয়া আছে। বিছানা বাঁধা আছে। স্যুটকেশ গুছানো আছে। অনেক কাজ রয়েছে সেদিন। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলাম।

মাসিমা তাড়াতাড়ি খেতে দিলে। পেঠ ভরে জোর করে করে আমাকে খাইয়ে দিয়ে বললে—আবার এসো বাবা, মাসিমাকে ভুলে যেও না যেন সেবারেও আমার হোটেলে উঠো—

বললাম—নিশ্চয়ই উঠবো—বলে পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিলাম। একটা রিক্সাকে বলা ছিল, সে এসে পৌঁছে গেছে।

হঠাৎ একটা তেইশ-চব্বিশ বছরের ছেলে এসে ঢুকলো। বললে—মা, আমি এসে গেছি—এই বলে মাসিমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে।

মাসিমা বললে—এই আমার ছোট ছেলে বাবা, প্রত্যেক শনিবার এখানে আসবে, তারপর সোমবার ভোরের বাসে ভুবনেশ্বরে চলে যাবে।

বাইরে থেকে আর একজনের গলা শোনা গেলো। তার গলা শুনেই মাসিমা বললে—এই যে বাবা প্রশান্ত, এসেছিস ? আয়—

একটি নবীন যুবক কাছে এসে দাঁড়ালো।

মাসিমা বললে—এই আমার বড় ছেলে। এই আমার দুই ছেলে বাবা, এরা আমার বড় মাতৃভক্ত, মা বলতে এরা একেবারে অজ্ঞান। আমার পুত্র ভাগ্যটা খুব ভাল—

তারপর বলতে লাগলো—কলকাতায় আমার অনেক সম্পত্তি ছিল বাবা, আত্মীয়দের সঙ্গে মামলায় আমার সর্বস্ব গেছে। শ্যামবাজারে আমার মস্ত দু'তলা বাড়ী ছিল। সব উকিল-অ্যাটর্নী-ব্যারীষ্টারের পেছনে নষ্ট হয়েছে। সে-বাড়ী আত্মীয়-স্বজন ভোগ করছে এখন! আর আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই আমি বাবা জগন্নাথের চরণে এসে আশ্রয় নিয়েছি—এখন আমার এই ছেলে দু'টিই ভরসা। এরা না থাকলে আজ আমি না খেয়ে মারা যেতুম!

বললাম—আপনার চেহারার সঙ্গে আপনার ছেলেদের চেহারার কোন মিল নেই কিন্তু···

মাসিমা বললে—এরা তো আমার নিজের ছেলে নয়, সতীনের ছেলে—

—আপনার সতীনের ছেলে? তা'হলে মেসোমশাই কি দু'টো বিয়ে করেছিলেন?

মাসিমা বললে—হ্যাঁ বাবা, সে অনেক কথা। এবার যখন আসবে তখন সব শুনো। ভাগ্য আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। এখনও যে বেঁচে আছি, এই জগনাথদেবের অনেক করুণা?

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—আমার বড় ছেলের নাম হলো প্রশান্ত, আর ছোট ছেলের নাম হলো জয়ন্ত।

আর তারপর দেয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে তাকিয়ে বললে—উনি হচ্ছেন এদের বাবা। ও রকম মানুষ আমি দেখি নি, একবারে যাকে বলে দেবতা। একেবারে দেবতুল্য মানুষ ছিলেন তিনি—

আমি বড় ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বাবার নাম কী?

প্রশান্ত বললে - শ্রীগোলোক চন্দ্র মজুমদার—

আমি স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম ছবিটার দিকে। সেই গোলোকদা। আমার গোড়া থেকে তখন সমস্ত কথাগুলো মনে পড়তে লাগল। তা'হলে এই মাসিমাই কি শ্যামবাজারের নন্দকিশোর দত্তের স্ত্রী।

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেলাম মাসিমার কথায়। মাসিমা বললে—গিয়ে চিঠি দিও বাবা।

জিজ্ঞেস করলাম—কী নামে চিঠি লিখবো।

মাসিমা বললে—আমার নামেই চিঠি লিখবে।

আমি পকেট থেকে নোট-বই আর কলম বার করলাম।

মাসিমা বললে—লিখো রেণু মজুমদার, মাসিমার হোটেল, স্বর্গদ্বার, পুরী।

মনে আছে, রিকশায় চড়ে যখন স্টেশনের দিকে যাচ্ছি, তখন কোনও দিকে আমার দৃষ্টি নেই। শুধু ভাবছি এ কি করে হয়? রেণু দত্ত যদি রেণু মজুমদার হয়ে থাকে, তা'হলে এমন আন্তরিক হয়ে তা হতে হয়? গোলোক মজুমদার তা'হলে কি যাদু জানতো? কে জানে?

স্বামী-স্ত্রী সংবাদ/২

আমার এক বন্ধু খুব জ্যোতিষচর্চা করতো। সে মানুষ পেলেই তার জন্ম-সাল-তারিখ জোগাড় করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুরু করে দিতো। সব ভবিষ্যদ্বাণীই যে তার মিলতো, তা নয়। কিছু মিলতো, আবার কিছু বা মিলতোও না। কিন্তু তাতে তার জ্যোতিষ-চর্চার কোনও ক্ষতি হয় নি।

একদিন সে শেষে আমাকেই ধরলে। আমার জন্ম-সাল-তারিখ-তিথি শুনেই সে কাগজপেন্সিল নিয়ে কী সব অঙ্ক কষতে বসলো। জটিল-দুর্বোধ্য সেসব অঙ্কের হিসেব। প্রায় একঘণ্টা সময় লাগলো সেই জটিল-কুটিল অঙ্কের যোগফল বার করতে।

তারপর বললে—তোমার বিপরীত রাজযোগ আছে হে—

বিপরীত রাজযোগের মানে যে-কী, তা আমি জানি না। মানে জানতে চাইতে যে-সব ব্যাখ্যা দিলে, তা আরো দুর্বোধ্য! পাঠ্য বই-এর চেয়ে যদি মানে বই বেশী কঠিন হয়, তা'হলে যে-অবস্থা হয়, তার ব্যাখ্যা শুনে আমার অবস্থাও তাই হলো।

বললাম—আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না, তুমি একটু খুলে বলো—

বন্ধুবর বললে—দেখো, আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে—খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল করলে এঁড়ে গরু কিনে। আসলে তোমার ভাগ্যও তাই। তুমি বেশ চাকরি-বাকরি করছিলে, সে চাকরিতে প্রভিডেণ্ড-ফাণ্ড ছিল, পেনশন ছিল, উপরন্তু উইডো-পেনশনের পাকা ব্যবস্থাও ছিল। তারপর সারা জীবন বিনা পয়সার ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাশে সারা ইণ্ডিয়া ঘুরে বেড়াতে পারতে! তা না করে তুমি গোঁয়ার গোবিন্দের মত দুম্ করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সাহিত্য করতে বসলে। এতে লাভ কী হলো? সাহিত্য করে কী এমন তোমার চতুর্বর্গ ফল হলো শুনি? এই ছোটলোকদের দলে তুমি কেন নাম লেখাতে গেলে?

আমি রেগে বললাম—তা বলে তুমি আমাকে ছোটলোক বলবে?

বন্ধু বললে—হ্যাঁ, বলবোই তো। প্রতি বছরে একই লেখক পূজো সংখ্যায় চার পাঁচটা করে উপন্যাস লিখবে। এটা কি ভদ্দরলোকের কাজ, না এগুলো সত্যিকারের উপন্যাস? এ গুলোর একটাও কি কালের ধোপে টিঁকবে। বেশ্যারা টাকার জন্য যা করে, তোমরাও তো তাই-ই করো। তারা তবু একদিকে ভালো যে, তারা নিজেদের বাজারের মেয়েমানুষ বলে স্বীকার করে, আর তোমরা করো বেশ্যাবৃত্তি, অথচ বলে বেড়াও তোমরা সাহিত্যিক। তোমরা যা করছো, এর নাম কি সাহিত্য। তুমি কি মনে

করো, আমাদের দেশে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একজনও খাঁটি সাহিত্যিক জন্মাবে ?

হচ্ছিল জ্যোতিষ নিয়ে কথা, হঠাৎ উঠে পড়লো সাহিত্যের প্রসঙ্গ। আত্মনিন্দে আর কতক্ষণ সহ্য করা যায় ! আমি উঠে পড়লাম।

বন্ধু বললে—তুমি রাগ করো আর যাই-ই করো ভাই, তুমি আধুনিক সাহিত্যিক বলে নিজেকে জাহির করো, তাই কথাটা তো তোমার গায়ে লাগবেই। কিন্তু আমরা ভাই পাঠক, তোমাদের যেমন যা-ইচ্ছে লেখবার স্বাধীনতা আছে, আমাদের তেমনি যা-ইচ্ছে বলবার অধিকারও আছে। আমরা কেন তোমাদের ছেড়ে কথা বলবো ?

আমি আর কোনও কথা না বলে বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে আসছিলাম। কিন্তু আমার বন্ধু আমার সঙ্গ ছাড়লে না। সে-ও আমার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এলো।

বললে—অনেক কড়া কড়া কথা বললাম রাগ করো না। তোমার কুষ্ঠিতে 'বিপরীত-রাজযোগ' আছে বলেই বললাম। এ যোগ শুধু তোমারই যে আছে তাই-ই না। এ আমি অন্য লেখকদের কুষ্ঠিতেও দেখেছি। আজ গত পঁচিশ-তিরিশ বছরে যত লেখক জন্মেছে, সকলেরই এই এক দশা। পাঁচ-দশ বছর কিম্বা পনেরো-কুড়ি বছর তোমাদের পরমায়ু। তোমরা মরে যাবার আগে দেখে যাবে, যে তোমাদের নাম লোকে ভুলে গেছে। তোমাদের বই আর কেউ কেনে না, কোনও পাবলিশার্স আর তোমাদের বই ছাপতে চাইবে না। কোন সম্পাদকও আর তোমাদের দরজায় এখনকার মতো ধর্ণা দেবে না। তখন আবার যেসব নতুন আধুনিক লেখক জন্মাবে, তাদের কাছে গিয়ে তারা তখন ধর্ণা দেবে। তখন তোমরা হয়ে যাবে প্রবীণ সাহিত্যিক, আর তারা তখন হবে আধুনিক। এটাই আধুনিক সাহিত্যিকদের বিধিলিপি।

বন্ধুর কথায় আমি তখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। বললাম—থামো থামো, ওসব কথা তোমার মুখ থেকে আমি শুনতে রাজী নই—

বন্ধু বললে—আরে, তোমার কুষ্ঠি দেখেই আমি এসব বলছি। তোমার কুষ্ঠিতে যে বিপরীত রাজযোগ আছে। নইলে কি আর এত কথা বলতাম ? আর তাছাড়া এ তো আমার নিজের কথা নয় রবীন্দ্রনাথ বলে আমাদের দেশে একজন কবি ছিলেন, তাঁর নাম শুনেছো ? তিনি কি বলেছিলেন জানো ?

বললাম—কী বলেছিলেন ?

বন্ধু বললে—শোন, তোমাকে সাবধান করে দেবার জন্যেই বলছি। কথাটা মনে রাখলে তোমারই ভালো। সেই রবীন্দ্রনাথ ভদ্রলোকের বয়েস যখন পঁয়ষট্টি, তখন নতুন এক দল আধুনিক কবি গজিয়ে উঠলো। তারা নতুন কবিতা লিখতে শিখেই নিজেদের একটা দল তৈরী করলে। সঙ্গে সঙ্গে

তাদের একটা মাসিক পত্রিকাও বার করলে। সেই মাসিক পত্রিকায় তারা লিখতে লাগলো, যে তারাই হলো সব আধুনিক কবি আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন প্রবীণ কবি। মানে পুরোনো, অর্থাৎ সেকেলে। তার মানে তিনি বাতিল হয়ে গেছেন। তা সেই শুনে রবীন্দ্রনাথ কী বলেছিলেন জানো। বলেছিলেন—'ভরসার কথা এই যে, আধুনিক থাকবে, এত পরমায়ু তার নেই···'। কথাটার মানে বুঝতে পারলে। প্রত্যেক বছরে যে পাঁজি ছাপা হয়ে বেরোয়, তার মাথায় লেখা থাকে 'নতুন পঞ্জিকা', কিন্তু দেখবে পরের বছরেই সে পাঁজি পুরোনো পঞ্জিকা হয়ে যায়। তখন নতুন করে আবার 'নতুন পঞ্জিকা' ছাপা হয়ে বাজারে বেরোয়। কিন্তু আজ কোথায় গেলো সেই আধুনিক কবিরা? তাদের আর নাম শুনতে পাও? অথচ রবীন্দ্রনাথ সেই রবীন্দ্রনাথ হয়েই এখনও বেঁচে পাঠকদের মাঝে আছেন—

* * *

তা চুলোয় যাক সাহিত্য। আসল বস্তু হলো বিপরীত রাজযোগ। এ-সব অনেক দিন আগেকার কথা। আমার জ্যোতিষীবন্ধু ছিল পাগল-ছাগল মানুষ। নিজের জীবনে তার কিছুই হয় নি। পরের ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে-ভাবতে রাস্তায় চলতে গিয়ে গাড়ি-চাপা পড়ে নিজেই একদিন বেঘোরে প্রাণ দিয়েছিল। জীবনে এ রকম কত বিচিত্র লোকের সঙ্গে আমার নানাভাবে পরিচয় হয়েছে, আবার একদিন তারা হারিয়েও গেছে কোথায় কোন ভবিষ্যতের গর্ভে, কে তার হিসেব রেখেছে।

কিন্তু ওই বিপরীত রাজযোগ, ওই কথাটা ভুলতে পারি নি।

সেবার বিহারের একটা শহরের এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে এই বিপরীত রাজযোগের একটা জ্বলন্ত উদাহরণ দেখতে পেলাম। সেই কাহিনীটাই আজ আপনাদের বলছি।

আমার এক বন্ধু ডাক্তার। ডাক্তার অবনী সরকার। কলকাতার কলেজেই সে ডাক্তারী পড়েছিল। ডাক্তারী পাশ করবার পর চাকরীর জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছুই হয়নি। তখনকার দিনে ডাক্তারী পাশ করে একটা ডাক্তারখানা খুলতে অন্তত হাজার চারেক টাকা লাগতো। সে টাকা তার ছিল না।

তারপর প্র্যাকটিশ জমতে জমতে যদি এক বছর কেটে যায়, তখন সেই সময়টায় সে খাবে কী? অনেকে ডাক্তারী পাশ করে তখনকার দিনে বিয়ে করে শ্বশুরের পয়সায় ডাক্তারখানা খুলে বসতো। কিন্তু তেমন শাঁসালো শ্বশুরই বা কজনের কপালে জুটবে? যাদের কপাল ভালো ছিল, তারা বিয়ের সময় যৌতুক হিসেবে চার-পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে সুযোগ-সুবিধে মত একটা

পাড়ায় ডাক্তারখানা খুলে বসতো। আর যারা তা পেতো না, তারা হন্তু হয়ে চাকরি খুঁজে বেড়াত !

তা তখনকার দিনে চাকরির বাজার এখনকার দিনের মতই ছিল মন্দা। অনেকের ধারণা এখনকার দিনকালই সব চেয়ে মন্দা। কিন্তু আমি দেখেছি বাজার চিরকালই মন্দা। আমার ঠাকুরদাকে বলতে শুনেছি—এখন দিনকাল মন্দা, খুব সাবধান। তারপর আমার বাবাও বলেছে—দিনকাল মন্দা পড়েছে, খুব সাবধান। আমি আবার এখন বাবা হয়েছি। এখন আমিও আমার ছেলেকে বলি—এখন দিনকাল বড় মন্দা, খুব সাবধান—

আসলে আবহমানকাল ধরে এমনিই চলে আসছে।

অবনী সরকার প্রথমে কলকাতাতেই চাকরির চেষ্টা করলে। ঘরকুনো বাঙালী, ঘরে থাকতে পেলে কে আর বাইরে যেতে চায় ?

কিন্তু যখন কোথাও চেষ্টা করে কিছু পেলে না, তখন বাইরে চেষ্টা করতে লাগলো।

অনেক মানুষ সাধ করে ঘর ছাড়ে, আবার অনেকে অনেক জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে ঘর ছাড়ে। তবে সাধ করে ঘর ছাড়ুক, আর জ্বালায় ঘর ছাড়ুক, যার ভালো হবার কথা তার ঘরে থেকেও ভালো হয়, আবার কারো-কারো ঘর ছেড়েই ভালো হয়।

অবনীরও তাই হয়েছিল। অবনীর ঘর ছাড়বার পর তার দুর্ভাগ্যও তাকে ছাড়লো। অবনীব কে এক দর সম্পর্কের আত্মীয় বুঝি ছিল বিহারের মধুবাণীতে। চাকরির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে অবনী সেখানে গিয়ে হাজির হলো, আর সেখানে গিয়ে রাজা হয়ে বসলো।

একেবারে রাজা তো রাজাই। দু'এক বছরের মধ্যেই সে একেবারে মধুবাণীর মহারাজা হয়ে উঠলো। অর্থাৎ তার গাড়ি হলো, বাড়ি হলো, বিয়ে হলো, ছেলে হলো। রাতারাতি ফুলে-ফেঁপে একেবারে যাকে বলে ঢোল হওয়া, সে তাই-ই হলো। এবং ঢোলের মতই সেই ছিপছিপে অবনী একেবারে সুগোল হয়ে উঠলো। যখন আমার সঙ্গে মধুবাণীতে তার দেখা তখন আর আমি তাকে চিনতেই পারি না দেখি তার ডিস্‌পেন্সারিতে একেবারে রোগীর কুম্ভমেলা বসে গেছে।

বিহারে তখন এমনিতেই ডাক্তারের অভাব। যত হাতুড়ে কবিরাজ হোমিওপ্যাথি আর হেমিকের দাপট। আর যত না রোগীকে দেখে তার চেয়ে রোগীর থেকে বেশি পয়সা শুষে নেয়। সেই সময় একে খাস কলকাতা থেকে খাঁটি এম-বি পাশ করা ডাক্তার গিয়ে পৌছতেই লোকে তাকে রসগোল্লার মতন লুফে নিলে।

আমাকে সেই মধুবাণীতে দেখে অবনী অবাক। বললে—তুই ?

বললাম—স্টেশনে নেমে শহর দেখতে বেরিয়েছিলুম, হঠাৎ তোর ডাক্তারখানার সাইনবোর্ডে তোর নামটা দেখে ঢুকলাম। তোর নামটা সাইনবোর্ডে না দেখতে পেলে কিন্তু তোকে চিনতে পারতুম না। এ-কি চেহারা হয়েছে তোর?

অবনী হাসতে লাগলো। বললে—মধুবাণীর জল-হাওয়া, আর সিলভার-টনিক খেয়ে এই হয়েছে—

বললাম—কিন্তু এই কুম্ভমেলা কি এখানে রোজই বসে?

অবনী সগর্বে বললে—হ্যাঁ, হরিদ্বারের কুম্ভমেলা একদিন শেষ হয়ে যায়, কিন্তু আমার ডাক্তারখানায় কুম্ভমেলার আর শেষ নেই, অশেষ।

—কিন্তু ময়লা জামা-কাপড় পরা লোক, এরা টাকা দেয়?

অবনী বললে—এদের চেহারা এই রকম দেখতে বটে, কিন্তু এক-একজন লাখপতিয়া—

—কী-রকম?

—আরে এরা যে চাষী, এদের তো ইনকাম-ট্যাক্স দিতে হয় না, আর বাঙালীদের মত ফোতো-কাপ্তেনও নয় এরা! তাই এদের টাকা কেবল আমদানীই হয়, রপ্তানী হতে জানে না। তাই এদের আয়টার সবটাই আয়। তার মধ্যে আর ব্যয় বলে কোনও বস্তু নেই। ব্যয় যা-কিছু হয়, শুধু ঔষধে আর ডাক্তারে—

অবনীর কথায় তার বাড়িতেই ছু-'চার দিন রয়ে গেলুম। তার বিশেষ অনুরোধ। আর আমারও একটা নতুন জায়গা, নতুন সমাজ দেখবার লোভ।

তা অবনীর বাড়ীতে থাকবার, খাবার ও শোবার ব্যবস্থা ভালো। বিশেষ-বিশেষ রোগীদের ভালো করে চিকিৎসা করবার জন্যে ইনডোরে থাকবার বন্দোবস্ত তার ছিল। সার-সার সব ঘর করে দেওয়া রয়েছে, সেখানে রোগীদের নিয়ে রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা কেউ-কেউ থাকে আর পাশের উঠোনে রান্না করে খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়। তাতে চিকিৎসাও ভালোভাবে হয়, আবার রোগীদের খরচাটাও পড়ে কম।

আমি অবনীর বাড়িতে ক'দিন বাস করে ব্যাপার-স্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেলুম। ভাবলাম, কলকাতার ডাক্তাররা কলকাতায় বসে কেন গুঁতোগুঁতি করে মরে। অবনীর মত বাইরে এলেই পারে।

সন্ধ্যাবেলা অবনী যখন রোগী দেখতো, আমি তার পাশে বসে-বসে সব লক্ষ্য করতুম। কারোর পেটের ব্যায়াম, কারোর কাশি, কারোর ছেলের বোখার, কারোর বউয়ের ছেলে হবে। অবনী সরকার একাধারে চোখের ডাক্তার, দাঁতের ডাক্তার, আবার সঙ্গে-সঙ্গে সার্জেনও বটে। কখনও ছুরি দিয়ে রোগীর পেটও কাটতে হয়। অবনীর মধ্যে যে এত গুণ ছিল, তা আমি

জানতাম না। ছেলেবয়সে স্কুল-কলেজে অতি সাধারণ ছাত্র ছিল অবনী মাঝে-মাঝে পরীক্ষায় ফেলও করতো সে।

কিন্তু কোথা দিয়ে কেমন করে কখন কার ভাগ্য খুলে যায় কে বলতে পারে? এই অবনী, এ কি কখনও ভাবতে পেরেছিল যে, একদিন ডাক্তারি শিখে সে এত টাকা রোজগার করবে?

অবনীর স্ত্রীও দেখতুম খুব ব্যস্ত। সংসার ছোট হলে কী হবে। অবনীর স্ত্রীরও সংসারের কাজ নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না।

একদিন খেতে বসে অবনীর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম—আপনার সময় কী করে কাটে মিসেস সরকার? অবনী তো সারা দিন-রাতই রোগী নিয়ে ব্যস্ত। আর তাছাড়া চাকর-ঝিও তো অসংখ্য, আপনি সারাদিন কী করেন?

অবনীর স্ত্রী বললে—সে কী বলছেন, আমার কী কম কাজ? এই যে আপনি এসেছেন, আপনি কি খাবেন না খাবেন, তা আমাকে দেখতে হবে না? ঠাকুর-চাকর-ঝি সব কিছু থাকলেও, তাদের ওপর তদারকি তো সেই এব আমাকেই করতে হবে। আর যেদিকে দেখবো না সেইদিকেই তো চিত্তির—

অবনীও বলতো—দ্যাখ্, ছোটবেলা থেকে ভয়ানক অর্থকষ্টে ভুগেছি আমার বাবা ছিলেন সৎ লোক, একটা পয়সা ঘুঁষ নিতেন না। চাকরিতে যখন সবাই ঘুঁষ নিতো, বাবা তখন সেকালের আদর্শ মেনে চলতে গিয়ে আমাদের একেবারে পথে বসিয়ে গেছেন। অথচ আমার বাবার যে চাকরি ছিল, তাতে ঘুষ নেওয়ার সুযোগ ছিল প্রচুর। যদি ঘুঁষ নিতেন তা'হলে তখন—কলকাতায় আমাদের দু'খানা পাকা বাড়ী হতে পারতো—

তারপর একটু থেমে আবার বলতো—আর আমার স্ত্রী, সেও খুব গরীবের মেয়ে, এত টাকা সে জীবনে দেখেনি। এখন দেখছে আমার হাতে এত টাকা আসছে, সে-ই বা আপত্তি করবে কেন? আর তাছাড়া, এইটেই তো টাকা উপায় করবার বয়েস। এই বয়সেই যদি টাকা উপায় না করি তো কবে করবো? এরপর তো বয়েস বাড়বার সঙ্গেই ব্লাড প্রেসার হবে, ডায়াবেটিস আসবে, পেটের গোলমাল হবে, তখন তো আর এতো খাটতে পারবো না—

কিন্তু এ-সব কথা বেশি বলবার সময়ই পেতো না অবনী।

খেতে বসবার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার হয়ত নীচের ডিসপেন্সারী থেকে ডাক আসতো। একজন মরো-মরো রোগী এসেছে, এখুনি তাকে দেখতে যাবার জন্যে নীচে নামতে হবে। আমি মিসেস সরকারকে বলতাম—আপনি একটু বারণ করেন না কেন অবনীকে? আগে শরীর না আগে টাকা?

মিসেস সরকার বলতেন—কিন্তু টাকা উপায় না করলে আমাদের চলবে বা কী করে বলুন? বাড়ীতে এতগুলো মানুষ খেতে তার ওপর দু'জন কম্পাউণ্ডার, তাছাড়া আমার দু'টো মেয়ে। তাদের বিয়ের জন্যে এখ

থেকেই টাকা জমাতে হবে। তারপর আছে ছেলের ভবিষ্যত। ছেলে নাবালক। তাকে তো যেমন-তেমন করে মানুষ করলে চলবে না। আর ক'বছর পরেই তো তাকে আমেরিকা কিম্বা জার্মানী কোথাও না কোথাও পাঠাতে হবে। এ-দেশে লেখাপড়ার হাল তো দেখছেন। ইণ্ডিয়াতে কি আর কোনও ছেলে মানুষ হবে মনে করেন ?

তা-সত্যি। অবনীর দুই মেয়ে, এক ছেলে। মধুবাণীতে ভাল স্কুল-কলেজ কিছুই নেই। তাদের তিনজনকে দার্জিলিং-এ রেখে পড়াতে হচ্ছে। তাদের প্রত্যেকের পেছনে মাসে পাঁচশো টাকা করে পাঠাতে হয়। অর্থাৎ মাসে তিন-পাঁচশো পনেরো শো। এ টাকা কোত্থেকে আসে ? অবনীর তো পৈত্রিক টাকা কিছু নেই, পৈত্রিক জমিদারীও নেই যে, সে অসুখে পড়লে সেই টাকা ভাঙাবে আর খরচ করবে।

ক'দিন অবনীর বাড়ীতে থেকে আর তার প্র্যাকটিসের বহর দেখে মনে হলো, অন্ততঃ মাসে তার দশ হাজার টাকা উপায় হয়। কিন্তু খরচ তো তার বদলে বলতে গেলে কিছুই নেই। খরচের মধ্যে যা-কিছু ওই ছেলে-মেয়ের পড়ানো। আর ড্রাইভার, কম্পাউণ্ডার, চাকর-ঠাকুর-ঝি'র মাইনে আর তাদের খাওয়া। মধুবাণীর মতন জায়গায় জিনিসপত্রের দামও সস্তা। সস্তা-গণ্ডার দেশ। আশে-পাশে দশ মাইলের চৌহদ্দীর মধ্যে আর একটা দ্বিতীয় ডাক্তার বলতে কোনও বস্তু নেই। মাছ-মাংস-তরকারি সমস্তই তো বলতে গেলে অবনী বিনা পয়সায় পায়। মাছ-মাংস-তরি-তরকারিওয়ালাও তো অবনীর রোগী।

আর দুধ ? বাড়ীতে দু'টো মোষ। দু'টো মোষ মিলে রোজ দশ সের দুধ দেয়। সে একেবারে বটের আটার মত খাঁটি দুধ। অত দুধ খাবে কে ? স্বামী-স্ত্রী দু'জনে সে দুধ দিনে-রাতে দশবার খেয়েও কুলিয়ে উঠতে পারে না। মিসেস সরকার সে দুধ বিক্রী করে। সেই দুধ থেকে ক্ষীরের খোয়া তৈরী হয়। তাতে অবনীর দু'পয়সা পকেটে আসে! আমি এইসব দেখতুম আর আমার মনে পড়ে যেতো কলকাতার ডাক্তার জে-এন-দাসের কথা।

* * *

ডাঃ জে-এন-দাস! জোড়াসাঁকের অত বড় ডাক্তার তখন কলকাতায় ছিল না। সে তখন তাঁর কী পশার! আমাদের বাড়ীর পাশেই থাকতেন ডাক্তার দাস। এখনও আছেন। এখন আর তাঁর ততো পশার নেই। পশার নেই, তার কারণ তিনি রোগী এলে দেখেন না।

বলে দেন—না, আমার সময় নেই—

অথচ ডাক্তার দাস এককালে নাইবার-খাবার সময় পেতেন না। আমাদের পাড়ার লোক, আমার দাদার বন্ধু। ডাক্তার দাসের বাবাও ছিলেন পাড়ার বিখ্যাত ডাক্তার। তিনি ছিলেন আমার বাবার বয়েসী। বড়লোক বলে

ডাক্তার দাসের বাবার বেশ সুনাম ছিল পাড়ায়। মনে আছে তিনি মার যাবার পর খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ হয়েছিল। পাড়ায় এমন কোন লোক ছিল না, যার নেমন্তন্ন হয়নি, সে শ্রাদ্ধে। তাতে এমন খাওয়া খাইয়েছিলেন সকলকে, যে বহুদিন পরে সে-খাওয়া গল্পকথা হয়ে উঠেছিল।

লোকে বলতো—হ্যাঁ, খেয়েছিলাম বটে ডাক্তার দাসের শ্রাদ্ধে—

অসময়ের ফুলকপি, অসময়ের বাঁধাকপি থেকে অসময়ে এঁচোড়ের ডালনা পর্যন্ত সব ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর ছেলে ডাক্তার জে-এন-দাস! ডাক্তার জে-এন-দাস মানে যতীন্দ্রনাথ দাস। কিন্তু নামটা কেউ উচ্চারণ করতো না কারণ ও-নামটা বলতে গেলে কেউ জানতোও না। আমাদের পাশাপাশি বাড়ি, সুতরাং ছোটবেলা থেকেই আমরা ডাক্তার জে-এন-দাসের বাড়ীর ভেতরে যেতাম। তাঁর বাড়ীতে আমাদের অবাধ যাতায়াত ছিলো।

আমরা ডাক্তার দাসের বাড়ীর ভেতরের ঐশ্বর্য্য দেখে অবাক হয়ে যেতাম দশটা চাকর, বারোটা ঝি, তিনটে ড্রাইভার আর অসংখ্য আত্মীয়-অনাত্মীয়তে ঘর ভর্তি থাকতো সব সময়ে। দেশ থেকে কেউ দু' দিনের জন্য এলে দু মাস থেকে যেতো সে বাড়ীতে। কেউ কলকাতায় অসুখে চিকিৎসা করতে এসেছে। উঠবো কোথায়? না চলো যতীনের বাড়ীতে। যতীনের বাড়ীতে গিয়ে উঠলে থাকা-খাওয়ার সমস্যা নেই, চিকিৎসার খরচ নেই। এমনকি ওষুধের খরচ, যা সমস্যা, সে সবও কিছু নেই।

যেন ধর্মশালা। ধর্মশালার মতই খোপ-খোপ ঘর। খোপে-খোপে মানুষ। তাদের খাওয়া-পরা-থাকা সমস্ত কিছুর ভার ডাক্তার দাসের ওপর তিনি উদয়াস্ত খাটতেন। যারা বাড়ীর অতিথি, তারা অনেক সময় তাঁকে চোখেও দেখতে পেত না। রাত্রে ঘুমিয়েও শান্তি ছিল না ডাক্তার দাসের।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রথমে কিছু রোগী পেয়েছিলেন ডাক্তার দাস।

সে প্রথম জীবনের কথা। তাঁর বাবার কম রোগী ছিল না। তখন ছিল একজন কম্পাউণ্ডার। আরও একজন কম্পাউণ্ডার ছিল, সে কেবল রোগীদের বাড়ী-বাড়ী ইঞ্জেকশন দিয়ে বেড়াত। সেই সিনিয়ার ডাক্তার দাসের যখন ছেলে হলো, তখনও পাড়াশুদ্ধ লোককে তিনি তাঁর ছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিলেন।

তারপর সেই ছেলে বড় হয়ে ডাক্তারী পড়তে লাগলো। ডাক্তারী পড়া তখনকার দিনে ছিল খাটুনির ব্যাপার। এখানকার মত টুকে পাশ করা ডাক্তার নয়। ডাক্তার যতীন দাস মেডিসিনেও ফার্স্ট হলেন, সার্জারীতে ফাস্ট হলেন। দু'টোতেই সোনার মেডেল পেলেন।

আমরা ডাক্তার জে-এন-দাসকে দেখতাম বটে; কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা বলবার সময় থাকতো না তার। সব সময়ে রোগীরা তাঁকে ঘি

থাকতো। আর যত দিন যেতে লাগলো, ততোই রোগীর ভীড় বাড়তে লাগলো। তখন আর ডাক্তার দাসের সাক্ষাৎ পাওয়াই ভার হলো রোগীদের পক্ষে। রোগীরা ভোরবেলা এসে শুনতো, ডাক্তারবাবু রাত তিনটের সময় কোথায় কোন জরুরী কল-এ বেরিয়ে গেছেন। তারা কম্পাউণ্ডারবাবুকে জিজ্ঞেস করতো—ডাক্তারবাবু কখন ফিরবেন ?

কম্পাউণ্ডারবাবু বলতেন—তার কোনও ঠিক নেই।

সত্যিই কখন যে ডাক্তার দাস বাড়ী ফিরবেন, তার কোনও ঠিক ছিল না। হয়তো ফিরে এসেই আবার তখুনি ব্রেকফাস্ট খেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে কোথায় বেরিয়ে যেতেন। রোগীরা তাঁর চেম্বারে হাঁ করে অপেক্ষায় বসে থাকতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই রোগীরা রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করতো, কিন্তু তবুও ডাক্তার দাসের আর মুহূর্তের জন্য বাড়ি ফেরার সময় হতো না।

আমরা ডাক্তার দাসের বাড়িতে গিয়ে সে-দৃশ্য দেখেছি। একতলার একটা পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। দোতলায় উঠে বাঁদিকে রোগীদের বসবার ঘরখানা সব সময়ে ভর্তি থাকতো। কিন্তু যাঁর জন্যে তারা বসে থাকতো, তাঁর আর দেখা পাওয়া যেত না।

আর যখন হঠাৎ আচমকা আসবেন, তখন সোজা ভেতরের একটা ছোট ঘরে ঢুকে যাবেন গট্-গট্ করে। কোনও দিকে চেয়ে থাকবার ফুরসৎ হবে না তাঁর। সেখানে গিয়ে তিনি রোগীদের নামের তালিকাটা পড়বেন। এক-দুই-তিন করে নম্বর দেওয়া আছে প্রত্যেক রোগীদের নামের আগে। তাঁর এ্যাসিস্‌টেন্ট প্রথম রোগীর নাম ধরে ডাকবেন—বিমলাকান্ত হালদার, বরানগর—

অমনি বিমলাকান্ত হালদার ভদ্রলোক তাঁর ছেলেকে নিয়ে ভেতরে ঢুকবেন। অন্য রোগীরা তখন হাঁ করে বাইরের ঘরে তীর্থের কাকের মত বসে থাকবে, তাদের নাম ডাকার অপেক্ষায়। মিনিট পনেরো-কুড়ি পরে আবার তাঁর এ্যাসিস্‌টেন্ট চীৎকার করে ডাকবেন—দেবকুমার সাঁতরা, উলুবেড়িয়া—

এই রকম এক-একজনের পর নাম ডাকা চলবে কতক্ষণ তার ঠিক নেই। কখনও ডাকবেন—শশীভূষণ সরকার, রাঁচী।

আবার কখনও ডাকবেন—ভক্তিভূষণ মুখার্জি, বেলঘরিয়া—

নামের যেন নামাবলী। আর এত দূর-দূর থেকে যে রোগীরা আসে, তারও এক বিচিত্র ভূগোল-পরিচিতি উল্লেখ করার মত। কেউ এসেছে গৌহাটি থেকে ট্রেনে চেপে, কেউ শিলং থেকে প্লেনে। আবার ভূটানের রাণীমাও কখনও আসেন সপরিবারে। সকলেরই রোগ সারাতে গেলে ডাক্তার দাসকে দেখালেই নিশ্চিন্তি। বলতে গেলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার একমাত্র ধন্বন্তরি ডাক্তার জে-এন-দাস। তারপর রোগী দেখা শেষ হতে না হতে

ঘড়িতে দুপুর বারোটা বাজার নির্দেশ শোনা যাবে। তখন হস্‌পিট্যাল। হস্‌পিট্যাল ডিউটিও দিতে হয় তাঁকে।

এটা নিয়ম। নিয়ম রক্ষে। সধবা স্ত্রীলোকের যেমন সিঁথির সিঁদুর, ডাক্তার দাসের তেমনি হসপিট্যাল। হসপিট্যালে দূর-দূর থেকে রোগীরা এসে টিকিট করে বসে থাকে। তারা জানে ডাক্তার দাসের সময়ের খুব দাম আছে। বাঁধা সময়ের মধ্যে ডাক্তারের দর্শন তাদের ভাগ্যে নাও মিলতে পারে। তাই গ্রামের রোগীরা চাল-চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে এসে বসে থাকে। আর একটা টিকিট করে নেয়। যে যত আগে আসবে, তার ততো প্রথম দিকের নম্বরের টিকিট মিলবে।

কিন্তু টিকিট মিললেই যে ডাক্তার দাসের দর্শন পাওয়া যাবে, এমন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। কারণ ডাক্তার জে-এন-দাস ভগবানের মত। তিনি আছেন আবার নেইও। ভগবান যেমন আছেন কি নেই, তা নিয়ে যুগ-যুগ ধরে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। ডাক্তার জে-এন-দাসও তেমনি কোথায় আছেন, কখন আছেন কিম্বা একেবারে আছেন কিনা, তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের লেশ নেই।

এই অবস্থা শুধু যে হসপিট্যালে কিম্বা তাঁর চেম্বারে তাই-ই নয়, সর্বত্র। কিন্তু সবচেয়ে নিয়ম করে যেখানে ডাক্তার জে-এন-দাস যান, সেটা হলো তাঁর নিজের নার্সিংহোম।

আসলে হাসপাতালটি হলো চাকরি, সেখানে কোনও রকমে একবার হাজিরা দিলেই হয়ে যায়। সেখানকার রোগীরা গরীব, তাদের টাকা-পয়সা দেবার তেমন ক্ষমতা নেই। তাঁরা বেঁচে থাকলেও যা, মরে গেলেও তাই। তাদের বাঁচা-মরা নিয়ে ডাক্তার জে-এন-দাসের কোনও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা নেই। সেখানে রোগীদের দেখবার জন্যে জুনিয়ার ডাক্তাররা আছে, তারাই সব কাজ করে দেয়। তিনি শুধু হাজির থাকেন, আর সিগারেট খান।

হাসপাতালের সব রোগীরাই চায় ডাক্তার দাসকেই তাদের রোগ দেখাবে। চায় যে, ডাক্তার দাসই তাদের চিকিৎসা করুন।

কিন্তু ডাক্তার দাসের অত সময় কোথায়?

তাছাড়া গভর্ণমেন্ট ডাক্তার দাসকে যে মাইনে দেয়, তাতে ডাক্তার দাসের কিচ্ছুই হয় না। তাঁর গাড়ীর একদিনের পেট্রল খরচও তাতে উঠে না। তিনি যে হাসপাতালে দয়া করে হাজির থাকেন, এইটেই রোগীদের চোদ্দ-পুরুষের ভাগ্যি!

প্রশ্ন উঠতে পারে, তা'হলে ডাক্তার দাস হাসপাতালের চাকরি করেন কেন? সে চাকরি তো তিনি ছেড়ে দিলেই পারেন?

কিন্তু না, হাসপাতালের চাকরিটা তাঁর রাখা দরকার। হাসপাতাল

থেকেই তাঁর নাম ছড়ায়। আর হাসপাতালে যে-সব বড়লোক রোগী আসে, তাঁদের তিনি বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষ চিকিৎসা করবাব, কিম্বা তাদের তিনি তাঁর চেম্বারে যেতে বলেন।

চেম্বারে এলে তাঁর নগদ পাওনা পঞ্চাশ টাকা। আর নার্সিং-হোমে একবার যদি তেমন কোনও শাঁসালো রোগীকে পাঠাতে পারেন, তো হাজার-হাজার টাকা তাঁর মুঠোর মধ্যে এসে যায়।

হাসপাতালটা হলো দাতব্য ব্যাপার। দাতব্যের ওপর আস্থা নেই ডাক্তার দাসের। আজকাল যে দাতব্য করে সে নির্বোধ। দাতব্যের টাকা কখনও সদ্ব্যয় হয় না, সৎ পাত্রের হাতেও পড়ে না। দাতব্যের ওষুধ থেকে সুরু করে দুধ পর্যন্ত সবই ভেজাল।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের সবই যখন ভেজাল, আবার যখন তার মাইনেটাও নামমাত্র, তখন কেন যে ডাক্তাররা হাসপাতালে চাকরি করে, তার রহস্য যদি কেউ আবিষ্কার করতে যায় তো তা'হলে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে।

সুতরাং ও প্রসঙ্গ থাক্। আসল প্রসঙ্গ ছিল 'বিপরীত-রাজযোগ'। বিপরীত-রাজযোগের কথা বলতে গিয়েই এই কথা এসে গেল। এসে গেল অবনী সরকারের কথা আর ডাক্তার জে-এন-দাসের কথা।

* * *

সত্যিই কী বিচিত্র সংসারের এই মানব-সমাজ, আর কী বিচিত্র এই মানুষের মন! কোথায় কলকাতার এক অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তারপরে লেখাপড়া শিখেছি জোড়াসাঁকোর কোন এক গলিতে আর কোথায় সেই মধুবাণী। জোড়াসাঁকোর সেই জে-এন-দাসকেও দেখেছিলাম, আবার মধুবাণীর সেই অবনী সরকারকেও দেখলাম। আর দেখে এসেছি এই নিজেকে।

কোথায় কোন সরকারি চাকরীতে কী বিচিত্র কাজই না করে বেড়িয়েছি। আমার চাকরীর সত্তার দৌলতে কত লোক কত খাতির করেছে, আবার কত লোক আমার কুৎসা রটনা করতেও কসুর করেনি। কত লোককে জেলে পুরেছি ঘুঁষ নেওয়া বা দেওয়ার অপরাধে, আবার কত চরম অপরাধ করে ধরা পড়েও আইনের মারপ্যাচে কত লোক ছাড়াও পেয়ে গেছে! আজ কোথায় গেল সেই তারা? আর আমিই বা কোথায় এসে পৌঁছোলাম আজ? এ সমস্তই কি বিপরীত-রাজযোগের ফল? কে জানে!

নইলে এখন লেখার নেশাতেই বা মাতাল হলাম কেন? আর কেনই বা লিখছি? কাদের জন্য লিখছি? কে বুঝবে আমার লেখা? কাকে বোঝাবো যে লিখলেই লেখক পদবাচ্য হয় না, আবার পড়লেই পাঠক-হওয়া সম্ভব নয়।

সত্যিই তো লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে যাঁরা সময় কাটাবার জন্যে বই পড়ে, তারা কি সবাই খাঁটি পাঠক ?

এই সব কথা ভাবতে-ভাবতে বহুকাল আগেকার আমার সেই জ্যোতিষী বন্ধুর কথা মনে পড়তো ! সত্যিই কি আমার এই সাহিত্যের নেশা বিপরীত-রাজযোগের ফল ?

অবনী সরকারের ডাক্তারী করার নেশা দেখতাম, আর আর টাকা উপার্জনের বহরটাও দেখতাম। আর মনে পড়তো, আমাদের সেই জোড়াসাঁকোর বাড়ির পাশের ডাক্তার জে-এন-দাসের কথা।

দু'মাস আগে থেকে নাম লিখিয়ে রাখতে হতো ডাক্তার দাসকে দিয়ে রোগী দেখাতে গেলে। ডাক্তার দাসের দু'জন লোক ছিল চেম্বারে। একজন শুধু খাতায় নাম লিখতো। আর একজনের কাজ ছিল শুধু টেলিফোন ধরা।

আর টেলিফোনের যেন আর কামাই ছিল না কখনও। বেজে চলেছে তো বেজেই চলেছে। একটা বাজা শেষ হয়, তো আবার আর একটা। ক্বচিৎ-কদাচিৎ যদি কখনও নেহাৎ জরুরী কোনও কথা বলার দরকার হয়, তখন ডাক্তার দাস নিজে টেলিফোন ধরতেন।

আর ডাক্তার দাসের স্ত্রী ?

ডাক্তার দাসের বিয়ের দিনে আমাদের নেমন্তন্ন হয়েছিল। সে-কি জাঁক-জমক। সমস্ত পাড়াটা সেদিন আলোয় আলো হয়েছিল। ডাক্তার দাসের বাবা তখন বেঁচে ছিলেন। তিন দিন ধরে কেবল ব্যাচের পর ব্যাচ খেয়েই গেছে এক নাগাড়ে। আর সে-খাওয়াও এক ঐতিহাসিক ব্যাপার।

খেতে বসে লোক বলছে—হ্যাঁ, খাওয়ার মত খাওয়া বটে—

কোথাকার কে কীসের সম্পর্ক, কার মাসতুতো ভাই-এর বোনের জামাই, কার খুড়তুতো বোনের দেওর, কেউই বাদ পড়ে নি। সম্পর্কের একটা ক্ষীণ সূত্র থাকলেই হলো, তার কাছেও নেমন্তন্ন চলে গেল।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক হয়ে গেল সবাই বউ-এর রূপ দেখে। এমন রূপও কখনও হয় নাকি কোন বউ এর ?

বড় মামা বললে—যতীনের বউকে দেখেছিস ?

মেজ মাসিমা বললে—বউ যদি করতে হয়, তো ওই রকম বউই করা উচিত। যাকে এক কথায় বলা যায় ডানা কাটা পরী—

ডানা কাটা পরী কথাটা বড় পুরোনো। বহু ব্যবহারে ও কথাটা ধার এখন কমে গেছে। এখন ও কথাটার আর কোন জৌলুস নেই। ভালো করে সাজালে ও রকম অনেক মেয়েরাই ডানা কাটা পরীতে রূপান্তরিত করা যায়। কিন্তু বিয়ের পরেও যখন যতীনদার বউকে দেখতাম, তখন যেন আর কারো চোখের পাতা পড়তে চাইতো না।

মাসীমা বলতো—বউমা, এ হলো যতীনের বন্ধুর ছোট ভাই—আমার কাবলুর বন্ধু—

রাঙা বৌদি কথাটা শুনে আমার দিকে চেয়ে দেখছিল।

কাবলুও আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। কাবলু যতীনদার ছোট ভাই। কাবলু আর আমি এক ক্লাসে পড়তাম। সেই সূত্রে তাদের বাড়ীতে ঘন-ঘন যাওয়া আসার সুযোগ ছিল আমার। সকালে-বিকেলে কাবলুর সঙ্গেই আমার সর্বক্ষণ কাটতো। কাবলুর বন্ধু বলে তাদের বাড়ির মধ্যেও ছিল আমার অবাধ গতি-বিধি। কাবলুকে যদি বাইরে না পেতাম, তো সোজা চলে যেতাম অন্দরমহলে। একেবারে রান্না-বাড়ির সামনে, যেখানে মাসিমা ঠাকুরকে রান্না বুঝিয়ে দিচ্ছেন?

ঠাকুর-চাকর-ঝি নিয়ে তখন মাসীমা একেবারে সাংসারিক কাজে ব্যতিব্যস্ত। বলতাম—মাসীমা, কাবলু কোথায় জানেন?

মাসীমা ব্যস্ততার মধ্যেই বলতো—কাবলু? বোধহয় ওপরে আছে, দেখোগে যাও—

আমি কাবলুর খোঁজে তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে যেতাম।

মাসীমাদের যৌথ-সংসার। বিরাট বাড়িও যেমন তেমনি আবার লোকও বাড়িতে অসংখ্য। ভাই-ভাগ্নে-পিসী-বোনঝি-কাকা-সম্বন্ধীতে সমস্ত বাড়ি ভরভরাট। সকাল থেকে কেবল রান্না খাওয়া, বাসন মাজা, গল্প-আড্ডাতেই সমস্ত বাড়িটার সময় কেটে যায় হু-হু করে। কে কখন যাচ্ছে, তারও যেমন সময়-অসময় নেই, তেমনি আবার কে খেলে বা কে খেলে না, তারও হিসেব রাখা কঠিন। কোনও ঘরে কেউ বসে-বসে পিড়িং-পিড়িং করে সেতার সাধনা করছে, আবার কোনও ঘরে হয়ত কোন নাতনীর প্রসব বেদনা উঠেছে, তার জন্য কেউ ছুটেছে দাই ডাকতে।

এই সমস্ত ব্যবস্থা-অব্যবস্থার মাথার ওপর ছিলেন যতীনদার বাবা। তিনিই বলতে গেলে মোটা রোজগার করতেন, আর আশে-পাশে যারা থাকতো, তারা সামান্য টুকি-টাকি কিছু করলেও তাঁর পয়সাতেই খেত।

তার ওপর ছিল ক্যারাম-বোর্ড, তাস, দাবা আর আড্ডা। এতগুলো লোকের ফাই-ফরমাস খাটতে-খাটতে ঠাকুর-চাকর ঝি'দের সারাদিন হিমসিম খেয়ে মরতে হতো। হঠাৎ রাঁধতে-রাঁধতে সরষের তেল কম পড়লে মুদিখানায় লোক ছুটতো। সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁকা-মুটের মাথায় এসে হাজির হতো সরষের মস্ত বড় একটা টিন, আর তার সঙ্গে নুন-লঙ্কা-গুড়-তেজপাতা, হলুদ। কোথা থেকে যে সে-সব আসতো, কে তার টাকা জোগাতো আর কে-ই বা ও-সব খেতো, তার হিসেবও কেউ জানতে চাইত না, কিম্বা হিসেব বোধহয় রাখতোই না। ছোটবেলা থেকে এই আবহাওয়ায় যতীনদা মানুষ হয়েছিল। যতীনদার ছোট ভাই কাবুলও ওই ভাবেই মানুষ হয়েছিল।

তা যতীনদা যেমন দাদার বন্ধু, আমার বন্ধু তেমনি কাবলু। কাবলু আর আমি এই অবস্থাতেই একসঙ্গে বড় হয়েছি। কাবলুদের বাড়ি যেমন ছিল আমাদের বাড়ি, তেমনি আমাদের বাড়িটাও ছিল কাবলুদের বাড়ি।

কাবলুকে খুঁজতে-খুঁজতে যখন দোতলায় উঠলাম, তখন কোথাও তাকে দেখতে পেলাম না। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজতে-খুঁজতে শেষকালে পেয়ে গেলাম যতীনদার ঘরে। সে ঘরে গিয়ে দেখি কাবলু এক মনে রাঙা বৌদির সঙ্গে লুডো খেলছে। দেখি সেই রাঙা বৌদির কপালে সিঁদুরের টিপ। রাঙা বৌদি সবে চান করে উঠেছে তখন। চুল এলো করা। ফরসা টক্-টক্ করছে গায়ের রং। পায়ে আলতা লাগানো। একটা হলদে রং-এর শাড়ী পরনে। আমি ডাকলুম—কাবলু—

ডাকতেই কাবলু আর রাঙা বৌদি দু'জনেই আমার দিকে চাইলে।

দেখলাম, রাঙা বৌদির চোখের কালো ঝালর দেওয়া পাতা দু'টো যেন আমার দিকে চেয়ে হাসছে। হয়তো বিস্ময়টাই হাসি হয়ে চোখের পাতায় ঝুলছে। বিস্ময় যে আবার লোক বিশেষে হাসির রূপ নেয়, তা সেই রাঙা বৌদিকে দেখেই আমি প্রথম টের পেয়েছিলুম।

কাবলু আমাকে দেখিয়ে বলল—এই আমার বন্ধু বিলু—

রাঙা বৌদির চোখে যেন আবার বিস্ময় আর হাসির ঝিলিক খেলে গেল। আসলে ঝিলিক ঠিক নয়। ঝিলিক কথাটা বললে ঠিক বলা হবে না। বোধহয় প্রলেপ বললেই ঠিক বলা হবে। কে যেন রাঙা বৌদির চোখে-মুখে একটা বিস্ময় আর হাসির প্রলেপ লাগিয়ে দিল।

কাবলু বললে—আমাদের বাড়ির কাছেই থাকে, আমরা এক ক্লাসে পড়ি—

রাঙা বৌদি কিছু বললে না। তেমনি নির্বাক একটা হাসি হাসতে লাগলো আমার দিকে চেয়ে। কাবলু আমার দিকে চেয়ে বললে—আমি রাঙা বৌদিকে তিনবার হারিয়ে দিয়েছি—জানিস?

তারপর রাঙা বৌদির দিকে চেয়ে বললে—তুমি বিলুর সঙ্গে খেলবে রাঙা বৌদি, ও-ও খুব ভালো লুডো খেলতে পারে—

এই-ই হলো সূত্রপাত। মনে আছে, রাঙা বৌদির সঙ্গে আমি যখনই খেলেছি, তখন আমি তাকে হারিয়ে দিয়েছি। রাঙা বৌদি বলতো—তোমাদের সঙ্গে আমি আর খেলবো না। আমি একবারও জিততে পারি না—

রাঙা বৌদির এই কথাগুলো শুনে তখন কিছুই মনে হয়নি। তখন রাঙা বৌদিকে লুডো খেলায় হারিয়ে দেওয়ার মধ্যে একটা অসাড় আনন্দ পেয়েছি। মনে হয়েছে, রাঙা বৌদি আমাদের চেয়ে সব বিষয়ে বড় হলেও, রূপে-গুণে আমাদের হারিয়ে দিলেও একটা বিষয়ে অন্ততঃ আমরা রাঙা বৌদিকে হারিয়ে দিয়েছি। সেটা হলো লুডো খেলায়।

সেই লুডো খেলার নেশা যেন শেষকালে আমাকে পেয়ে বসলো।

আমার লেখাপড়া ছিল বটে, কিন্তু রাঙা বৌদির তো কোনও কাজকর্ম করতে হতো না। কেবল সেজে-গুজে বসে থাকা আর লুডো খেলা ছাড়া আর কোনও কাজই ছিল না বলতে গেলে। আর কাবলু আর আমার কাজই ছিল, পালা করে রাঙা বৌদির সঙ্গে রোজ লুডো খেলা।

মা বলতো—কোথায় যাস রে তুই সকালবেলা? তোর লেখাপড়া নেই?

আমি বলতুম—কাবলুদের বাড়িতে যাই মা—

মা বকাবকি করতো—কাবলুদের বাড়িতে গিয়ে কী হয়? এগ্‌জামিনের সময়ে কাবলু কি তোর খাতায় লিখে দেবে?

বলতুম—বারে, আমরা যে একসঙ্গে পড়ি। একসঙ্গে পড়লে বেশি করে মন বসে যে—

মা বিশ্বাস করতো কিনা জানি না। হয়তো বিশ্বাস করতো, কিম্বা হয়তো বিশ্বাস করতো না। কিন্তু মা'র বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আমি পরোয়া করতাম না। আমার তখন লুডো খেলার নেশা, রাঙা বৌদির কাছে থাকার নেশা। এই নেশা আমাদের দু'জনকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মাতিয়ে রেখেছিল। আগেই বলেছি ডাক্তার দাসের বিরাট সংসার। সেখানে কে সেতার বাজাচ্ছে, কে পড়ছে কি পড়ছে না, কে খেতে পাচ্ছে না, তার হিসেব রাখা শক্ত ছিল। যার যখন ক্ষিধে পেয়েছে, সে এসে খেতে বসে গেলো! যখনই ক্ষিধে পাবে, তোমার তখনই ভাত তৈরি। তার মধ্যে কোন্ বউ পাড়ার কোন্ ছেলের সঙ্গে লুডো খেলে সময় কাটাচ্ছে, তা নিয়ে কে মাথা ঘামাবে? আর কার কত সময় আছে?

আর যতীনদা? যতীনদা তখন ডাক্তারী পাশ করে সবে বেরিয়েছে। তাকে পশার করতে হবে। তার পশার বাড়াতে হবে। বাবা যতদিন বেঁচে আছে, ততদিন অবশ্য কোনও ভাবনা নেই। ততদিন সংসার যেমন চলছে তেমনিই চলবে।

কিন্তু তারপর তো এই সমস্ত আত্মীয়-অনাত্মীয়ের ভার যতীনদার ঘাড়েই চাপবে। তখন তো তার একলার উপার্জনেই এই সবকিছু চালাতে হবে। তখন কর্তা মারা গেছে বলে পান থেকে চুন খসে গেলে কেউ আর সহ্য করবে না। তখনও ঠিক বাড়িতে এই আধমণ চালের ভাত রান্না হবে, তখনও অতিথি-অভ্যাগত আত্মীয়-অনাত্মীয় বরাবরের মতো যে কেউ বাড়িতে এসে হাজির হবে এবং সেই পাত পেড়ে খেয়ে যাবে।

সুতরাং যতীনদাও ভোরবেলা থেকে বাবার ডাক্তারী পেশার সাহায্য করতে বসে যেত। ডাক্তার দাসের যে রোগীকে দেখতে যাবার সময় হতো না সেখানে যেত যতীনদা। সেই রোগী দেখতে-দেখতেই যতীনদার হাত পাকতো

আর পশার বাড়তো। একটা রোগী ভালো হলে সেই পাড়ার আরো দশটা বাড়িতে যতীনদার ডাক পড়তো।

এই রকম করে করে বাবার যত বয়েস বাড়তে লাগলো, যতীনদার প্র্যাকটিসও ততো বাড়তে লাগলো। বাড়তে-বাড়তে শেষে এমন হলো, যে বাড়িতে এসে নাইবার-খাবার সময়ও পেত না যতীনদা। যতীনদার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হওয়া ঘুচে গেল, যতীনদার আড্ডা-গল্প-আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়ে গেল। তখন কেবল রোগী আর রোগ, তখন কেবল ওষুধ আর প্রেসক্রিপসন। আর এদিকে রাঙা-বৌদির লুডো খেলাও ততো বেড়ে যেতে লাগলো। বাবা বলতেন—তা হোক, এখন তোমার কম বয়েস, এখন তুমি যত খাটতে পারবে পরে আর তত খাটবার ক্ষমতা তোমার থাকবে না—

যে কেসটা যতীনদা বুঝতে পারতো না, সে-কেসটা নিয়ে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতো যতীনদা। জটিল সব কেস সেগুলো। মরণাপন্ন রোগী। প্রায় কোলাপ্‌স করবার দাখিল। সেই সব কেস সারিয়ে যতীনদা আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠতো। কেস যত জটিল হতো, সেই নিয়ে ট্রিট্‌মেণ্ট করতে যতীনদা তত আনন্দ পেত। মনে হতো যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেছে। টাকা তুচ্ছ, স্ত্রী তুচ্ছ, সংসার পরিবার স্বজন-বন্ধুবান্ধব সব তুচ্ছ হয়ে যেত তখন। তখন তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল রোগী!

আর বাড়ির ভেতরে যতীনদার শোবার ঘরের বিছানার ওপর বসে রাঙা-বৌদির লুডো খেলায় ততো উল্লাস ততো উৎসাহ, ততো উদ্দীপনা।

মনে আছে, একবার কাবলুর জ্বর হয়েছিল। রাঙা-বৌদির লুডো খেলবার সঙ্গী নেই। হঠাৎ রাঙা-বৌদির চাকর এসে ডাকলে আমাকে।

আমি তো অবাক। বললাম, কী হলো? হঠাৎ তলব কেন মধু?

মধু বললে—রাঙা-বৌদিমণি আপনাকে ডেকেছে—

আমি তো আনন্দে গদগদ। রাঙা-বৌদি আমাকে ডেকেছে? তাড়াতাড়ি জামা আর প্যাণ্টটা পালটে নিয়ে দৌড়ে গেলাম কাবলুদের বাড়ি।

রান্না বাড়ির উঠোনের পাশেই মাসীমাকে দেখতে পেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—কাবলু কোথায় মাসীমা—

—কাবলুর তো কাল থেকে জ্বর হয়েছে, তুমি জানো না?

বললাম—কই না তো, আমি তো কিছুই শুনিনি—

মাসীমা বললে—জ্বর হবে না? অত কাঁচা তেঁতুল খেয়েছে, জ্বর তো হবেই—

—তেঁতুল? তেঁতুল কখন খেলে? আমি তো তেঁতুল খেতে দেখি নি—

মাসীমা বললে—আচার করবার জন্যে বাজার থেকে কাঁচা-তেঁতুল আনিয়েছিলুম, সেই-ই গোটা কয়েক চুরি করে নুন-তেল দিয়ে খেয়েছে—

অবশ্য দু'দুটো নামজাদা ডাক্তার বাড়িতে রয়েছে, তাতে ভয়ের কিছু ছিল না। এক দাগ ওষুধ খেলেই সেরে উঠবে। তার জন্যে কারো বেশি মাথা-ব্যথা ছিল না। কিন্তু কাবলু না থাকলে রাঙা-বৌদি কার সঙ্গে লুডো খেলবে?

সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে যে-ঘরে কাবলু শুতো, সেই ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, কাবলু অচৈতন্য হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে আছে।

কাছে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম, গা একেবারে আগুন।

আমার হাতের ছোঁয়া লাগতেই কাবলু চোখ তুলে একটু চাইলে। দেখলাম, লাল করমচার মত চোখের রং। আমার দিকে একবার একটুখানি দেখেই আবার চোখ বুঁজিয়ে ফেললে। বললুম—কী রে, তোর জ্বর হয়েছে?

কাবলু কিছু উত্তর দিলে না। যেমন চোখ বুঁজিয়ে ছিল, তেমনি চোখ বুঁজেই রইল। আমি বললাম—তুই কাঁচা তেঁতুল খেতে গেলি কেন? এই বর্ষাকালে কেউ কাঁচা তেঁতুল খায়?

সে কথার আর সে কোনও জবাব দিলে না। বোধহয় আমার কথাগুলো তার কানেও গেল না। তারপর আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না। ভাবলাম, দেখি রাঙা-বৌদি তার ঘরে কী করছে। পায়ে-পায়ে যতীনদার ঘরের দিকে গেলাম। আমি জানতাম, যতীনদা ভোরবেলাই ঘর থেকে উঠে বেরিয়ে যায়। ঘরটার সামনে গিয়ে ভয়ে-ভয়ে ডাকলুম—রাঙা বৌদি—

ভেতর থেকে রাঙা বৌদির গলার আওয়াজ শুনলাম—কে-রে?

আমি সাহস পেয়ে ভেতরে ঢুকে বললাম—আমি—

—তুমি? এসো-এসো—বলে রাঙা বৌদি সেজে-গুজে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে পড়েছিল। আমাকে দেখে উঠে বসলো। আমি বললাম—কাবলুর জ্বর হয়েছে খুব, তাকে দেখতে এসেছিলুম—

রাঙা বৌদি যেন আমায় পেয়ে বেঁচে গেল।

বললে—আয়-আয়, ভেতরে আয়, লুডো খেলবি?

এ যেন সেই 'ভাত খাবি? না আঁচাবো কোথায়' অবস্থা। সাগ্রহে বললাম—কেন খেলবো না?

মনে আছে, রাঙা-বৌদির সঙ্গে লুডো খেলতে-খেলতে কোথা দিয়ে যে দুপুর একটা বেজে গিয়েছিল, তা টেরই পাই নি। যখন রাঙা-বৌদিকে মধু খেতে ডাকতে এল, তখন খেয়াল হলো যে বেলা হয়েছে।

বাড়িতে আসতেই মা বকাবকি সুরু করে দিলে—কোথায় ছিলি তুই এত-ক্ষণ? কেবল আড্ডা আর আড্ডা? এত আড্ডা দিলে লেখাপড়া কখন করবি?

আমি আত্মপক্ষ সমর্থনে বললাম—কাবলুর জ্বর হয়েছে, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

মা বললে—তা জ্বর হয়েছে তো তুই কী করছিলি সেখানে বসে-বসে?

তার মাথা টিপে দিচ্ছিলি? ওদের বাড়িতে দু' দুটো ডাক্তার। তাকে দেখবার কি লোকের অভাব আছে, যে তুই সেখানে গিয়ে বসেছিলি? এই অবেলায় খেলে তোর যদি জ্বর হয়, তখন তোকে কে দেখবে বল দিকিনি?

এ'রকম বকুনি খাওয়া ছোটবেলা থেকেই আমার অভ্যেস। জীবনে ভালবাসা কাকে বলে তা যেমন কখনও জানতে পারিনি, ভালোবাসা পেলে যে কত ভালো লাগে, তাও ছিল আমার কল্পনার বাইরে।

মা'র বকুনি খেতুম বটে, কিন্তু সে সমস্তই পুষিয়ে যেত রাঙা বৌদির স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে। আমি রাঙা-বৌদির কাছে গেলে রাঙা-বৌদি যেন বেঁচে যেত। অন্ততঃ কথা বলবার একটা লোক পেত।

রাঙা বৌদি যদিও ছিল বড়লোকের বাড়ির বউ। তাও আবার সে এত বড়লোক, যে সে বাড়ির বৌকে সংসারের কুটোটি পর্যন্ত নাড়তে হতো না। রাঙা বৌদি যদি কোনদিন কোনও ছুতোয় নীচের রান্না বাড়িতে আসতো তো শাশুড়ি, দিদি শাশুড়ি, মাস শাশুড়ি যে যেখানে থাকতো, সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠতো। তারা সবাই বলতো—তুমি আবার নীচেয় এলে কী করতে বউমা? তুমি ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো গে যাও—এখানে ধোঁয়ার মধ্যে তোমার কষ্ট হবে—

রাঙা বৌদি বলতো—না আমি একটু এমনি দেখতে এলাম—

—না-না, তোমাকে আর এই ধোঁয়াধুলোর মধ্যে আসতে হবে না। এখন তুমি উপরে যাও—

রাঙা-বৌদি বলতো—আমি আপনাদের তরকারি কুটে দেব?

—না বউমা, তরকারি কোটবার লোকের কি বাড়িতে অভাব, যে তোমাকে তরকারি কুটতে হবে? শেষকালে যদি বঁটিতে তোমার হাত কেটে যায়, তখন যে রক্তারক্তি কাণ্ড হবে। শেষকালে যতীন আবার আমাদেরই দোষ দেবে—

এমনি করে সবাই মিলে রাঙা-বৌদিকে পটের বিবি সাজিয়ে বসিয়ে রেখে দিতো। কোনও কাজ করতে হতো না রাঙা-বৌদিকে। কাজ করবার লোকেরও যেমন অভাব ছিল না বাড়িতে, আর কাজ থাকলেও তা তাকে করতে দেওয়া হতো না।

সুতরাং লুডো খেলা ছাড়া রাঙা-বৌদি আর করবেই বা কী?

তাই ডাক পড়তো আমার, আর ডাক পড়তো কাবলুর।

* * *

কিন্তু সংসারের বাঁধা পথের সরল গতিতে কখন যে হঠাৎ একদিন দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তা যদি কেউ আগে থেকে জানতে পারতো!

সেই অত বড় সংসার, অত জাঁক-জমক, অত জম-জমাট বংশ হঠাৎ

একদিন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। একদিন রাত দু'টোর সময় মা ঘুম ভাঙিয়ে আমাকে ডাকলে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসেছি। বললাম—কী মা?

মা বললে—শুনেছিস, তোর মেসোমশাই মারা গেছেন—

মেসোমশাই! মেসোমশাই মারা গেছেন! ঘুমের ঘোর তখনও ভালো করে কাটে নি। মেসোমশাই মারা গেছেন! কার মেসোমশাই, কোন্ মেসোমশাই, কবে মারা গেছেন, কখন মারা গেছেন—আমার কাছে যেন স্বপ্নের মত লাগলো কথাটা।

কিন্তু পাশের বাড়ি থেকে যখন মেয়েলি গলার কান্নার রোল কানে এল, তখন জিনিসটার গুরুত্ব উপলব্ধি হলো। তখন মনে পড়লো, কার কথা বলছে মা। তখন বুঝলাম যতীনদার বাবা মারা গেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে আমি গায়ে জামাটা চড়িয়ে যতীনদার বাড়ির উদ্দেশ্যে দৌড়লাম। মা'কে শুধু জিজ্ঞেস করলাম—দাদা কোথায় মা? দাদাকে খবরটা দাও নি?

মা বললে—দাদা অনেকক্ষণ চলে গেছে, তোর বাবাও গেছে—

তারপর একটু থেমে বলল—তুই যা, আমিও একটু পরে যাবো—

আর একমুহূর্ত দেরি করলুম না। দৌড়ে চলে গেলাম যতীনদাদের বাড়ি। বাইরে থেকেই কান্নার শব্দ কানে এসেছিল, ভেতরে গিয়ে দেখি তখন লোকে লোকারণ্য। আমাদের জোড়াসাঁকোর পাড়ার কোনও লোক আসতে আর বাকি নেই। সবাই ডাক্তার মেসোমশাইকে ভালোবাসতো। ডাক্তার-মেসোমশাইও সকলের বিপদে-আপদে গিয়ে হাজির হতেন। অত বড় লোক, অত ব্যস্ত লোক, তবু সকলের জন্যেই সমবেদনা আর সহানুভূতি ছিল তাঁর। বয়েস হয়েছিল তখন তাঁর অনেক। কিন্তু কোনও রোগী তাঁকে ডাকলে আর তিনি 'না' বলতে পারতেন না। অনেক সময়ে অনেক লোক তাঁর নায্য পাওনা দিতেও পারতো না। যাদের বাড়িতে এককালে দু'টাকা ভিজিট নিয়েছেন, তাদের কাছ থেকে বরাবর দু'টাকাই নিতেন। কেউ আবার আট টাকা, আবার যারা নতুন লোক, তাদের কাছে ষোল টাকাও নিতেন। আর যারা বস্তির গরীব লোক তাঁর কাছে রোগ দেখাতে আসতো, তাদের কাছ থেকে অনেক সময়ে কিছুই নিতেন না। বলতেন—তুই আবার টাকা দিবি কোত্থেকে? বরং ওই টাকাটা দিয়ে তুই মাছ-মাংস কিনে খাস—

আহা, সেই লোকটাই চলে গেলেন। যারা-যারা সেদিন তখন ডাক্তার-মেসোমশাই-এর মৃত্যুর পেয়ে সেখানে হাজির হয়েছিল, তারা সকলেই হায়-হায় করতে লাগল! এ-মৃত্যু যেন তাদের পরমাত্মীয়ের মৃত্যু। এ যেন তাদের পরমাত্মীয়ের বিয়োগ।

দেখলাম, যতীনদা বাবার পাশে বসে আছে। একেবারে ভেঙে পড়েছে মানুষটা। যতীনদার যে শহরে তখন দিন-দিন পশার বাড়ছিল, সে-তো

ডাক্তার মেশোমশাই-এর ছেলে বলেই। ডাক্তার মেসোমশাইকে সবাই ভালোবাসতো বলেই যতীনদাকেও ভালোবাসতো। বাবার কাছেই যতীনদার হাতেখড়ি। বাবার রোগীরাই আবার ছেলের রোগী হয়ে উঠেছিল কালক্রমে। বাবার বয়েস বাড়ার সঙ্গে বাবার জায়গাটা ছেলে নিয়ে নিচ্ছিল আস্তে-আস্তে।

সুতরাং যতীনদারই সব চেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তার চোখে তখন এতটুকু জল দেখিনি। একেবারে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসেছিল একভাবে।

আর রাঙা-বৌদি? সেই রাত দু'টোর সময় বাড়িটা যেন দিন হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তার মেসোমশাই-এর মৃত্যুতে। যে-যেখানে ছিল সবাই এসে হাজির হয়েছিল। আমি কাবলুর পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিলাম। কাবলু খুব কাঁদছিল। কাবলুর অবশ্য কাঁদাই স্বাভাবিক। কারণ তার বাবা চলে যাওয়া মানে সব চলে যাওয়া। যতীনদার চেয়েও ডাক্তার মেসোমশাই কাবলুকেই বেশি ভালোবাসতেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—হঠাৎ কী করে এমন হলো রে?

কী করে যে এমন হলো, তা কি কাবলুই জানে? শুধু কাবলু কেন, কেউই জানতো না। সকালবেলাও সেদিন কেউ জানতো না যে এমন হবে, বিকেল বেলাও কেউ জানতো না। এমন কি সন্ধেবেলাও যেমন রোজ তিনি তাঁর চেম্বারে বসে রোগী দেখেন, সেদিনও তেমনিই দেখেছেন। তারপর রাত সাড়ে ন'টার সময় যেমন রোজ খাওয়া-দাওয়া সারেন, তেমনিই সেরেছেন। কোথাও কোনও অনিয়ম বা অত্যাচার অনাচার হয়নি বা হতে দেননি। আর তারপর শুতে গেছেন। শুয়ে ঘুমিয়েও পড়েছেন। হঠাৎ মাঝ-রাত্রে কী-রকম একটা ঘড়-ঘড় শব্দে মাসীমার ঘুম ভেঙে গেছে। মাসীমা পাশেই শুয়ে থাকতো। সেই আওয়াজটা শুনেই মাসীমা মেসোমশাই-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে তোমার? কষ্ট হচ্ছে খুব? অমন করছো কেন?

কিন্তু ডাক্তার-মেসোমশাই তখন যন্ত্রণায় ছট্‌পট্ করছেন!

মাসীমা আবার জিজ্ঞাসা করলে—যতীনকে ডাকবো?

তবু কোনও জবাব নেই ডাক্তার মেসোমশাই-এর মুখে।

মাসীমা আর দেরী করলেন না। কেমন যেন ভয় হলো তার। ছেলের ঘরে গিয়ে ডাকলে—ওরে যতীন, যতীন—

যতীনের কোনোও সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু ভেতরে থেকে দরজা খুলে আলুথালু সাজে বেরিয়ে এল রাঙা-বৌদি—

মাসীমা জিজ্ঞেস করলে—যতীন কোথায় বউমা? যতীন ঘরে নেই।

রাঙাবৌদি বললে—তিনি তো নেই মা—

—নেই মানে? কোথায় গেল সে?

রাঙাবৌদি বললে—তিনি তো কল-এ বেরিয়ে গেছেন মা—

—কল-এ বেরিয়েছে? কখন বেরলো? আমি তো কিছু টের পাইনি। াকে তো কিছু বলোনি তুমি। সে-তো খেয়ে-দেয়ে ঘরে শুতে এল, পর তো আমরা খেতে বসলুম—

রাঙা-বৌদি বললে—তিনি তো ঘুমিয়েই পড়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ যে টা জরুরী টেলিফোন এল। সেই টেলিফোন পেয়েই তো চলে গেলেন। লন, ফিরতে অনেক রাত হবে—

মাসীমা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বললেন—এখন কি হবে? তোমার র যে কেমন করছেন, এখুনি তাঁকে ওষুধ দেওয়া দরকার।

বাড়িময় তখন সবাই খবরটা পেয়ে গেছে। সব ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। -ফট্ করে যে-যেখানে ছিল, সবাই ডাক্তার মেসোমশাই-এর শোবার ঘরে ড় এসেছে।

কিন্তু ভাগ্য ভালো যে, যতীনদাও ঠিক সেই সময়ে বাড়ি ফিরলো। তবে লে হবে কী, আর একটু আগে ফিরলে অবশ্য কী হতো বলা যায় না, ন্তু যাঁর সময় হয়ে গেছে, তাঁকে কে আটকে রাখবে?

বাড়িতে নিজের ছেলে ডাক্তার থেকেও কোন লাভ হলো না। ডাক্তার সামশাই তার আগেই মারা গেলেন। এর পর থেকেই সব যেন কেমন লাট-পালট হয়ে গেল। সোজা-পথের গতিতে হঠাৎ জীবনের গাড়িটার টা ধাক্কা লাগলো। যেমন ভাবে জগৎ-সংসার চলছিল, তখন তেমন র চললো না। এমন কি যে পাড়ায় আমরা বাস করতাম, তখন সেই ড়াসাঁকো পাড়াই যেন রাতারাতি কানা হয়ে গেল।

ডাক্তার মেসোমশাই-এর যে বাড়িতে রোজ আধমণ চালের ভাত রান্না া, যে-বাড়ি সারা দিন-রাত লোকজন সমাগমে অত সরগরম ছিল, ই বাড়িটাও তারপর থেকে কেমন যেন ঝিমিয়ে এল।

তখন অবশ্য আমি কাবলুদের বাড়িতে যেতাম। সেটা যেন আমার ভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেই আগেকার মতন রাঙাবৌদির সঙ্গে লুডোও তাম। রাঙা-বৌদিও ঠিক সেই আগেকার মত সেজে-গুজে বিছানার ওপর । থাকতো। কিন্তু আগেকার মত আমাদের খেলা যেন আর জমতো না।

ডাক্তার মেসোমশাই-এর শ্রাদ্ধের পর পর্যন্ত কিছু ইতর-বিশেষ হয়নি। ছু বুঝতেই পারেনি কেউ যে, বাড়ির ভিত্‌টা এমন করে নড়ে গেছে। ত পারা যায়নি যে সংসারের ফাটল ধরেছে!

বুঝতে পারা গেল পরে যখন যতীনদা আলাদা বাড়ি করলে।

আলাদা বাড়ি করা এমন কিছু দোষের নয়। কারণ, যতীনদার পসার

তখন এত বেশি বেড়ে গেছে যে, তার সব সময়ে বাড়ি আসা সম্ভব হতো ন
যতীনদা তখন নার্সিংহোম করেছে পার্ক স্ট্রীটে। বাড়িও করেছে থিয়েট
রোড়ে।

পার্ক স্ট্রীট সাহেব-পাড়া। সাহেবপাড়া মানে আন্তর্জাতিক মানু
পাড়া। সেখানে সাহেব আছে, চিনেম্যান আছে, এমব্যাসীর লোকজ
অফিস-কারবার আছে। আর আছে ইংরেজদের ছেড়ে চলে যাওয়া বা
গুলোর নতুন বাসিন্দারা। সেই সব নতুন বাসিন্দারা হলো সব নতুন যু
মানুষ। নতুন শ্রেণী। •

সমাজের এই নতুন শ্রেণীর মানুষদের নতুন পাওয়া ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে ত
পার্ক স্ট্রীট অঞ্চল জম-জমাট হয়ে উঠলো। ওই উত্তরের শ্যামবাজার, বউবা
জোড়াসাঁকো অঞ্চল—যেগুলো আগেকার বনেদী পাড়া বলে বিখ্যাত ছি
তা আস্তে-আস্তে ম্লান হয়ে গেল। আর দক্ষিণের হরিশ মুখার্জি রে
পদ্মপুকুর কিম্বা বালিগঞ্জ, নিউ আলিপুরও তখন কেমন দিশি চেহারা নিয়ে
যাকে বলে বনেদীয়ানা, তা সে-সব জায়গার গা থেকে কখন মুছে গে
সেই সময়ে যারা নতুন শ্রেণী গজিয়ে উঠলো, তাদের নজর পড়লো পার্ক স্ট্রি
ক্যামাক স্ট্রীট, আর থিয়েটার রোড়ের দিকে, সেখানে বাস করলে নতুন সমা
শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। সমাজের নতুন ইজ্জৎ পাওয়া যায়।

যদি কেউ জিজ্ঞেস করে—আপনার ঠিকানা?

আপনি যদি তার জবাবে বলেন—জোড়াসাঁকো, তা'হলে আপনার ই
কমে যাবে। আপনি যদি জোড়াসাঁকোর ডাক্তার হন, কিম্বা আপনার চে
যদি জোড়াসাঁকোয় হয়, তাহলে আপনার ভিজিট্ কমে যাবে। আপনি ব
টাকা কিম্বা আরো বেশি হলে বড় জোর ষোল টাকা দাবি করতে পারে
কিন্তু যদি আপনার চেম্বার পার্ক স্ট্রীট কি ক্যামাক স্ট্রীট কিম্বা থিয়েটার
হয়, তা'হলে আপনি যা খুশী ভিজিট্ চাইলেও কেউ-ই তা দিতে আপ
করবে না। আর তার সঙ্গে আপনার নার্সিংহোম। নার্সিংহোম যদি শ্যামবা
কি বউবাজার কিম্বা ভবানীপুরে হয়, তা'হলে সেখানকার রোগীরা হবে স
রোগী, গরীব রোগী।

বাড়ির ঠিকানা থিয়েটার রোড, অর্থাৎ সেটা আপনার চেম্বার। সেখ
রোগ দেখাতে গেলে আমি আপনার সব দাবী মেটাবো। কারণ সে রো
আসবে নেপাল থেকে, সিকিম থেকে ভুটান থেকে। নেপাল-ভুটান সিকি
রাজা-রাণীরা বড় কোনও রোগের চিকিৎসার জন্য ভিয়েনা যায়, আমেরি
যায়। কিম্বা ওই রকম কোনও দেশে গিয়ে তাদের চিকিৎসা করার পে
একটা ইজ্জতের প্রশ্নও জড়িয়ে থাকে। কিন্তু তাদের কাছে ইণ্ডিয়া
বোম্বাই-দিল্লী আর নয় তো কলকাতা। আর কলকাতা বলতে অ

কলকাতাকে বোঝায় না। বোঝায় ঐ নকল কলকাতা। মানে ওই পার্ক ষ্ট্রীট, ক্যামাক ষ্ট্রীট আর থিয়েটার রোডের আশে-পাশের জায়গাগুলো।

তাই যতীনদা যখন ডাক্তার দাস হয়ে উঠলো, তখন পসারের খাতিরে বাড়ি করলে থিয়েটার রোডে। আর নার্সিং-হোম পার্ক ষ্ট্রীটে।

পার্ক-ষ্ট্রীটের নার্সিং হোমের জৌলুষ, বড় উঁচু দরের জৌলুষ। ডাক্তার দাসের সে নার্সিং হোম সাধারণ লোকের গতিবিধি নিষেধ। তিনশো টাকার দৈনিক ভাড়া দিয়ে ডাক্তার দাসের নার্সিং হোমে ভর্তি হওয়ার ভাগ্য ক'টা লোকের কপালেই বা জোটে।

কিন্তু তবু সেই দৈনিক তিনশো টাকার খদ্দেরদেরই এত ভীড়, যে তার জন্যেও ডাক্তারদের খোসামোদ করতে হয়। মুখের খোসামোদ নয়, চেম্বারে গিয়ে রোগ দেখিয়ে কিছু টাকাও খেসারত দিতে হয়।

যতীনদা তখন ডাক্তার দাস। শিক্ষিত-ধনী সমাজের ডাক্তার, গরীব লোকের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। যদি কোনও গরীব লোক, ডাক্তার দাসকে দিয়ে তার চিকিৎসা করতে চায় তো, সে চলে যাক হাসপাতালে। হাস-পাতালের আউটডোরে গিয়ে টিকিট করুক। সেখানে গিয়ে আরও হাজার জনের সঙ্গে লাইন দিক্। আর লাইন দিলেই যে ডাক্তার দাসের দেখা পাবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই, তবে তাঁর এ্যাসিস্টেন্টরা আছে, তারা দেখবে। তার দুধের পিটুলি গোলা জল খেতে হবে। সেই পিটুলি গোলা জল খেয়েই নিজেকে মনে করতে হবে খাঁটি দুধ খাচ্ছি।

কিন্তু তা বলে ডাক্তার দাস যে হাসপাতালের চাকরিটি ছেড়ে দেবেন, সে ক্ষমতা বা সে সাহসটুকুও তাঁর নেই। ওটা সেই যা আগে বলছি—সিঁথির সিঁদুর। ওই সিঁথির সিঁদুরটাকে মূলধন করেই তিনি বাজারে মোটা লাভের ব্যবসা করেন। স্বামীর ভালো আয় না থাকলে যেমন স্ত্রীলোকেরা করে থাকে।

তা যতীনদার আরো পসার হোক কি আরো খ্যাতি হোক, ডাক্তার হিসেবে আরো প্রতিষ্ঠা হোক, তা নিয়ে আমাদের মনে কোনও ক্ষোভ বা ঈর্ষা ছিল না। আমাদের ক্ষোভ আর ঈর্ষা ছিল অন্য কারণে।

আসলে রাঙা-বৌদির জন্যেই কাবলুর আর আমার ক্ষোভ ছিল।

যতীনদা থিয়েটার রোডে বাড়ি করে চলে গিয়েছিল, তাতে যদি দুঃখ কেউ পেয়ে থাকেন তো সে মাসীমা, কাবলুর মা। মাসীমা শেষের দিকে কাঁদতো।

মাসীমা ডাক্তার-মেসোমশাই-এর শোকে কাঁদতো, না সংসার ছন্নছাড়া হয়ে যাওয়াতে কাঁদতো, না কি ছেলে-বউ আলাদা হয়ে যাওয়াতে কাঁদতো, তা বলতো না কাউকে! কিন্তু যতীনদার নিজের প্র্যাকটিশের ভিড়ে জোড়া-সাঁকোর বাড়িতে আসতে না পারলেও রাঙা-বৌদি মাঝে-মাঝে আসতো শাশুড়িকে দেখতে। মাসীমা রাঙা-বৌদিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতো।

বলতো—তোমরা চলে গেলে বউমা, কিন্তু আমি কী নিয়ে থাকি, কার জন্যে এই ভূতের বেগার খাটি? তোমার শ্বশুরও চলে গেলেন, যতীনও চলে গেল, তা'হলে কীসের জন্যে এই সংসার।

রাঙা-বৌদি বলতো—তা আপনিও আমার সঙ্গে চলুন না মা, আমাদের বাড়িতে আপনিও চলুন, এখানে কেন পড়ে আছেন?

মাসীমা বলতো—না বউমা, তোমার শ্বশুর যে-বাড়িতে মারা গেছেন সে বাড়ি ছেড়ে আমি যেতে পারবো না। তোমার শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে আমি স্বর্গে গিয়েও সুখ পাবো না—

তারপর মিষ্টি খেতে দিতো রাঙা-বৌদিকে। বাড়ি শুদ্ধু সবাই রাঙা-বৌদিকে দেখতে আসতো। মাসীমা বলতো—তুমি আর একটা সন্দেশ নাও বউমা? তোমাদের সাহেব পাড়ায় এ রকম সন্দেশ পাবে না। আর যতীনের জন্যেও দু'টো নিয়ে যাও। আমার যতীন ছোটবেলায় এই সন্দেশ খেতে খুব ভালোবাসতো—

বলে মধুকে দিয়ে ভালো-ভালো মিষ্টি কিনিয়ে আনতো। তারপর প্যাকেট-সুদ্ধু সন্দেশগুলো রাঙা বৌদির হাতে দিত। বলতো—ভাত খাবার পর এই সন্দেশগুলো দিও যতীনকে, বুঝলে বউমা।

তারপর বলতো—এই সেদিন ইলিশ মাছ এসেছিল বাড়িতে, গঙ্গার ইলিশ। বেশ সরষে দিয়ে ঝাল রেঁধেছিল ঠাকুর। সবাই খেয়ে খুব তারিফ করতে লাগলো। শুনে আমার কেবল যতীনের কথা মনে পড়তে লাগলো এই ইলিশ মাছ যতীন বড় খেতে ভালবাসতো, ভাবলুম যতীন বোধহয় আর এসব খেতে পাচ্ছে না—

তারপর জিজ্ঞেস করতো—তা তোমাদের বাজারে ইলিশ মাছ-টাছ আসে? ও তো শুনেছি সাহেব-মেমদের পাড়া। ওরা কি আর ইলিশ মাছ খায়?

রাঙা-বৌদি বলতো—ইলিশ মাছ কতদিন আমরা চোখে দেখিনি মা, তা আর মনে পড়ে না—

—কেন, তোমাদের লোককে আমাদের বাজারে পাঠালেই পারো—

রাঙা-বৌদি বলতো—আপনার ছেলে এখন অন্যরকম হয়ে গেছে মা—

মাসীমা অবাক হয়ে যেত। বলতো—কেন, অন্যরকম হয়ে গেছে মানে?

রাঙা-বৌদি বলতো—আমাদের ওখানে তো ঠাকুর নেই, সব বাবুর্চি-খানসামার ব্যাপার। তারা কেবল চিকেন আর মট্‌ন আনে।

—তাই নাকি? ঠাকুর নেই?

—না বাবুর্চি আছে। উনি তার রান্নাই পছন্দ করেন এখন। বলেন, শরীরের পক্ষে চিকেনটা খুব উপকারী। ওতে নাকি শরীরে শক্তি বাড়ে—

—আর তুমি? তুমিও চিকেন খাও নাকি?

রাঙা-বৌদি বলতো—দু'জন মানুষের জন্যে আবার দু'রকম রান্না কি হয়? আমিও তাই খাই।

মাসীমা জিজ্ঞেস করতো—আজ কী রেঁধেছিল?

রাঙা বৌদি বলতো—সুপ, চিকেন কারি, রাইস আর পুডিং—

—ওমা—মাসীমা অবাক হয়ে যেতো রাঙা-বৌদির কথা শুনে।

বলতো—কেন বউমা, তোমরা ভাত খাও না?

রাঙা-বৌদি বলতো—হ্যাঁ, ওই যে বললুম রাইস, মানেই ভাত।

—আর চচ্চড়ি, ডালনা, শুক্তো, বেগুন ভাজা এসব কিছু করতে বলো না কেন তোমাদের বাবুর্চিকে?

রাঙা-বৌদি বলতো— আপনার ছেলে ওসব কিছু খাবে না। বলে ওসব খেলে নাকি শরীরের কোনও উপকার হয় না, শুধু জিভের জন্যে ওই সব খাওয়া—

মাসীমা সব শুনে অবাক হয়ে রাঙা-বৌদির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতো। তারপর বলতো—তা'হলে তো তোমার বড় কষ্ট বউমা, তুমি তো পুঁইশাকের ডাঁটা দিয়ে ইলিশ মাছের কাঁটা-চচ্চড়ি খেতে ভালোবাসতে। এখন তো তা'হলে তোমার পেটই ভরে না।

তারপর কী ভেবে নিয়ে মাসীমা বলতো—তার চেয়ে তুমি এক কাজ করো না বউমা। তোমার তো অনেকগুলো গাড়ি, তুমি রোজ দুপুরবেলা বাড়িতে গাড়ি পাঠিয়ে দিও বুঝলে? আমার এখানে যা রান্না হবে, তোমার জন্যে পাঠিয়ে দেব—তোমার ড্রাইভারকে বলে দিও, সে টিফিন-কেরিয়ার করে নিয়ে যাবে আর পরের দিন আবার সেটা ফিরিয়ে দেবে—

রাঙা-বৌদি বলতো—আপনার ছেলের কি আর খাবার সময় আছে, যে মন দিয়ে চেখে-চেখে খাবেন। তিনি কখন খান আর কখন না-খান, তারই ঠিক নেই। অর্ধেক দিনই বাড়িতেই খান না—

মাসীমা অবাক হয়ে যেতো। বলতো—সে কি, যতীন অর্ধেক দিনই বাড়িতে খায় না? তা'হলে কি বাইরে খায়?

রাঙা-বৌদি বলতো—তা জানি না। খাবার সময় কোথায় তাঁর বলুন? ভোর পাঁচটা-ছটা থেকেই তো কেবল রোগী আর রোগী। রোগীর ভিড়ের জ্বালাতেই তো বাড়ি সবসময় সরগরম। অনেকদিন আবার আমার সঙ্গে দেখাই হয় না—আমাকে টেলিফোন করে দেন, আমি নেপাল চলে যাচ্ছি —

মাসিমা রাঙা-বৌদির মুখে এসব কথা শুনে অবাক হয়ে যেত। যতীন যদি বাড়িতেই না আসে, বাড়িতেই না খায়, তা'হলে অমন ডাক্তারী করার দরকারটাই বা কী? তা'হলে আলাদা বাড়ি করে সাহেবপাড়ায় যাবারই বা কী দরকার? আর তা-ছাড়া তার বিয়ে করাই বা কেন? কই ডাক্তার মেসোমশাইও তো ডাক্তারী করতেন, কিন্তু তিনি তো এমন করতেন না।

তিনি তো ঠিক সময়ে খাওয়া-খাওয়া করতেন। তিনি সংসারও দেখতেন। রাত্রে তো বাড়িতেও ফিরতেন তিনি। কিন্তু যতীনের এ কী ডাক্তারী করা, যে বউমাকে রেখে কেবল রোগী নিয়ে মেতে আছে।

—তা তোমার একলা-একলা সময় কী করে কাটে বউমা ?

রাঙা-বৌদি বলতো—আমাকে গাড়ি দিয়েছেন, আমি কেবল সেই গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াই—

—কেবল গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াও ?

—তা ছাড়া আর কী করবো মা। বাড়িতে তো আর লোকজন কেউ নেই। এমন একটা লোক নেই, যে তার সঙ্গে গল্প করি। আর খেতে তো মাত্র দু'টি প্রাণী। রান্নাই বা আর কত হবে। যদি কখনও ইচ্ছে হলো তো নিউমার্কেটে গিয়ে চোখের সামনে যা পাই, তাই কিনে আনি—

—কী কেনো ?

রাঙা-বৌদি বলতো—কখনও চিকেন কিনি, কখনও শাড়ি, কখনও ব্লাউজ আবার কখনও ড্রয়িং-রুম সাজাবার জন্যে পুতুল খেলনা, চেয়ার-টেবিল, বিছানার চাদর-বালিশের ওয়াড় কিনি ! নিউ মার্কেটে কেনবার জিনিষের কি অভাব আছে ? দরকার থাকলেও কিনি, না দরকার থাকলেও কিনি—

—তাতে তো তোমার অনেক টাকা বাজে খরচ হয়। এত বাজে খরচ কেন করো ? এত টাকা নষ্ট করা কি ভালো ? যতীন তো আমাকেই মাসে পাঁচশো টাকা করে পাঠায়, তাই-ই আমার খারাপ লাগে। এখন কম বয়সে, এখনই তো টাকা উপায় করার বয়েস। এখন একটু টাকা জমিয়ে নাও। একদিন তোমাদেরও তো ছেলে-মেয়ে হবে বউমা, সংসার হবে, তখন তো টাকার দরকার হবে। চিরকাল তো মানুষের সময় ভালো যায় না ! এই দেখ না কর্তা যখন ছিলেন, তখন যদি আমি তোমার মত দু'হাতে টাকা খরচ করতুম তো আজ আমার এই সংসার চলতো ? যতীনকে তুমি বলে দিও বউমা, আমাকে আর এই মাস থেকে পাঁচশো টাকা করে পাঠাতে হবে না—

রাঙা-বৌদি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসার খবর পেলেই আমি দৌড়ে ও বাড়ি চলে যেতুম। কাবলু আর আমি চুপ করে বসে থাকতুম কতক্ষণে মাসীমার সঙ্গে রাঙা বৌদির কথা শেষ হবে। যতক্ষণ রাঙা-বৌদি মাসীমার সঙ্গে কথা বলতো, ততক্ষণ আমরা হাঁ করে বসে থাকতুম রাঙা-বৌদির দিকে চেয়ে। আর শুধু আমরা নয়, বাড়ির সবাই যে-যেখানে থাকত, রাঙা-বৌদি আসার খবর পেলেই দৌড়ে এসে তাকে ঘিরে গোল হয়ে বসতো। তারপর এক সময় রাঙা-বৌদির বাড়ি যাবার সময় হতো। তখন আমাদের দিকে রাঙা-বৌদির নজর পড়তো ! কাবলুর আর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতো —কী, তোমরা কেমন আছো ? লেখাপড়া করছো তো মন দিয়ে ?

এ কথার জবাবে কাবলুও মাথা নাড়তো, আমিও নাড়তুম ।

রাঙা-বৌদি বলতো—হ্যাঁ, খুব ভালো করে মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। লেখাপড়া না করলে জীবনে কিছুই করতে পারবে না। লেখাপড়া মন দিয়ে করেছিল বলেই তোমার দাদা অত বড় হয়েছে তা জানো ? কত জায়গা থেকে তোমার দাদার ডাক আসে। কত জায়গায় তোমার দাদা রোগী দেখতে যায়। তিনটে গাড়ি কিনেছে, দেখেছ তো। এই যে গাড়ীটা চড়ে এসেছি, এটার দাম চল্লিশ হাজার টাকা। তোমার দাদা যে গাড়িটা চড়ে যায়, সেটার দাম একলাখ দশ হাজার টাকা। এছাড়াও আরো একটা গাড়ি আছে তোমার দাদার। তোমরাও যদি দাদার মতন লেখাপড়া করো তো তোমরাও এমনি বড়লোক হতে পারবে, জানলে ?

আমি হঠাৎ কথার মধ্যিখানে জিজ্ঞেস করে ফেললুম—এখনও তুমি সেই লুডো খেলো রাঙা-বৌদি ?

—লুডো ?

রাঙা-বৌদি যেন অনেক দিন আগে ফিরে গেল লুডোর কথা শুনে। জিজ্ঞেস করলে—তোমরা এখনও লুডো খেলো নাকি ?

কাবলু বললে—না। তুমিও চলে গেলে আর আমাদের লুডো খেলাও বন্ধ হয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—এখন তা'হলে কী করে সময় কাটাও তুমি ?

রাঙা-বৌদি হাসতে লাগলো। সেই আগেকার মিহি-মিষ্টি হাসি।

বললে—সময় কাটাবার কি জিনিসের অভাব আছে আমার ? হঠাৎ ইচ্ছে হলো রাজ-বাহাদুরকে ডাকলুম। তাকে বললুম গাড়ি বার করতে। গাড়ি নিয়ে চলে গেলুম কোনদিন বকখালিতে। সেখানে একটা রেস্ট-হাউস আছে, সেই রেস্ট হাউসে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকে চুপ-চাপ বসে সমুদ্রের ঢেউ গুনতে লাগলুম।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—রাজ-বাহাদুর ? সে কে ?

রাঙা-বৌদি বললে—সে আমার ড্রাইভার। খুব এক্‌সপার্ট ড্রাইভার। এমন এক্‌সপার্ট ড্রাইভার যে, সে যখন গাড়ি চালায় তখন এতটুকু ধাক্‌কা লাগে না শরীরে। রাজ-বাহাদুরের গাড়িতে চড়লে মনে হয়, যেন আমি দোলনায় দোল খাচ্ছি। এমন আরাম লাগে—

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি আর লুডো খেলো না কেন রাঙা-বৌদি ? ত'াহলে তো তোমার অনেক সময় কাটতো।

রাঙা-বৌদি বলল—লুডো আর খেলবো কার সঙ্গে ? ঝি-চাকরের সঙ্গে ?

বললাম—কেন, আর কেউ নেই তোমাদের বাড়িতে ? যতীনদা যখন বাড়িতে আসে, তখন তার সঙ্গেই খেললেই পারো।

রাঙা-বৌদি বললে—দূর বোকা ছেলে, তাঁর কত কাজ। তাঁর ক
রোগী। ভোর ছ'টার পর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত তাই নিয়েই ব্যস্ত থাবে
—তোর দাদার সঙ্গে তো আমার দেখাই হয় না। এক-একদিন রাত্রিরে
ফেরেন না। কাজ খুব তো, কাজের ঠেলায় তোর দাদা সব সময় অস্থির
তোর দাদার সঙ্গে দেখা করতে হলে তু'মাস আগে থেকে খাতায় নাম লিখি
রাখতে হয়, তা জানিস্ ?

আমরা রাঙা-বৌদির কথা শুনে অবাক হয়ে যেতাম। আশ্চর্য তো
এত কাজের মানুষ যতীনদা। কিন্তু কই ডাক্তার-মেসোমশাইকেও তে
দেখেছি। তাঁরও তো অনেক রোগী ছিল। তাঁকেও তো সারাদিন পাড়ায়
পাড়ায় ঘুরে রোগী দেখে বেড়াতে হতো। কিন্তু তিনি তো তবু বাড়িতে এ
ভাত খেতেন। মাসীমার কাছে সংসারে সকলের স্নুবিধে-অস্নুবিধের খব
নিতেন। রাত্রিরে বাড়িতেই ঘুমোতেন। যদি কখনো তেমন জরুরী দরকা
পড়তো, তো রাত্রে গাড়ি বার করতে বলতেন ড্রাইভারকে। গাড়ি বেরো
তিনি রোগী দেখতে যেতেন। তাও সে কালে-ভদ্রে। তা বলে রাঙা-বৌদি
সঙ্গে দেখা হবে না যতীনদার, এ আবার কেমন কথা।

রাঙা-বৌদি বললে—তোরা জানিস না, তাই ওই কথা বলছিস। তো
দাদা আরো অনেক বড় ডাক্তার। ডাক্তারদের মধ্যেও তো আবার ছোট-ব
আছে। তোর দাদা যে এখন ইণ্ডিয়ার মধ্যে একজন নামকরা ডাক্তার
অত বড় ডাক্তার ইণ্ডিয়ায় চার-পাঁচজন মাত্র আছে। কত জায়গা থে
তোর দাদার ডাক আসে, তা জানিস ?

কাবলু জিজ্ঞেস করল—কত জায়গা থেকে ?

রাঙা-বৌদি বললে—একবার আফগানিস্থানের প্রেসিডেণ্টের বাড়ি থেকে
ডাক এসেছিল –

—তা'হলে তো যতীনদা অনেক টাকা পেয়েছে সেখান থেকে
প্রেসিডেণ্টের বাড়ি রোগীর চিকিৎসা তো আর কম টাকায় হবে না ?

—তা-তো হবেই না। একবার আবার সিলোন থেকেও কল এসেছিল
আর ইণ্ডিয়ার ভেতরে বোম্বাই, গুজরাট, কেরালার তো কথাই নেই। ত
সব জায়গায় তো আর তোর দাদা যেতে পারে না অত সময় কোথায় ? এ
মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের চাকরি, তার ওপর আবার নিজের থিয়েটা
রোডে বাড়ির চেম্বার। সবদিক তো নিজেকেই সামলাতে হবে। এ-কা
তো আর এ্যাসিসটেণ্টদের দিয়ে চালানো যায় না।

কাবলু বললে—তাহ'লে তো যতীনদার অনেক টাকা, না রাঙা-বৌদি ?

রাঙা-বৌদি বললে—হ্যাঁ অঢেল টাকা। এত টাকা যে, সে গু
শেষ করা যায় না।

আমি বললাম—তাহ'লে তো তোমার খুব মজা, না রাঙা-বৌদি ?

রাঙা-বৌদি বললে—কেন, মজা কেন ?

আমি বললাম—বাঃ, মজা না ? তুমি বেশ অনেক সিনেমা দেখতে পারো। কেউ তাহ'লে তোমাকে কিছু বলতে পারবে না, কেউ বলতে পারবে না তুমি কেবল সিনেমা দেখে টাকা নষ্ট করছো।

রাঙা-বৌদি এবার আরো জোরে হেসে ফেললে। বললে—দূর সিনেমায় তো যখন-তখন গেলেই হলো। ও দেখতে আর কত পয়সাই বা খরচ হয় ? সিনেমা দেখার যা খরচ, তার চেয়ে বেশি খরচ যায় আমার গাড়ির পেট্রলের পেছনে, গাড়ির ড্রাইভারের মাইনের জন্যে। রাজবাহাদুরকে তোর দাদা কত মাইনে দেয় জানিস ?

—কত ?

রাঙা-বৌদি বললে—শুনলে চমকে যাবি। সাড়ে পাঁচশো টাকা—

সাড়ে পাঁচশো টাকা একজন মোটর ড্রাইভারের মাইনে শুনে আমরা সত্যিই চমকে উঠলাম। একজন বি-এ, এম-এ পাশকরা ছেলেও তো অফিসে ঢুকে অত টাকা মাইনে পায় না আজকাল! কাবলু বললে—কেন, অত টাকা মাইনে দাও কেন রাঙা-বৌদি ? তোমাদের টাকা কি সস্তা ?

রাঙা-বৌদি বললে—মাইনে দেব না ? আমার ড্রাইভারের কত খাটুনি তা জানিস ? দিন-রাত যখন ইচ্ছে ডাকলেই তাকে গাড়ি বার করতে হয়। সময়-অসময় নেই, খাওয়ার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। গাড়ি চালাচ্ছে তো চালাচ্ছেই। আর শুধু কি মাইনে ? তার ওপর ফ্রী থাকবার ঘর, জামা-কাপড়, পুজোর বোনাস ! আর দু'বেলা খাওয়া, চা-জলখাবার। আজকাল-কার মাগ্‌গি-গণ্ডার বাজারে এসব না দিলে সে খুশি মনে কাজ করবে কেন ? আর কাজ করবার সময় মন যদি খুশি না থাকে তো ভালো করে কাজ করতে পারে কখনও কেউ ? নইলে রাস্তায় গাড়ি চালাতে-চালাতে যদি এ্যাক-সিডেণ্ট হয় ?

—ক'টা ড্রাইভার তোমার ?

রাঙা-বৌদি বললে—আমার একজন। ওই রাজ-বাহাদুর। কিন্তু তোর দাদার দু'টো গাড়ি, তিনজন ড্রাইভার।

—কেন ? দু'টো গাড়ি, তিনজন ড্রাইভার কেন ?

রাঙা-বৌদি বললে—বা রে, একটা গাড়ি যদি কারখানায় যায়, তখন কাজ চলবে কী করে ? তোর দাদা রোগী দেখতে বাইরে যাবে কী করে ? সেই জন্যে দু'টো গাড়ি রেখেছে।

—তা দু'টো গাড়ির জন্যে তিনজন ড্রাইভার কেন ?

—বাঃ ধর একজন ছুটি নিলে, আর একজনের জ্বর হলো, তখন বাকি

ড্রাইভারটা কাজ চালাবে। মানে তোর দাদা বলে, গাড়ি খারাপ হয়ে কারখানায় যেতে পারে মেরামতের জন্যে, ড্রাইভার ছুটি নিতে পারে দেশে যাবার জন্যে, ড্রাইভারের অসুখও করতে পারে, কিন্তু কাজ তো তা বলে বন্ধ থাকলে চলবে না। এই ধর না পৃথিবীতে রোজ কত লোক মরছে, তা বলে কি পৃথিবী থেমে থাকছে? পৃথিবী তার নিজের নিয়মেই চলছে। তোর দাদা বলেন, তেমনি তাঁর সংসার চলুক আর না চলুক, তাঁর ড্রাইভার ছুটিই নিক্ আর গাড়ি কারখানাতেই যাক, তাঁকে চালিয়ে যেতেই হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তা যতীনদার না-হয় অনেক কাজ, অনেক জায়গায় তাকে যেতে হয়, তার মেডিকেল কলেজ আছে, চেম্বার আছে। তার কাজের মানে বুঝি। কিন্তু তুমি? তোমার দিন-রাতের ড্রাইভারের কীসের দরকার। তোমার তো আর তেমন জরুরী কোনও কাজ নেই।

রাঙা-বৌদি বলে উঠলো—বলিস কী তোরা? আমার জরুরী কোনও কাজ নেই? টাকা উপায় করাটাই বুঝি কাজ আর সংসারে যে টাকা উপায় করে না, সে বুঝি কাজ করে না? তোর দাদা যখন দশবারো দিনের জন্যে বাইরে চলে যায়, তখন কি আমি বাড়িতে বসে থাকি নাকি? আমিও তো বেরিয়ে পড়ি—

—তুমিও বেরিয়ে পড়ো? কোথায়?

—এই যেখানে আমার খুশি! ইচ্ছে হলো তো গাড়ি নিয়ে রাঁচি চলে গেলুম।

—রাঁচি?

—হ্যাঁ, নয় রাঁচি, নয় হাজারিবাগ, নয় বেনারস। বেনারসের গঙ্গায় নৌকো ভাড়া করে হাওয়া খেতে লাগলুম।

—কীসে যাও? প্লেনে, না ট্রেনে?

রাঙা-বৌদি বললে—দূর, আমার গাড়ি রয়েছে, আমি গাড়িতে চড়ে চলে যাই। আর আমার রাজবাহাদুর যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আমার ভাবনা কী? রাজবাহাদুরকে তাহ'লে অত টাকা মাইনে দিই কেন? সাড়ে পাঁচশো টাকা তো শুধু ওর মাইনে, তাছাড়া আরো কত টাকা ওকে দিই, তার কি হিসেব আছে? যখন ওর যা দরকার হয়, তাই-ই তো দেওয়া হয়। আর রাজবাহাদুরও তেমনি ড্রাইভার আমার, ও একেবারে প্রাণ দিয়ে করে আমার জন্যে।

যখন জোড়াসাঁকোয় আসতো রাঙা-বৌদি, আমি খবর পেয়েই দৌড়ে যেতুম। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারতো না রাঙা-বৌদি। মাসীমার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলেই চলে যেত।

বলতো—যাই, এখন আবার অনেক কাজ আমার—

কাজ ? রাঙা-বৌদির কাজের কথা শুনে আমার হাসি পেত। বলতাম—বা রে, তোমার আবার কাজ কী। তোমার কাজই নেই।

—কী বলিস ? কাজ নেই ? এখনি বাড়ি ফেরার পথে নিউ মার্কেটে একবার যেতে হবে।

—নিউ মার্কেট ? কেন ? তুমি আবার সেখানে বাজার করবে নাকি ?

রাঙা-বৌদি বলতো—তা বাজার করতে হবে না ? বাজার না করলে সংসার চলে ? বাড়ির দরজা জানালার পর্দাগুলো ছ'মাস হয়ে গেল বদলানো হয়নি। সেই এক ডিজাইনের পর্দা ছ'মাস ধরে ঝুলছে। লোকে বলবে কী বল্ দিকিনি ? বলবে, এদের পয়সা নেই, নতুন পর্দা কিনতে পারে না। আমাদের পাড়ার সবাই তিনমাস অন্তর-অন্তর পর্দা, ফার্ণিচার সমস্ত কিছু বদলায়। আমাদেরই কেবল বদলানো হয়নি। এখন নিউ মার্কেটে গিয়ে সেই পর্দাগুলো ডেলিভারী নেব, তারপর লাঞ্চ খেয়ে নিয়েই আবার সিনেমায় যেতে হবে, একটা ভালো ছবি এসেছে এলিটে।

* * *

রাঙা-বৌদির কথাগুলো শুনতাম আর অবাক হয়ে যেতাম। ভাবতাম, সত্যিই রাঙা-বৌদি কি সুখেই আছে। আমার নিজের বাড়ির বৌদিদের তো দেখেছি। আমার বৌদিরা সংসারের জন্যে খেটে-খেটে হাড়-মাংস কালি হয়ে যেত। আমার মা'কে বৌদিদের দিন-রাত বকা-ঝকা করতে দেখেছি, আর বৌদিরা মুখ বুঁজে তা সহ্য করতো। সেই যে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রান্নাঘরের ঝিক্কি দিতে আরম্ভ করতো, তা চুকতে দুপুর একটা-দু'টো বেজে যেত। তারপর যদিই বা আধ ঘণ্টার জন্যে একটু বিশ্রাম মিলতো তারপর থেকেই আবার সংসারে চাকা বন্-বন্ করে ঘুরতে আরম্ভ করতো। তখন ইস্কুল থেকে ফিরতো ভাইপো, ভাইঝিরা। তাদের জল-খাবারের বন্দোবস্ত করা, জামা-ফ্রক বদলে খাইয়ে-দাইয়ে চাকরের সঙ্গে পার্কে বেড়াতে পাঠানো, আবার সেই যে শুরু হতো রাত্তিরের একগাদা লোকের পিণ্ডি তৈরী করা, সে এক এলাহি কারখানা ! কেউ তরকারিতে ঝাল না দিলে তার মুখে খাবার রুচবে না, কেউ বা তরকারিতে ঝাল থাকলে ভাতের থালা লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কেউ খাবে সেদ্ধ রান্না। আবার কারো মচ্‌মচে করে ভাজা না হলে গলা দিয়ে ভাতই নামবে না। তার ওপর বাড়ির কর্তা যিনি, তাঁর জন্যে সমস্ত কিছু আলাদা। তাঁর সেদ্ধ চালের ভাত চাই, আতপ চাল তাঁর পেটে সহ্য হবে না। মেজোবৌদির বাচ্চা ছেলেটা জন্মে থেকেই পেট রোগা। ডাক্তার বলে দিয়েছে তাকে শুধু পাঁউরুটি টোস্ট আর হলুদ-গোলা মাছের ঝোল, আর কিছু তার চলবে না। আর কিছু খেলেই তার বমি হয়ে যাবে।

আর সকলের ওপরে আছে, বাড়ির ছেলে-মেয়েদের ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে পৌঁছিয়ে দেওয়া আর সেখান থেকে তাদের বাড়ি নিয়ে আসা।

এসব কাজও তো বৌদিদের। বৌদিরা না হলে এসব কাজ করবে কে? আমরা বাড়ির ছেলেরা তো আর এসব বাজে কাজ ঘাড়ে নেব না। আমাদের নিজেদের আড্ডা দেওয়া আছে রাস্তার মোড়ে কিংবা ফুটপাতের ওপর, অথবা কারোর বাড়ির সামনের রোয়াকের ওপর বসে-বসে জটলা করার ডিউটি আছে।

অথচ রাঙা বৌদির জীবনটা ছিল ঠিক তার উল্টো।

মা বলতো—যতীনের বউ-এর কথা ছেড়ে দে। যতীনের কত টাকা, অত টাকা কে খাবে তারই ঠিক নেই, তো তার বউ-এর সঙ্গে আমাদের তুলনা? আমাদের খাটবার কপাল, আমরা কেবল খাটতেই জন্মেছি আর এই রকম খাটতে-খাটতেই একদিন মরে যাবো।

আমি যখন বৌদিদের কাছে রাঙা বৌদির গল্প বলতাম, তখন বৌদিরা হাঁ করে সব শুনতো। মনে-মনে রাঙা বৌদির ঐশ্বর্য আর সুখের গল্প শুনে হা-হুতাশ করতো। মুখে শুধু বলতো—সত্যি, বউটা আর জন্মে অনেক পুণ্য করেছিল ঠাকুরপো।

সেজবৌদি বলতো—তা যতই সুখ হোক দিদি, ও দেখবে ওই রকম শুয়ে বসে ঠিক একদিন হাতীর মত মোটা হয়ে যাবে—অত সুখ কি ভালো দিদি?

বুঝতাম বৌদিরা ভেতরে-ভেতরে রাঙা বৌদিকে হিংসে করতো। অথচ প্রায় একই বয়েসের বউ, একজন একেবারে স্বর্গের ঐশ্বর্য ভোগ করবে, আর একজন সংসারের জাঁতা-কলে পিষে শুকিয়ে মরবে, এটা তাদের মনঃপুত হতো না। মনঃপুত হতো না বলেই ও-বাড়িতে রাঙা বৌদি এলেই আমার বৌদিরা জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে তাঁকে দেখবার চেষ্টা করতো। তখন আমাদের বাড়ির মেয়ে মহলে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত রাঙা বৌদিকে দেখবার জন্যে। সেই বিরাট এয়ারকণ্ডিশন করা বিলিতি গাড়ি, আর সেই ড্রাইভার, ড্রাইভারের রঙ-চঙা পোষাক পরা জাঁদরেল চেহারা। আর রাঙা-বৌদি গাড়ি থেকে নামবার আগেই ড্রাইভার নিজের বসবার জায়গা ছেড়ে উঠে বাইরে এসে রাঙা বৌদির পাশের দরজাটা সসম্ভ্রমে খুলে দাঁড়িয়ে থাকা সেও এক দর্শনীয় ব্যাপার—

বৌদিদের সঙ্গে আমার মা ও জানলায় এসে দাঁড়াতো।

বলতো—বাঃ গাড়িটা তো বেশ। খুব দামী গাড়ি। নিশ্চয় অনেক টাকা দাম হবে। যতীনের টাকার তো অভাব নেই অথচ তার ভোগ করবার সময়ও নেই। তার বউই সব ভোগ করছে—

হ্যাঁ, সত্যিই, ভোগ বলে ভোগ। রাঙা বৌদির মত যেমন এমন ঐশ্বর্যও

কারো থাকে না, তেমনি রাঙা বৌদির মত এমন ভোগও কারোর জীবনে সাধারণতঃ ঘটে না।

* * *

এসব ঘটনা এতদিন পরে মনে পড়ার কারণ হলো এই অবনী। অবনী সরকার। অবনীর বাড়িতে ক'দিন থেকে আর তার ডাক্তারীর পশার দেখে আমার কেবল সেই জোড়াসাঁকোর পাড়ার যতীনদার কথাই মনে পড়তো।

অবশ্য যতীনদার সঙ্গে অবনীর তুলনা করা চলে না।

যতীনদা হয়েছিল কলকাতার ডাক্তার জে, এন, দাশ। আর অবনী হয়েছে সামান্য মধুবাণীর মত বিহারের ছোট একটা গ্রামের ডাক্তার সরকার। যতীনদা জন্মেছিল বড়লোকের ছেলে হয়েই। ডাক্তার মেসোমশাই নিজেই নামজাদা ছিলেন বলে তাঁর ছেলের পশারের প্রসারে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। অবশ্য ডাক্তার মেসোমশাই যে শেষ পর্যন্ত ছেলের এই খ্যাতি প্রতিপত্তি, ছেলের সেই থিয়েটার রোডের বাড়ির ঐশ্বর্য, তার নার্সিংহোমের সমারোহ, তার পুত্রবধূর ব্যয় বহুল দেখে যেতে পারে নি, সে তাঁর দুর্ভাগ্য। কিন্তু সে দেখা ক'জন বাপই বা দেখতে পায়? দেখতে গেলে পূর্ব জন্মের বহু পুণ্যফল থাকা চাই।

কিন্তু অবনী? অবনী ছিল অতি সাধারণ একজন অল্পবিত্ত, কিন্তু সৎ সরকারী কর্মচারীর ছেলে। অবনীর বাবা যদি দেখতে পেতেন যে তাঁর ছেলে তাঁরই মত কোনও সরকারী অফিসের হেড ক্লার্ক বা সুপারভাইজার হয়েছে, তাহ'লেই ধন্য হয়ে যেতেন। কিন্তু অবনীর বাবার কাছে তাঁর ছেলের এই অর্থ উপার্জন ছিল এক স্বপ্নের ব্যাপার কিম্বা স্বপ্নেরও অতীত।

তা অবনীর ব্যাপার দেখে আমার কিন্তু ভয় করতে লাগলো।

অবনী আমার সঙ্গে কথা বলবার সময়টুকু পর্যন্ত পেত না। কিম্বা হয়তো আমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে তার সময়ের অভাবের হেতুটা নীরবে প্রচার করতে চাইতো। অবনী চাইতো যে আমি যেন দেখি তার সময়ের কত দাম। দেখি যে লোকে কেমন তাকে দিয়ে চিকিৎসা করবার জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আরো দেখি যে সে কত টাকার মালিক। এবং দেখে গিয়ে, কলকাতায় আমাদের বন্ধুমহলের মধ্যে তা প্রচার করি।

অবশ্য অবনীর ঐশ্বর্য হওয়াতে আমি যে অখুশী হয়েছিলাম, তা নয়। আর আমি অখুশী হতে যাবোই বা কেন? মানুষ কারো উন্নতিতে যদি অখুশী হয় তো বুঝতে হবে তার পেছনে তার ঈর্ষার কারণ বিদ্যমান। ঈর্ষাই অপরের উন্নতিতে মানুষকে অখুশী করে। আমার তা হবার কথা নয়। কারণ, এত দীর্ঘ জীবনে ঐশ্বর্যও যেমন দেখেছি অঢেল, তেমনি আবার দৈন্যও দেখেছি অপরিসীম। গর্বোদ্ধত মানুষের আকস্মিক পতনও যেমন দেখেছি এবং তা

দেখে যেমন আমার সত্য উপলব্ধি হয়েছে, তেমনি অপরিসীম দৈন্যের মধ্যে মনুষ্যত্বের মহত্ব দেখে তেমনি আমার শ্রদ্ধারও আবার সীমা থাকে নি।

কিন্তু এসব বড়-বড় দার্শনিক তত্ত্ব কথা থাক। আমি গল্প-উপন্যাস লেখক। এক কথায় আমি সামান্য মানুষ। আমার মুখে এসব কথা শোভা পায় না। তবে যেটা রসের কথা সেটা বলবার আমার অধিকারের বাইরে।

মনে আছে, জোড়াসাঁকোর সেই যৌবনের দিনগুলো অতিক্রম করবার সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে কলকাতা ছাড়তে হলো চিরকালের মত। তার প্রধান কারণ জীবিকা। জীবিকা এমনই এক জিনিস যা মানুষকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অমানুষ করে তোলে। আমিও একদিন সেই জীবিকার প্রয়োজনে চিরকালের বাসস্থানকে ত্যাগ করে স্থানান্তরে চলে যেতে বাধ্য হলাম।

কিন্তু যাবার আগে যা দেখে গেলাম, তা আমার মনে চিরকালের মত দাগ কেটে রেখে দিয়ে গেল। যে রাঙাবৌদিকে একদিন অত ভালবেসেছি, যে রাঙাবৌদির জীবন যাপনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে মানিয়ে নিতে না পারলেও মনে-মনে রাঙাবৌদির উন্নতিতে আনন্দ উপভোগ করেছি, যাবার আগে তার সঙ্গে শেষ দেখা করতে পারলাম না বলে মনে বড়ই আফসোস থেকে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম—কেন এমন হয়? কেন এমন হলো?

কলকাতা ছেড়ে আসবার শেষের দিকে দেখেছিলাম রাঙাবৌদি আর আগের মত জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মাসীমাকে দেখতে আসতো না।

যতীনদার কথা আলাদা। যতীনদা সময় কোথা পাবে যে মা'কে, ছোট ভাই বা বাড়ির অন্যান্য নিকট আত্মীয় স্বজনদের দেখতে আসবে? আত্মীয় স্বজন বা মা, মাসি, কাকীমা তো লক্ষ্মী নয়। যতীনদা ছিল লক্ষ্মীর ভক্ত। সারা জীবন সেই লক্ষ্মীরই ভজনা করে গেছে যতীনদা। যতীনদার কাছে তার রোগীরাই ছিল লক্ষ্মী।

কিন্তু রাঙাবৌদি তো তা নয়। রাঙাবৌদির সময়াভাবের কোনও নায্য-অজুহাত ছিল না। তার ওই গাড়ি নিয়ে নিউমার্কেটে যাওয়া বা রাঁচী-হাজারীবাগ-কাশ্মীর বেড়ানো ওটা একটা ছলনা। লোকে যেমন পরের সঙ্গে ছলনা করে, তেমনি রাঙাবৌদি ছলনা করতো নিজেকে। অথচ এইসব নিয়ে ব্যস্ত থাকার মধ্যে দিয়ে যে রাঙাবৌদি নিজেকেই ছলনা করতো, সে-বোধটুকু পর্যন্ত তার চলে গিয়েছিল।

এ-সব কথা তখন বুঝি না। তখন যদি বুঝতাম, তা'হলে হয়তো রাঙা-বৌদিকে সময়মত সাবধান করে দিতে পারতাম।

রাস্তায় চলতে-চলতে অনেকদিন দেখেছি পাশ দিয়ে হুস্ করে রাঙাবৌদির গাড়িটা বেরিয়ে গেল। সেই সামনে ইউনিফর্ম পরা মাথায় টুপি রাজবাহাদুর রাজার মত গাড়িটা চালাচ্ছে, আর পেছনের প্রশস্ত গদিওয়ালা সিটের ওপর

গাড়িটা রাঙা করে হেলান দিয়ে রাঙাবৌদি বসে আছে। মনে হতো ও আমাদের রাঙাবৌদি নয়, যেন রাণী। রাণীর মতই রাস্তাটা রাঙা করতে-করতে চলছে।

আরও এ কি একবার? সিনেমায় গিয়েছি, সেখানেও তাই। ভিড়ের মধ্যে রাঙাবৌদিকে ধরতে গিয়েও ধরতে পারি নি। ধরবার আগেই ভীড়ের মধ্যে থেকে রাজাবাহাদুর কেমন কায়দা করে রাস্তা করে নিয়ে বাইরে দাঁড়ান গাড়িতে তুলে উধাও হয়ে গিয়েছে।

অনেকে অনেক অনুরোধ করেছে আমাকে। বলেছে—তোর সঙ্গে তো ডাক্তার দাশের স্ত্রীর আলাপ আছে, তাকে বলে আমাকে একবার ডাক্তার দাশকে দিয়ে দেখিয়ে দে না—

আমি বলতাম—না ভাই, সে আমি পারবো না—

ডাক্তার দাশকে দিয়ে লোক নিয়মমাফিক টাকা দিয়ে নিজের চিকিৎসা করবে, তার জন্যেও ধরাধরি করতে হয়। কাকে ধরলে ডাক্তার দাশ একটু তাড়াতাড়ি সময় দিয়ে দেখবেন, সেই ছিল রোগী মহলের সমস্যা। সোজাসুজি গেলে দু'তিন মাসের আগে এ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যেত না। প্রথমে গিয়ে ডাক্তার দাশের সহকারীর খাতায় নামটা রেজিস্ট্রি করে আসতে হবে। সহকারী যে তারিখ দেবে, সেই তারিখেই যেতে হবে। তার আগে গেলেও চলবে না, তার পরেও না। অথচ যার রোগ দেখানো খুবই জরুরী, সে কী করে দু'তিন মাস অপেক্ষা করে থাকবে?

তাই যখনই কেউ শুনেছে যে ডাক্তার দাশের স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ আছে, তখনই আমাকে এসে ধরেছে।

আমি তার জবাবে বলেছি—ভাই এককালে আমার আলাপ ছিল অবশ্য, এককালে ডাক্তার দাশের স্ত্রীর সঙ্গে বসে-বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লুডো খেলেছি, কিন্তু এখন তো আর সে-রকম-যোগাযোগ নেই, এখন রাঙা-বৌদি অনেক বড়লোক হয়ে গেছে, এখন অন্য পাড়ায় চলে গেছে। এখন কি আর রাঙা-বৌদি সে সব দিনের কথা মনে রেখে দিয়েছে?

এই ধরনের যুক্তি দিয়েই সকলের সব অনুরোধ-উপরোধ এড়িয়ে গিয়েছি। আর যুক্তিটা যে পুরোপুরি মিথ্যে তাও বলবো না। কারণ আমাদেরও বয়েস বেড়েছে, কলেজ-জীবন অতিক্রম করে আমরাও তখন জীবিকা আহরণের দুর্গম পথে নেমেছি। তখন লুডো খেলার মধ্যে আগেকার সেই আনন্দ পাবার কোনও অবকাশ আমাদের মধ্যে আর নেই। আর সঙ্গে-সঙ্গে রাঙা-বৌদিও তখন আর সেই আগেকার রাঙা-বৌদি নেই। রাঙা-বৌদিরও তখন সেই লুডো খেলার মধ্যে সহজ আনন্দ পাবার প্রবণতা নিশ্চয় ফুরিয়ে গিয়েছে। নইলে তো রাঙা-বৌদি নিজেও আমাদের ডেকে পাঠাতো। অন্তত নিজে না

আসুক রাজাবাহাদুরকে বলে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েও কাবলু আর আমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেত। অত যার সময়, যার সময় আজে-বাজে কাজ করেও ফুরোত না, তার যদি সত্যিই আমাদের কথা মনে থাকতো, তাহ'লে আস্তে-আস্তে আমাদের কাছ থেকে এত দূরে চলে যেত না।

তা এসব তো অতীতের ব্যাপার। অবনী সরকারের কাছে যে দু'-একদিন ছিলাম তার মধ্যে বেশিক্ষণ কথা বলবার সময় পেতাম না অবনীর সঙ্গে। তবু তারই মধ্যে একদিন অবনীকে একলা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—হ্যাঁ রে, ডাক্তার দাশকে তোর মনে পড়ে ?

অবনী ঠিক চিনতে পারলে না।

জিজ্ঞেস করলে—কোন ডাক্তার দাশ ? জে. এন. দাশ ?

বললাম—হ্যাঁ।

অবনী বললে—ওরে বাবা, তাকে চিনবো না ? তিনি তো বিখ্যাত ডাক্তার। কেন, হঠাৎ তার কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন ?

বললাম—ডাক্তার দাশ ছিল আমার দাদার বন্ধু। তাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ির পাশেই আমরা এককালে থাকতুম। ডাক্তার দাশের আরম্ভও আমরা দেখেছিলাম, তারপর তিনি যখন থিয়েটার রোডে প্রথম বাড়ি করেন তখনও জানাশোনা ছিল। শেষকালে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে দু'-তিন মাস আগে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হতো।

অবনী বললে—এখন তার প্র্যাকটিস শুনেছি আরো বেড়েছে—তাঁর সঙ্গে কি আর আমাদের তুলনা। আমি যদি এই মধুবাণীতে প্র্যাকটিশ না করে কলকাতায় প্র্যাকটিশ করতে বসতুম তো এখন আমাকে উপোস করতে হতো। কলকাতায় প্র্যাকটিশ জমানো বড় কঠিন কাজ। এ মধুবাণীর মত জায়গা বলেই আমার গাড়ি-বাড়ি সব কিছু হয়েছে। তা তাঁর কথা তোর হঠাৎ মনে পড়লো যে ?

বললাম—মনে পড়লো তোকে দেখে।

—কেন ? আমি কি তাঁর মতন ?

বললাম—না, ডাক্তার দাশকে আমি যতীনদা বলে ডাকতুম। সেই যতীনদার যখন প্র্যাকটিশ ভীষণ জমে উঠলো, তখন তার স্ত্রীর অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।

—কেন ?

বললাম—যতীনদার স্ত্রীকে আমি রাঙা-বৌদি বলে ডাকতুম। ছোটবেলায় আমি রাঙা-বৌদির সঙ্গে বসে-বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লুডো খেলেছি। অথচ যখন সেই রাঙা-বৌদি আবার থিয়েটার রোডের নতুন বাড়িতে চলে গেল, যখন তার অনেক টাকা হলো, অনেক চাকর-ঝি-বাবুর্চি-খানসামা হলো, যখন

ার সময় কাটাবার মত কোনও কাজই হাতে রইলো না, তখন কিন্তু আর
:ডা খেলবার সময় হতো না রাঙা-বৌদির।

অবনী জিজ্ঞেস করলে—তাহ'লে কী করে সময় কাটতো তার?

বললাম—কী আর করবে, রোজ সিনেমায় যেত প্রথম-প্রথম। তারপর
াও একঘেঁয়ে লেগে গেল। শেষকালে নিউমার্কেট ঘুরে-ঘুরে কেবল
াজেবাজে জিনিস কিনে কিনে টাকা ওড়াতে লাগলো। আর তারপর তাও
খন একঘেঁয়ে লেগে গেল তখন আজ রাঁচী, কাল হাজারীবাগ, পরশু বোম্বাই,
ারপর দিন কাশী এই করতে লাগলো কেবল। বাঁধা ড্রাইভার ছিল, বাঁধা
নজস্ব গাড়িও ছিল, পেট্রল কেনবার টাকার অভাবও ছিল না। এছাড়া
ার কী-ই বা করবে বল? অভাব না থাকাটাও তো একটা অভাব। সেই
াভাব না থাকাটাই ছিল রাঙা-বৌদির জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

—কেন? ছেলে-মেয়ে? ছেলে-মেয়ে কিছু হয়নি?

বললাম না।

অবনী বললে—তাহ'লে তো সময় কাটবেই না।

আমি বললাম—তুই একটু প্র্যাকটিস্ কমিয়ে দে, একটু বাড়ির দিকে
নটা দে।

অবনী বললে—তাও যে অসম্ভব।

—কেন? অসম্ভব কেন?

অবনী বললে—তুই তো নিজের চোখেই দেখছিস ভোর থেকে কী ভীড়
য় আমার বাড়ীতে। এক-একদিন তো ওপরে এসে খাওয়ার সময়ও পাই
া। তারপর কোনও কোনও দিন গিন্নীকে খবর পাঠিয়ে দিতে হয়, আমার
জন্যে যেন আর ওয়েট্ না করে খেয়ে নেয়, আমার খেতে দেরি হবে।

—তোর স্ত্রী খেয়ে নেয়?

অবনী বললে—প্রথম-প্রথম যখন নতুন এসেছিল তখন খেত না। বেলা
তিনটে-চারটে পর্যন্ত আমার আশায় উপোস করে বসে থাকতো। ভাবতো,
আমি গেলে একসঙ্গে খাবে, কিন্তু শেষকালে এখন আর অপেক্ষা করে না।
ঠাকুর-চাকর-ঝি সবাই আমার ভাত ঢাকা দিয়ে খেয়ে-দেয়ে নেয়।

বললাম—যতীনদার বেলাতেও ঠিক এই রকম হয়েছিল। রাঙা-বৌদিও
প্রথম-প্রথম যতীনদার জন্যে ভাত বেড়ে বসে থাকতো, শেষকালে যতীনদাই
একদিন বলে তার জন্যে কারো উপোস করে বসে থাকবার দরকার নেই।

অবনী বললে—আমাদের প্রফেশনই এই রকম। এ প্রফেশনে কোনও
ছুটি-ছাটা নেই, কোনও বিশ্রাম-টিশ্রাম নেই, কেবল রোগী দেখা আর টাকা
উপায় করা ছাড়া আমরা আর সব কিছু ভুলে গেছি।

কথার মাঝখানেই আবার কে এসে ডাকলে। ডাকতেই অবনী আবার

তার চেম্বারে চলে গেল। তখনও চেম্বারে অন্ততঃ পঞ্চাশজন হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। সাধারণতঃ রোগী ফেলে পালিয়ে গেলে অবনীর মুক্তি হয় না সব রোগীকেই যদি মন দিয়ে দেখতে হয় তা'হলে তার খাওয়া-দাওয়া দূরের কথা, বোধহয় রাত কাবার হয়ে যাবে।

সেদিন হঠাৎ অবনী বললে—জনকপুরে যাবি ?

—জনকপুর ?

অবনী বললে—হ্যাঁ, সেখানে একটা রোগী দেখতে যাচ্ছি। সেখানকার মোটর ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের মালিক মিস্টার শর্মা। তিনিই কল দিয়েছেন।

—কেন ? কি হয়েছে ?

—হবে আবার কি ? বড়লোক মানুষ। সামান্য কিছু হলেই ডাক্তার সরকারকে ডেকে পাঠায়। আমাকে মোটা ভিজিটও দেয়। আর আমিও চেম্বার থেকে খানিকটা ছুটি পাই। এখানে একলা বসে-বসে তুই কী করবি ? তার চেয়ে চল না আমার সঙ্গে, বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। তোরও তো একটা নতুন জায়গা দেখা হবে।

আমি বললাম—জনকপুর কত দূরে ?

—এখান থেকে কুড়ি মাইল দূরে। প্রচুর জমি-জমা, বাগান-ক্ষেত-খামার করেছে মিস্টার শর্মা। তার ওপর আছে মোটর ট্রান্সপোর্টের বিজনেস। অনেক লোক খাটে তাতে। মিস্টার শর্মা আর মিসেস শর্মা দু'জনে মিলে বিজনেস দেখে, খুব হ্যাপি ফ্যামিলি।

যে-ক'দিন অবনীর বাড়িতে ছিলাম, সে ক'দিন আমার খুব নিঃসঙ্গ লাগতো। অবনীর স্ত্রীর অনেক কাজ থাকতো। স্বামী আর স্ত্রীর দু'জনের সংসার হলেও বাড়তি লোকের অভাব ছিল না বাড়িতে। তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া, তাদের সকলের খাওয়া-দাওয়া ব্যবস্থার তদারক করাও ছিল একটা মস্ত কাজ। অবনী আমার নিঃসঙ্গতার কথাটা বুঝতো।

বলতো—তুই এলি, তোর সঙ্গে যে একটু মন খুলে গল্প করবো, তারও সময় পাচ্ছি না। আর ঠিক এই সময়েই কিনা আমার কাজের ভীড়টা বাড়লো। দেখছিস, কী অসম্ভব রোগীর ভীড় আজকাল।

কিন্তু এছাড়া তো অবনীর কোনও উপায়ও ছিল না। আগে তো তার রোগী ; তার পরে আমি ! আমার জন্যে তো সে আর রোগীদের অবহেলা করতে পারে না।

অবনীর বউ বলতো—তা তুমি ওকে নিয়ে ঘুরলেই তো পারো। তুমি তো কত জায়গাতেই যাচ্ছো, সঙ্গে উনি থাকলে তোমারও গল্প করা হবে উনিও এ দেশটা দেখতে পারবেন।

তা অবনী তাই-ই করতো। মাঝে-মাঝে অবনী আমাকে সঙ্গে নিয়ে

বেরোত। কোনও দিন দশ মাইল, কোনও দিন কুড়ি মাইল রাস্তা পেরিয়ে কোনও অঁজ গ্রামের মধ্যে গিয়ে পৌঁছোতাম। এক-একদিন যে-সব দৃশ্য দেখেছি, তাতে মনে বড় কষ্ট হতো। ডাক্তার গেছে রোগীর বাড়িতে, রোগীর অভিভাবকরা বাড়ির গরু বেচে ডাক্তারের ভিজিটে টাকা জোগাড় করছে। অবনী তো বাড়ির ভেতরে থাকতো, সে সে-সব দেখতে পেত না। কিন্তু আমি তার গাড়ির ভেতরে বসে-বসে সব শুনতে পেতাম, সব দেখতে পেতাম।

ফেরবার পথে যখন অবনীকে ঘটনাটা বলতাম, তখন সে শুনে হাসতো! বলতো—তাই নাকি?

তারপর বলতো—জানিস, এই বিহারে ডাক্তারী করতে এসে এ-সব অনেক দেখেছি। আগে আমারও খারাপ লাগতো, গরু-ছাগল বেচা টাকা নিয়ে নিজের পকেটে পুরতে নিজের মনে কষ্টও হতো। কিন্তু মনেরও বোধহয় এমন একটা স্টেজ আছে, যে-স্টেজে পৌঁছোলে মনেরও কাজ করবার ক্ষমতা চলে যায়। যখন বেশ বুঝতে পারছি যে আমি অন্যায় করছি, অত্যাচার করছি, তখনও একটা মন-গড়া যুক্তি খাড়া করে নিজের সমস্ত অন্যায়, সমস্ত অত্যাচারও বেশ সমর্থন করি। তোর যতীনদা ডাক্তার জে-এন-দাশেরও বোধহয় তাই হয়েছিল। ডাক্তার দাশ খুব ভালো করেই বুঝতে পারতো যে স্ত্রীকে অবহেলা করা হচ্ছে, স্ত্রীর ওপর অন্যায় করা হচ্ছে, কিন্তু তা বুঝলেও নিজের অন্যায়টাকে সমর্থন করবার জন্যে অন্য একটা যুক্তি খুঁজে আবিষ্কার করে বোধহয় নিজের মনেই একটা সান্ত্বনা পেত! এই-ই হয়। সব লোকেরই এমনি হয়। গরু-বেচা টাকাটা এখন আমার পকেটে রয়েছে, তবু টাকাটা ওদের ফিরিয়ে দেবার প্রবৃত্তি আমার হচ্ছে না। হবেও না। কারণ আমি এই ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছি যে আমি ওদের যে উপকার করেছি, তার দাম ওই গরু-ছাগলের দামের বেশি। পৃথিবীর তাবৎ মানুষই এই রকম একটা মিথ্যে যুক্তি খাড়া করে নিজের পাপকে ঢাকতে চেষ্টা করে। আমি জানি আমি তার ব্যতিক্রম নই, আমিও সেই একই পাপ করছি।

যাক্, অবনী যে পাপ করছে আর সেটা যে সে বুঝতে পারছে, সেটা সে যে মুখে বলছে, সেইটেই যথেষ্ট।

কিন্তু যতীনদা? যতীনদাও কি তা বুঝতো?

যতীনদাকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে গিয়েও তো নিশ্চয়ই কত লোক নিজেদের সর্বস্ব বেচে দিয়েছে। গরু-ছাগল তো সামান্য জিনিস, হয়েতো নিজেদের বসত-বাড়িটাকেও বাঁধা রেখে দিয়ে যতীনদার মোটা ভিজিটের টাকা জুগিয়েছে। তার বিনিময়ে সে টাকা কে ভোগ করছে? যতীনদা? না রাঙা-বৌদি?

আর পাপ? রোগীদের সর্বস্ব বেচা টাকা নেওয়ার পাপ? সে পাপেরও

তো একটা ফল আছে। সেই পাপের ফলই বা কে ভোগ করছে? যতীনদা? না রাঙা বৌদি?

অবনীর কথাগুলো সত্যিই আমায় আবার নতুন করে ভাবিয়ে তুললো। অবনী জানে যে সে পাপকে ঢাকবার জন্য নানা যুক্তির অবতারণা করে সামাজিক ভদ্রতার আদর্শ রক্ষা করে। অবনী নিজেই স্বীকার করছে যে সেও পাপী। কিন্তু যদি সে জানেই যে সে পাপ করছে, তাহ'লে কেন রোজ-রোজ সে একই পাপের পুনরাবৃত্তি করে চলেছে?

করে চলেছে এই জন্যে যে আপাতদৃষ্টিতে সেই পাপের জন্যে তাকে কোনও লোকসান স্বীকার কোথাও করতে হচ্ছে না।

আর শুধু যতীনদা বা অবনীই নয়, ভেবে দেখলে বোঝা যায়, আমরা এই পৃথিবীর যত মানুষ, সবাই এক একই পাপ করে চলেছি। পৃথিবীর মানুষ কেউ গরু বেচা টাকা দিয়ে, কেউ বা বাড়ি-সম্পত্তি বেচা টাকা দিয়ে আমাদের প্রতিদিনকার আরামের আর সুখ-সমৃদ্ধির খোরাক জুগিয়ে চলেছে। অথচ তার জন্যে আমাদের কোনও বিকার নেই, কোনও অনুতাপ-বোধও নেই। আমরা আমাদের চরিত্রকে এমন করে গড়ে তুলেছি যাতে আমরা নিজেদের ভদ্রসমাজের উপযুক্ত বলে পরিগণিত হতে পারি, তার বেশি কিছু নয়। আর সেই তথাকথিত ভদ্রসমাজভুক্ত হতে পারলেই আমরা আমাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক হলো বলে মনে করি।

* * *

হঠাৎ গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি দিতেই আমার চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়লো। অবনী বললে—এইবার এসে গেছি, আয়!

দেখি গাড়িটা একটা বাড়ির বার-উঠোনে এসে থেমেছে। এই সেই জনকপুর। মিস্টার শর্মা এখানকার বাসিন্দা। অবনীর বাঁধা পেসেন্ট। শর্মা মোটর-ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের মালিক।

বেশ সাজানো-গোছানো বাড়ি। বাড়িটা বাংলো-প্যাটার্ণের। চারিদিকে বড়-বড় ফুলের গাছ। একদিকে ঘোড়ার আস্তাবল। আস্তাবলের ভেতরে দু'চারটে ঘোড়া তখন গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় দানা-পানি খাচ্ছে। একটা রবারের টায়ার লাগানো চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ি সামনের দিকে ঝুঁকে মাটিতে মাথা নুইয়ে প্রণামের ভঙ্গিতে রাখা। অবনীকে আসতে দেখেই যে ভদ্রলোক বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল, তাকে দেখে মনে হলো তিনিই মিস্টার শর্মা। বেশ মাঝ-বয়েসী ভদ্রলোক।

—আসুন ডাক্তারসাহেব, আসুন!

অবনী তার স্টেথিস্‌কোপটা হাতে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বললে —কী হলো মিস্টার শর্মা, আবার কী হলো আপনার? এত জরুরী কল্‌ কেন?

মিস্টার শর্মা বললে—আমার তবিয়ৎটা ভালো যাচ্ছে না ডাক্তার সাহেব, দু'দিন রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি।

অবনী বললে—তাহ'লে আবার ব্লাডপ্রেসারটা বাড়লো নাকি? কী খেয়েছিলেন?

মিস্টার শর্মা বললে—পরোটা আর মাংস, যা রোজ খাই।

অবনী বললে—কেন, পরোটা খান কেন? আর তা-ছাড়া মাংসটাও আপনাকে ছাড়তে হবে। আমি তো আপনাকে বলে দিয়েছি, শুধু চাপাটি আর সবজি খাবেন। আর মাংস যদি খেতেই হয়, তো সপ্তাহে একবার করে মুর্গী খাবেন, তা-ও স্টু করে। আমি তো মিসেস শর্মাকে সব বলে গেছি। কই, ডাকুন তো মিসেস শর্মাকে।

মিস্টার শর্মার মুখে-চোখে আতঙ্কের ছবি ফুটে উঠলো।

বললে—না-না, আমার বিবিকে বলবেন না, আমাকে বাড়িতে পরোটা-মাংস খেতে দেয় না, তাই এবার গয়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে গিয়ে খুব পেট ভরে ওই সব খেয়ে এসেছি।

অবনী ততক্ষণে ব্লাড-প্রেসারের যন্ত্রটা মিস্টার শর্মার হাতে লাগিয়ে রক্তের চাপের অঙ্কটা জেনে নিয়েছে।

মিস্টার শর্মা জিজ্ঞেস করলে—কত দেখলেন ডাক্তারবাবু?

অবনী বললে—সে আপনার জেনে কী হবে? আপনি তো আমার কথা শোনেন না।

মিস্টার শর্মা এবার কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। বললে—না-না, ডাক্তার সাহেব, এবার থেকে আমি আপনার কথা শুনবো, আপনি যা খেতে বলবেন তাই-ই খাবো। তবে মাঝে-মাঝে আমার যে লোভ হয়ে যায় ডাক্তারসাহেব, তাই একটু ওই সব খেয়ে ফেলি। আপনি যেন এসব খাওয়ার কথা মিসেস শর্মাকে বলে দেবেন না।

অবনী বোধহয় একটু শান্ত হলো। বললে—ঠিক আছে এবার বলবো না, কিন্তু আমি যা-যা খেতে বলেছি, আপনি কেবল তাই-ই খেয়ে যাবেন আর এই নতুন একটা ওষুধ লিখে দিলুম, এটা আনিয়ে নিয়ে ঠিকমত খাবেন।

মিস্টার শর্মা বললে—ঠিক আছে। আপনি আবার কবে আসবেন?

—সাতদিন পরে আমি আবার এসে দেখে যাবো। কিন্তু এখন আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন। আজকে এ-ঘর থেকে আর বেরোবেন না। দরজা-জানলা সব বন্ধ করে শুয়ে থাকুন।

মিস্টার শর্মা বললে—কিন্তু আমার যে অনেক জরুরী কাজ আছে ডাক্তারসাহেব, খুব জরুরী কাজ।

অবনী বললে—চুলোয় যাক্ আপনার জরুরী কাজ! আগে আপনার

স্বাস্থ্যখানা, না আপনার কাজ ? আর অত কাজ করে আপনার লাভ কী ? আপনার এত স্টাফ্ রয়েছে, তারা সব করবে ! তারপর মিসেস শর্মা রয়েছেন, তিনিই তো সব দেখেন আপনার ; আর তাছাড়া অত টাকা উপায় করে আপনার হবেটা কী ? আপনি তো অনেক টাকা কামিয়েছেন। এখন একটু রেস্ট্ নিন—বলে অবনী বাইরে বেরিয়ে এল। আমিও তার সঙ্গে বাইরে এলাম।

গাড়িটা উঠোনে দাঁড়িয়েছিল। আমিও সেইদিকে যাচ্ছিলাম।

অবনী বললে—আয়, এদিকে আয় একবার আমার সঙ্গে—একবার মিসেস শর্মার সঙ্গে দেখা করি, তাঁকে আড়ালে ডেকে সব কথা বলে যাই···

বলে আমাকে নিয়ে মিস্টার শর্মার বাড়ির উল্টোদিকে চলতে লাগলো। মিস্টার শর্মার বাড়ী থেকে কয়েক পা দূরে। সেখানে মিস্টার শর্মার মোটর সার্ভিসের অফিস। যেতে-যেতে অবনী বললে···শর্মার বউটা খুব কাজের মানুষ, জানিস। মিস্টার শর্মার বউটাই বলতে গেলে এই সব বিজ্নেসের ব্যাপারগুলো দেখে। খুব কাজের বউ পেয়েছে মিস্টার শর্মা।

মোটর ট্রানস্পোর্ট সার্ভিসের সামনে যেতেই দেখি একজন মহিলা অফিসের কাজকর্ম দেখাশুনা করছে। অবনীকে দেখেই মহিলাটি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। বললে—আপনি কখন এলেন ডাক্তার সরকার। আমি কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তাই একেবারেই জানতে পারিনি। উনি কেমন আছেন দেখলেন ?

অবনী বললে, সেই কথা বলতেই তো আপনার কাছে এসেছি মিসেস শর্মা, ওঁর প্রেসার খুব হাই হয়ে গেছে। ছ'শো চল্লিশের ওপর।

মিসেস শর্মা বললে, কেন ? আমি তো ওঁকে খুব লাইট্-ফুড খেতে দিই, মাখন খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি। পরোটা-মাংস ও খুব খেতে চাইতো, সে-সব কিছুই আমি খেতে দিই না। শুধু খিচুড়ি, চাপাটি আর সবজি খেতে দিই।

অবনী বললে, আপনি না খেতে দিলে কী হবে, উনি তো বাইরে গিয়ে সব খান। উনি তো নিজেই স্বীকার করলেন যে, গয়াতে গিয়ে উনি দেদার পরোটা-মাংস খেয়েছিলেন।

—তাই নাকি ? আমি এখনি গিয়ে ওকে বলছি।

অবনী বললে, না-না, আপনি কিছু বলবেন না। আমি ওঁকে কথা দিয়েছি, আপনাকে এ-সব কথা কিছুই বলবো না। আপনি যেন আবার বলে দেবেন না যে, আমি আপনাকে সব বলেছি। আপনাকে উনি ভীষণ ভয় করেন।

মিসেস শর্মা বললে, ভয় করে না ছাই করে। যদি ভয় করতো তো অত

মানিয়ম করতো? দেখুন ডাক্তার সরকার, ওকে নিয়ে আমি আর পারি না। এই বয়েসে এত খাওয়ার লোভ কি ভালো? সেইজন্তেই তো আমি ওকে কোথাও একলা বেরোতে দিই না। আমাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে হঠাৎ এক-একদিন বাইরে বেরিয়ে যায় আর পরোটা মাংস, মদ এই সব খেয়ে আসে।

—মদও খান নাকি?

মিসেস শর্মা বললে, আমার সামনে থাকলে খেতে পারে না, কিন্তু বাইরে পালিয়ে গিয়ে গিলে আসে। আর বাড়িতে এলেই আমি মুখে গন্ধ পাই—সেই জন্তেই তো রাজবাহাদুরকে আমি সব সময় চোখে-চোখে রাখি।

রাজবাহাদুর! আমি নামটা শুনেই চমকে উঠেছি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মিসেস শর্মার দিকে চেয়ে দেখলাম। তাহ'লে এ কি সেই আমাদের রাঙা বৌদি? আর মিস্টার শর্মা কি তাহ'লে সেই ড্রাইভার রাজবাহাদুর?

অবনীর সময় হয়ে এসেছিল। সে বলে উঠল, ঠিক আছে, আমি তা'হলে এখন চলি, আবার সাতদিন পরে আমি আসবো। একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে গিয়েছি ওঁর কাছে। আপনি ওষুধটা আনিয়ে ওঁকে নিয়ম করে খাওয়াবেন।

বলে অবনী গাড়িতে উঠে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলে। আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম। গাড়ি করে খানিক দূরে এসেছি, তখনও আমার মনের মধ্যে ভাবনার কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। সত্যিই কি এ আমার সেই রাঙা-বৌদি? আর মিস্টার শর্মাও কি সেই ড্রাইভার রাজবাহাদুর?

অবনী হঠাৎ বললে, জানিস, মিস্টার শর্মার বউ যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললুম, ও একজন বাঙালী মেয়ে। আগে মিস্টার শর্মা কলকাতায় ছিল, তখন ওই বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করে এখানে এসে বিজনেস্ করছে। এই যা-কিছু বিজনেস্ দেখলি, সব কিছু ওই বাঙালী মেয়েটার টাকায়। শুনেছি, বাঙালী মেয়েটার বাবার নাকি অনেক টাকা ছিল।

আমি আর থাকতে পারলুম না। বললাম, না ও-সমস্ত ওই মেয়েটার স্বামীর টাকা। মানে, আগেকার স্বামীর টাকা।

অবনী অবাক হয়ে গেল। বললে, তার মানে?

বললাম—তার মানে মিসেস শর্মার আগেকার স্বামীর অনেক টাকা ছিল।

অবনী জিজ্ঞেস করলে, তুই কী করে জানলি?

বললাম, ও হচ্ছে আসলে আমার রাঙা-বৌদি। ডাক্তার-জে-এন-দাশের স্ত্রী। আর ওই মিস্টার শর্মা, ও ছিল রাঙা-বৌদির ড্রাইভার রাজবাহাদুর। একদিন রাঙা-বৌদি থিয়েটার রোডের বাড়ি ছেড়ে ওই ড্রাইভারের সঙ্গেই পালিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ডাক্তার দাশের তিন-চার লাখ টাকা আর গয়না-গাঁটি সমস্ত। তার দামও প্রায় অনেক লাখ টাকা।

অবনী বলে উঠলো, তাই নাকি? আমিও একটা গুজব শুনেছিলাম বটে, যে ডাক্তার দাশের স্ত্রী ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। তা'হলে কথাটা সত্যি? তা'হলে এই-ই তোর সেই রাঙা-বৌদি? আমি তো এতদিন আসছি, কিছুই তো বুঝতে পারি নি।

* * *

আশ্চর্য! আমিই কি প্রথমে কিছু বুঝতে পেরেছি? কলকাতা থেকে এই বিহারে এসে এক অজ পাড়াগাঁয়ের মধ্যে সেই আমার রাঙা-বৌদিকে যে আবার এতদিন পরে দেখতে পাবো, এ তো আমি নিজেও কল্পনা করতে পারিনি। কতকাল আগের কথা। রাঙা-বৌদি এত মোটা হয়ে গেছে, আমার চেহারাও সেই আগেকার মত আর নেই। আর তা ছাড়া রাঙা-বৌদিই বা কি করে কল্পনা করতে পারবে যে, সেই আমিই এতকাল পরে কোন্ সূত্র ধরে তার জনকপুরের নতুন শ্বশুর বাড়িতে এসে হাজির হবো।

কিন্তু মনে আমার ভাবনার সূত্রগুলো জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠে কেবল পীড়া দিতে লাগলো। থিয়েটার রোডের সেই বাড়ি আর ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্রে বসে থেকেও কোন্ প্রলোভনে সে তার ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে এসে এই জনকপুরের মত জায়গায় এল। এখানে রাঙা-বৌদি কি সুখ পাচ্ছে?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা ক্ষীণ সূত্র আবিষ্কার করলাম। হয়ত ডাক্তার জে-এন-দাশের বাড়িতে সমস্ত কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য থাকা সত্ত্বেও আসল জিনিসটার অভাব ছিল রাঙা-বৌদির। তার বাড়ি ছিল, টাকা ছিল, গয়না ছিল, আরাম ছিল, ছিল না শুধু প্রভুত্ব খাটাবার ক্ষমতা। হয়তে রাজবাহাদুরকে বিয়ে করে সেই ক্ষমতাটা এখন তার আয়ত্তে এসেছে ডাক্তার জে-এন-দাশ তার অধীনে ছিল না। কিন্তু এই রাজবাহাদুর তার কথায় উঠে-বসে। এটাই কি মেয়েমানুষের জীবনে কম ক্ষমতা নাকি?

কিম্বা হয়ত আমার সেই জ্যোতিষ বন্ধুর কথাই ঠিক। এও হয়ত সেই বিপরীত-রাজযোগ। রাঙা-বৌদির কোষ্ঠীতে হয়ত সেই বিপরীত রাজযোগের লক্ষণ ছিল। কে জানে!

স্বামী-স্ত্রী সংবাদ/৩

কাকে নিয়ে লিখি? কী নিয়েই বা লিখি?

আমার লেখক-জীবনে এত মানুষ আর এত ঘটনা দেখেছি, যে একটা জীবনে তা যদি লিখতে যাই, তো একটা হাতেও তা কুলোবে না আর একশোটা উপন্যাস লিখলেও তা শেষ হবে না। গত বছরে একটি পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় যে-কাহিনীটি লিখেছিলাম, তা আজ পর্যন্তও বই আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। পত্রিকার পূজা-সংখ্যায় লেখার এই-ই হল দোষ। তাড়াতাড়ি লিখতে হয়, ভাববার সময় পাওয়া যায় না।

অথচ মানুষের মন নামক বস্তুটা তো অত সহজে বশ মানে না। মনকে যদি অত সহজে বশে আনতে পারব, তো লেখক না হয়ে সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে গিয়ে থাকলেই তো পারতুম। সেখানে গিয়ে লোটা-কম্বলই আশ্রয় করতুম।

চিরকাল লোকে আমাকে লাজুক-স্বভাবের মানুষ বলে জানে। তারা জানে আমি আড়ালে থাকি তাই আমি কিছু দেখতে পাই না।

কিন্তু আমার সৃষ্টিকর্তা আমাকে নিঃসঙ্গ করছেন বটে, কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টিকে করেছেন বড় প্রখর। এই চোখ দু'টো দিয়ে আমি যা-কিছু দেখেছি, সবই আমার অনুভূতির পর্দায় স্পষ্ট করে দাগ কেটে দিয়ে গেছে।

যখন সেই মনের পর্দাখানার দিকে চেয়ে দেখি তখন ভেবে অবাক হয়ে যাই যে, কত মানুষ আমাকে ভালবেসেছিল, আর কত মানুষ আমাকে ঘৃণা করেছিল! কই, তাদের সকলের কথা তো লিখতে পারি নি কিছু। একটা জীবনে কতগুলো কথা লেখা যায়? এক-একটা মানুষ যেন এক-একটা প্যাসিফিক-ওসান। তাই আমাদের কবি বলে গিয়েছেন—'তার অন্ত নাই গো যে-আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।'

সত্যিই মানুষের বৈচিত্র্যের বুঝি শেষ নেই। আমার সমস্যার কথা শুনে আমার এক বন্ধু বললে কেন, তোমার সেই মিষ্টি-দিদিকে নিয়ে লেখ না—বেশ অদ্ভুত চরিত্রটা তো তার।

আমি বললাম, সে কবে লিখে ফেলেছি।

বন্ধু বললে, তা'হলে সেই তোমাদের বিলাসপুর অফিসের ঘড়িবাবু?

বললাম, সেও আমি লিখে ফেলেছি।

তখন বন্ধু বললে, তাহ'লে পটেশ্বরী বৌঠান? সেই তোমার বিদ্যাসাগর কলেজে পড়বার সময়?

হাসতে-হাসতে বললাম, তাও লিখে ফেলেছি ভাই। আমার 'সাহেব বিবি গোলাম'টা পড়লেই দেখতে পেতে।

তখন বন্ধু বললেন, তা'হলে তোমাদের গ্রামের সেই 'নয়নতারা'র চরিত্রটা? সেই যে চৌধুরীদের পোড়ো বাড়ি, যে-বাড়ির মালিক নিজের পুত্রবধূর ঘরে ঢুকতো রাত্তিরবেলা? সেইটে নিয়ে লেখ না।

বললাম, তুমি আমার কোনও বই-ই পড়নি দেখছি। আমার 'আসামী হাজির' বইতেই সে-চরিত্রটা পাবে।

বন্ধু বললে, তা'হলে কী করবে?

বললাম, কী করব তাই-ই তোমায় জিজ্ঞেস করছি।

আমার বন্ধু অনেকক্ষণ ভাবলে। বললে, আজকে থাক, দেখি কালকে আমি কোন গল্প দিতে পারি কিনা। এই বলে সে চলে গেল।

আমার জীবনে এ-রকম অনেকবার হয়েছে। এর জন্যে অবশ্য আর কেউ দায়ী নয়, দায়ী আমি একলাই। অনেকে ভাবে আমি যখন এত মোটা-মোটা বই লিখেছি, তখন বোধহয় কলম নিয়ে বসলেই আমার লেখা আপনা হতেই চলে আসে।

কিন্তু আসলে কথাটা সত্যি নয়। কেউ তো জানে না যে আমার এই বইগুলোর পেছনে কী অমানুষিক যন্ত্রণার ইতিহাস লুকিয়ে আছে! অন্যেরা সভা-সমিতিতে গিয়ে ফুলের মালা পরে আনন্দ করে, আমার তখন বিশ্রাম নেই। আমার মাথায় তখন গল্পের যন্ত্রণা। মানুষ আমায় যত ভালবেসেছে, আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে তার দশগুণ।

যারা আমাকে জোর করে লিখিয়েছে, তারা সব সময়ে যে ভালবেসেই লিখিয়েছে, তা অবশ্য নয়। কিন্তু ফল হয়েছে তার উল্টো। সেই সব লেখা লিখেই আমি লোকের ভালবাসা পেয়েছি। তাতে দশগুণ আঘাত পেলেও সেই জনসাধারণের ভালবাসাকেই আমি বেশি প্রাধান্য দিয়েছি।

কিন্তু উপন্যাস লিখতে গিয়ে এত নিজের কথাই বা কেন লিখছি?

বলতে পারেন এ-ও গল্পের ভূমিকা বিশেষ।

গান গাইবার আগে যেমন আলাপ করে গায়ক। পরিণয়ের আগে যেমন পূর্বরাগের রীতি আছে, এও অনেকটা তেমনি।

আমি যে বন্ধুর কথা বলছি সে মাঝে-মাঝে বলে—তুমি তো নিজে কথা কম বল, কিন্তু তুমি লেখায় অত বাচাল কেন?

আমি জবাবে বলি—ওই, আমি কম কথা বলি বলে—

বন্ধু বলে, কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুম না।

আমি সবিশদভাবে বুঝিয়ে বলি—ফুলের তোড়ায় কি শুধু ফুলই থাকে, আর কিছু থাকে না? তুমি ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে, ফুলের

তোড়ায় যত ফুল থাকে তার পাঁচগুণ বেশি থাকে দেবদারু পাতা। তাতে কি ফুলের সৌন্দর্য কমে না বাড়ে, তুমিই বলো ?

বন্ধু বলে—আমরা অত-শত বুঝি না ভাই, কথা হল তোমার যা বলবার তা ঝটপট বলে দাও, আমরাও তা চটপট শুনে নিই, চুকে যাক ল্যাঠা।

আমি বলি—তা'হলে তো গল্প লেখাটা খুব সোজা কাজ হয়ে যেত হে, তুমিও বাঁচতে আমিও বাঁচতুম।

বন্ধু বলে—তা যাই বল, আমি ভাই তোমাদের সাহিত্য-ফাহিত্য বুঝি না, আমি ডিটেকটিভ্ গল্প পড়তে ভালবাসি, আর তাই-ই পড়ি।

শুধু আমার এই বন্ধুই নয়, পৃথিবীতে এই জাতের পাঠকের সংখ্যা নগণ্য নয়। তাদের মন নিশ্চয়ই আছে! কিন্তু মনস্কতা বলে যে একটা বস্তু আছে, সেটা নেই। সেটা নেই বলেই ডিটেকটিভ গল্পের পাঠকের সংখ্যাও কম নয়।

গল্প লেখার আগে তার অস্তিত্ব থাকে লেখকের মাথায়। সে অস্তিত্ব সূক্ষ্ম, সে-অস্তিত্ব সদ্য-ভাসমান। মানুষের অগোচরে তার বসবাস! তাকে দেখা যায় না। তাকে রূপ দেবার জন্যে চেষ্টা করতে হয়। আরাম-নিদ্রা-বিলাস ত্যাগ করতে হয়। সাধনা দ্বারাও তেমনি অশরীরী গল্প শরীর-রূপ লাভ করে।

কিন্তু অনেক সময়ে সাধনার জন্যে কেউ সময়ও দিতে চায় না। বাইরের জগৎ থেকে বাধা আসে। সেখানে সম্পাদক কিংবা প্রকাশক হাতে লাঠি নিয়ে এসে হাজির হয়। এসেই বলে—গল্প দাও।

যদি বলি যে সময় চাই, তাহ'লে সে নারাজ হয়। সে বলে—ও সব আমি বুঝি না, সময় দেবার গরজও আমার নেই, আমার শুধু গল্প চাই। আমাকে গল্প দাও।

এ সত্যযুগ নয় যে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের দুঃখে অধীর হয়ে গেলাম আর কলমের ডগায় গড়-গড় করে গল্প গড়িয়ে পড়ল—তা হবার নয়। এ কলিযুগ, এখানে ক্রৌঞ্চ-মিথুনও দেখতে পাওয়া যায় না, আর বাল্মীকি তো এ-যুগে অদৃশ্য।

এই হেন অবস্থায় আমি আর কী করি, তাই আমার বন্ধুর দ্বারস্থ হলাম। আমার এই বন্ধু বাল্যবন্ধু বললে অত্যুক্ত হয় না। এককালে একসঙ্গে পড়েছিলাম। তখন এই বন্ধু থাকত মালদা'তে। কাকার বাড়িতে মানুষ। আমিও তখন কয়েক বছর মালদা'র স্কুলে পড়েছিলাম।

সেই সময়েই আমার বন্ধু এই জহরের সঙ্গে পরিচয়। জহরের বাবা মারা গিয়েছিল অল্প বয়েসে। বিধবা মা ছিল। কাকা সেই বিধবা বউদি আর ভাইপোকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তার বদলে জহরকে বাড়ির সমস্ত কাজ-কর্ম করতে হত। বাড়ির সকলের ফাই-ফরমাশ খাটতে হত।

জহর জানত, তারা গরীব। কাকার গলগ্রহ। তাই প্রাণপণে লেখাপড়ায়

ভাল হবার চেষ্টা করত। সে জানত, লেখাপড়ায় ভাল হলে তবেই তার আর বিধবা মায়ের মুখরক্ষা হবে। তখন থেকেই দেখছি সে আমাদের মতন পান, সিগারেট, চা কিছুই খেত না।

সে বলত—না ভাই, ও-সব নেশা-টেশা করা আমার মতন ছেলের পোষাবে না। আমি একে গরীব তার ওপর যদি আবার নেশার দাশ হয়ে পড়ি, তখন কে আমার এই নেশার খরচ যোগাবে। সেই জন্যেই ভাই ও-সব দিকে আমি যাব না।

আমরা জহরের অবস্থা বুঝতুম। তাই ও নিয়ে তাকে আর কোনও দিন পীড়াপীড়ি করিনি। তারপর আমি মালদা ছেড়ে কলকাতায় চলে আসি বাবার সঙ্গে। বাবার অফিস বদলির সঙ্গে আমারও স্কুল বদলি হল। তারপর থেকে জহরের সঙ্গে আমার সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেল।

তারপর কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল, আমি কী ছিলাম আর কী হয়ে গেলাম, কিছুই খেয়াল ছিল না। জীবনের সৃষ্টিকর্তা যিনি তাঁর হাতের পুতুল আমরা! বলতে গেলে বোধহয় আমাদের কোনও ক্ষমতাই নেই। আমার মনে হয় গাছের একটা পাতা পর্যন্ত সেই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছেটি ছাড়া নড়ে না। জানি না, এতে আমাকে কেউ ভাগ্যবাদী বলে বদনাম দেবে কি না। আর সে বদনাম দিলেও আমি আমার বিশ্বাস থেকে একতিলও নড়ব না।

ভর্তৃহরি বলে এক ঋষি কবি ছিলেন আমাদের দেশে। 'তিনি বলে গেছেন কেউ তোমাকে বলবে সাধু, কেউ বলবে অসৎ, কেউ বলবে পণ্ডিত, কেউ বলবে মূর্খ, সবাই নানাভাবে তোমাকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তুমি কোনও দিকে দৃষ্টি দেবে না, তুমি একমনে শুধু নিজের কাজ করে যাবে।

কথাটা যে কতখানি সত্যি তা আমি নিজের জীবনে যেমনভাবে বুঝতে পেরেছি, তেমন করে আর কখনও কোনো কথা বুঝিনি! যখন শেষ পর্যন্ত আমার একটা হিল্লে হলো তখন একদিন জহরের সঙ্গে দেখা রাস্তায়। আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু সে চিনতে পারে নি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, জহর না?

জহর আমার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

বললে, আমি তো ঠিক চিনতে পারছি না ভাই আপনাকে।

আমি আমার নাম বলতেই জহর আনন্দে একেবারে আমাকে জড়িয়ে ধরলে। তারপর তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম। আমাদের পরিচয় আবার ঘনিষ্ঠ হল। আবার আমরা একাকার হয়ে গেলাম আগেকার মত। আর তারপর থেকে আমরা আবার নিয়মিত ভাবে মেলামেশা করতে লাগলাম।

আমার পেশা যা তাতে লোকের সঙ্গে মেলামেশা আড্ডা দেওয়া অপরিহার্য। আড্ডা না দিলে লেখক হওয়া যায়, কিন্তু সুলেখক হওয়া যায় কিনা

াামার সন্দেহ আছে। এক-একটা বই লিখি আর তার সঙ্গে পরামর্শ করি। স আমার এক-একটা পাতা পড়ে আর মতামত জানায়। গল্পটা ভালো না াাগলেও জানায়। আমি জিজ্ঞেস করি, কেন?

জহর বলে, এ-রকম করে প্রেম হয় না। এ পাতাটা নতুন করে করে লখ তুমি।

তার মন্তব্য শুনে কখনও আমি লেখাটা বদলাই, আবার কখনও বদলাই া। জহর আমার এমন বন্ধু যে সাহিত্যের কিছুই বোঝে না। যে সাহিত্য বাঝে না, তাকেই আমার ভাল লাগে। কারণ তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা ায়। সাহিত্য বড় সূক্ষ্ম জিনিস। যে সাহিত্য বোঝে, তার সঙ্গে সেই সূক্ষ্ম জনিস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যদি অপ্রিয় কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, খন নিজের রাত্রের ঘুম, দিনের শান্তি সব চলে যায়।

তার চেয়ে আমার অসাহিত্যিক বন্ধুই ভাল। যে সাহিত্য নিয়ে কিছু লতে গিয়ে কিছু বিরূপ মন্তব্য করলেও তা আমার মনে আঘাত করতে পারে া। যা'হোক, এবার জহরের কথাই বলি।

জহর আমাকে প্রায়ই বলত, ভাই, তুমি কিছু মনে করো না, তোমার পন্যাস গল্পগুলো বড় ঢিমে তালে চলে। বড্ড ফেনাও তুমি গল্প নিয়ে। যা লবার ঝপ্ করে বলতে পারো না?

আমি বলতাম, মানুষের জীবনও যে ভাই ঢিমে তালে চলে—জীবন আর াল্প কি আলাদা?

জহর বলত, কিন্তু ভাই আমরা সাধারণ মানুষ, গল্পের শেষ পর্যন্ত কী হল, তাই জানবার জন্যেই আমরা অপেক্ষা করে থাকি। আর তুমি সেই কথাটাই এত ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলো যে আমাদের আর ধৈর্য থাকে না।

আমি বলতাম, দেখ, সিনেমা আর সাহিত্যের মধ্যে এইটেই হল গোড়ার কথা। যে উপন্যাস যত ঢিমে তালে চলবে ততো ভাল, আর সিনেমা যত গতিসম্পন্ন হবে ততো তা ভাল হবে।

জহর বলত, এ-সব হল তত্ত্বকথা, আমাদের মত সাধারণ লোকের ও-সব জেনে কোনও লাভ নেই।

জহর একদিক থেকে ভাল। ভাল এইজন্যে যে কিছু না বুঝে সে অনেক বোঝার ভান করত না। তা শেষকালে আমাকে এই জহরেরই শরণাপন্ন হতে হল। জহর পরের দিন আবার এল। আমার সমস্যার কথাটা তার মনে ছিল। বললে, কী হল? তোমার সমস্যা মিটেছে?

বললাম, না ভাই, এত অল্পে যদি সমস্যা মিটত, তাহ'লে কি আমার াবনা? অথচ সময়ও বেশি নেই। এদের শেষ মুহূর্তে যত তাড়া। একটু দি সময় দেয়, তাহ'লে তো একটু ভাবনার সময় পাই। সময়ও দেবে কম

আবার লেখাও ভাল হতে হবে—এ বড় শক্ত জিনিষ। এ তো ইলেক্‌ট্রিক বালব্‌ নয়, যে সুইচ্‌ টিপলাম আর আলো জ্বলে উঠল! এটা বোধহয় সম্পাদক বা প্রকাশকেরও দোষ নয়, দোষটা এত ব্যস্ত যুগের। কেবল স্পীড্‌ আর স্পীড্‌। তাই এযুগেও কোন মহৎ সৃষ্টি আর হচ্ছে না, যা হচ্ছে তা মিডিওকার বললেই বোধহয় ঠিক বলা হবে। যদিও বা কোনও মহৎ স্রষ্টার জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তো সে-ও এই জাঁতাকলের ঘুর্ণির তলায় পড়ে পিষে গুঁড়িয়ে যাবে।

জহরের এ-সব কথা বোঝবার মত বিদ্যে ছিল না বা বোঝবার ইচ্ছেটাই ছিল না তার কখনও। আমার কয়েকটা বই বাধ্য হয়ে পড়েছে বলেই তার কিছু সামান্য জ্ঞান হয়েছে সাহিত্য সম্বন্ধে।

আমি তাই বললাম, তুমি কিছু ভাবলে আমার জন্যে ?

জহর বললে, ভেবেছি। কাল রাত্রিরে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ ভেবেছি। শেষকালে কোথাও কিছু কুল কিনারা না পেয়ে ভাবলাম আমার গল্পটা তোমার কলমে লেখালে কেমন হয়!

আমি বললাম, তোমার গল্প মানে ? তোমার নিজের জীবনের গল্প।

জহর বললে, হ্যাঁ, একেবারে আমার পার্সোনাল লাইফের গল্প। একেবারে সত্যি ঘটনা। আমার নিজের কানে শোনা গল্প নয়, চোখে দেখা গল্পও নয় একেবারে নিজের অভিজ্ঞতার গল্প।

বললাম, কী রকম, শুনি ?

জহর বলতে লাগল, তুমি তো জানো আমি আমার বিধবা মা'কে নিয়ে মালদা'য় কাকার বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে ছিলাম। অল্প বয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর আত্মীয়ের বাড়িতে বিধবা মাকে নিয়ে গলগ্রহ হয়ে থাকা যে কী জিনিস, তা তোমরা কেউ বুঝবে না। শুধু লেখাপড়া নয়, সারা বৎসরের স্কুলের মাইনেটা দিত আমার কাকা। আর মা'র আর আমার খাওয়ার আর থাকবার খরচা। এই দয়ার জন্যেই সংসারের সমস্ত কাজই আমাকে আর মা'কে করতে হত।

মা'র যে বয়েস তাতে সংসারের সমস্ত কাজ নিজের হাতে করা বড় কষ্টের মা'কে দেখে আমার খুব কষ্ট হত ভাই। মা'কে যদি সে-কথা বলতে যেতাম তো মা বলত, তুই চুপ কর, তুই ও-সব কথা আমাকে বলিস্‌ নি। কেউ শুনে ফেলবে, তখন সর্বনাশ হবে।

মা রান্না করত সকাল থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত। এক মুহূর্তে বিশ্রাম ছিল না তার। মা যে অত পরিশ্রম করতো তার একমাত্র স্বার্থ ছিল আমি। আমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হবো, এইটেই মা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত সব সময়। মা'র একমাত্র চিন্তা ছিল আমাকে নিয়ে। আমিই ছিলাম মা'র মাথাব্যথা

কাকীমা পান থেকে চুন খসলে মা'কে বকুনির একশেষ করত। আমার বড় কষ্ট হত শুনে। নিজেও ভগবানের কাছে কেবল প্রার্থনা করতাম, ভগবান তুমি মা'র কষ্ট দূর করো—মা'র কষ্ট আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

সেদিন মা খুব বকুনি খেয়েছিল কাকীমার কাছ থেকে। আমি দূর থেকে দেখলাম, মা আঁচলে চোখ মুছছে। তখন আর কিছু বলতে পারলাম না। রাত্রে মা'কে একলা পেয়ে চুপি-চুপি বললাম, মা, কাকীমা তোমায় অত করে বকলে, আর তুমি চুপ করে শুনলে? কিছু বলতে পারলে না?

মা বললে, তুই চুপ কর, তোর ঘরে যা।

আমি বললাম, কিন্তু তোমাকে মিথ্যে দোষ দেবে ওরা আর তুমি মুখ বুঁজে তা সহ্য করবে?

মা বলত, ওরে ওতে কিছু মনে করতে নেই। তুই আগে মানুষ হ'। তুই মানুষ হলেই আমার সব দুঃখ ঘুচবে—তোর কথা ভেবেই আমি সব অপমান মুখ বুঁজে সহ্য করে যাই—মাথার ওপর ভগবান তো সব দেখেছেন।

আমি বলতাম, না, ভগবান নেই। ভগবান থাকলে কি আর তোমার এত কষ্ট হয়?

মা বলত, অত চেঁচাস নি, কেউ শুনতে পাবে, তখন তোকে নিয়ে কার কাছে যাব বল? কে আমাদের মাথা গোঁজার জায়গা দেবে?

মা'র দুঃখটা বুঝতাম। কিন্তু আমার কষ্ট হত এই ভেবে যে, আমি মা'র কোনও কষ্টেরই প্রতিকার করতে পারলাম না। কবে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবো, ততদিন মা'কে কী করে এই অপমানের হাত থেকে বাঁচাব। মা'র তো বয়েস হচ্ছে।

সত্যি, এখন ভাই আমার বয়েস হয়েছে, এখন একটু স্বচ্ছল হয়েছে আমার অবস্থা। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে, মা এ-সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। যার জন্যে এত কষ্ট করে এখন নিজে বাড়ি করে আরাম করছি, সেই মা-ই আর শয্যাশায়ী, এ-কথা ভাবলেই আমার খুব কষ্ট হয় ভাই। আমার এ দুঃখ কেউ-ই বোঝে না। আমার এ-কথা কে বুঝবে বল? আমি কাউকেই এ-সব কথা বলি না। আজই প্রথম তোমাকে বললাম। কারণ এ-ঘটনা না বললে তুমি গল্প লিখবে কী করে?

তুমি কলকাতায় চলে আসবার আগে থেকেই এই সব ঘটনা ঘটত। তোমরাও জানতে না যে আমার কী দুঃখ। কারণ কাউকে বলবার মত ঘটনা এ নয়। আমি কোনও রকমে নাকে-মুখে ভাত গুঁজে স্কুলে যেতাম। পেট আমার সত্যিই কোনও দিন ভরত না।

আমার ভাই ক্ষিধেটা বেশি। অন্য ছেলেরা যা খেত, আমি তার ডবল খেতাম। আমার পেট কিছুতেই ভরত না। তবু মুখ দিয়ে মাকে বলতে পারতাম না যে—মা আর দু'টি ভাত দাও।

মা আমার ক্ষিধের কথা জানত। মা জানত, যে আমি একটু বেশি ভাত খাই। মা রান্নাঘরের দরজার আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত। কিন্তু কখনও কাছে এসে বলতে পারত না, যে আমি আর দু'টি ভাত নেব কিনা।

কাকীমা সংসারের কাজকর্ম কিছু করত না বটে, কিন্তু লক্ষ্য রাখত সব দিকে। কোথায় জল নষ্ট হচ্ছে, কে বেশি ভাত খাচ্ছে, কে চুরি করছে, সেই দিকটাতেই তার ছিল বেশি নজর। আর মুখটা ছিল বড় মুখর। যাকে সামনে পেত, তাকেই যাচ্ছেতাই করে বকত।

এই পরিস্থিতিতে আমার স্কুল জীবনটা কেটেছে ভাই। একে মা-র ওই কষ্ট, তার ওপর টাকার অভাব। স্কুলে গিয়েও শান্তি নেই! গরীব বলে তোমরাও আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে না। আমি লজ্জায় তোমাদের সামনে নিজের দুঃখের কথা প্রকাশ করতে পারতাম না। আর এমন কপাল যে মন দিয়ে হয়তো একটা বই পড়ছি এমন সময় কাকীমা এসে বললে, সরষের তেল নিয়ে এসো তো পোয়াখানেক, তেল একেবারে বাড়ন্ত।

মা বলত, ও এখন পড়ছে, সামনে ওর পরীক্ষা, আমি বরং নিয়ে আসছি দোকান থেকে।

কাকীমা বলত, সে কি, তুমি বাজারে যাবে? পাড়ার লোক কী বলবে বলো তো? লোকে তো তখন আমাকেই দোষ দেবে—বলবে নিজের বিধবা জা'কে কিনা বাজারে পাঠিয়েছে। লোকের মুখ তো আমি চাপা দিতে পারব না দিদি।

মা বলত, খোকার পড়াশুনো আছে তো, ওর সময় নষ্ট হবে, সেই জন্যেই বলছি ভাই।

কাকীমা তখন চেঁচিয়ে উঠত। বলতো, তুমি থামো তো দিদি, তোমার ছেলে পড়াশোনা করে তো একেবারে উল্টে যাচ্ছে, কেবল খাই-খাই বাই হলে কি লেখাপড়ায় মন বসে কারো?

আমি তখন কাকীমার কাছে গিয়ে বলতাম—আমি এখ্খুনি যাচ্ছি কাকীমা কতটা তেল নিতে হবে?

কাকীমা কখনও একবারে বেশি তেল কিনবে না। ওই এক পোয়া কি আধ পোয়া বড় জোর। তার কারণ মা যদি রান্না করতে গিয়ে বেশি তেল খরচ করে ফেলে! আর শুধু সরষের তেলের ব্যাপারেই নয়, সব ব্যাপারেই এমনি। সরষের তেল, ঘি, দেশলাই, মশলা, সব কিছুই অল্প-অল্প কিনবে কাকীমা। কাকীমা বলতো, পয়সা কি অত সস্তা বাছা, কর্তার মুখের রক্ত ওঠা পয়সা, অমনি খরচ করলেই হল। নিজে পয়সা উপায় করতে হলে তখন টের পেতে তোমরা।

সামান্য দেশলাই কাঠি। সেই দেশলাই কাঠিটা পর্যন্ত হিসেব করে খরচ

করত কাকীমা। প্রতি রাত্রে একটা করে কাঠি দিত মা'র হেপাজতে। সেই একটা কাঠিতে পরের দিন সকালবেলা মা'কে উনুন ধরাতে হবে। সেই একটা যদি কোনও উনুন জ্বালাতে গিয়ে নিভে গেল তো মা-র ওপরে তম্বি। বকুনির চোটে সেদিন আর বাড়িতে কাক-চিল বসতে পারবে না।

এত দুঃখ-দুর্দশার কথা তোমার পাঠকদের ভাল লাগবে কিনা জানি না। ভাই, তোমাদের সাহিত্য যদি জীবনের ছবি হয়, তো তাহ'লে এগুলো বাদ দিলে তো জীবনের কথাই হয় না। তা জানি না এ-সব কথা তোমার গল্পের কাজে লাগবে কিনা, তবু বলে যাই আমি। তুমি লেখবার সময়ে যে-গুলো বাদ দেবার তা বাদ দিয়ে বাকি অন্য কথাগুলো লিখো। আমি অসাহিত্যিক মানুষ, আমার যা মনে আসে তাই বলে যাচ্ছি, তুমি তোমার মত যাচাই-বাছাই করে নিও।

যা হোক, দিনগুলো যখন এই রকম কাকীমার সংসারে ফাই-ফরমাশ খেটে আর ইস্কুলের মাষ্টার-মশাইদের বকুনি খেয়ে কাটছে, তখন রাতগুলো ছিল আমার ভরসা স্থল। রাতটাই ছিল তখন বলতে গেলে আমার একান্ত নিজের।

কিন্তু আলো জ্বালিয়ে পড়া মানেই তো পয়সার অপব্যয়। এই অপব্যয়টাই কাকীমার কাছে ছিল অসহ্য। তিনি সবকিছু সহ্য করতে পারতেন, কিন্তু সহ্য করতে পারতেন না কেবল একটা জিনিস—সেটা হচ্ছে পয়সার অপব্যয়। রাত জেগে পড়াশোনা করাটা ছিল কাকীমার কাছে পয়সা নষ্ট করা। কাকীমা রেগে গিয়ে বলত, ইলেকট্রিক লাইট বুঝি খুব সস্তা পেয়েছ দিদি যে লাইট জ্বেলে গল্প করছ? লাইট নিভিয়ে বুঝি গল্প করা যায় না? গতরে খেটে যদি পয়সা উপায় করতে হতো তো বুঝতে পারতে এই পয়সার মহিমা।

হয়তো মা তখন সত্যি-সত্যিই গল্প করছিল না, ঝিয়ের সঙ্গে বাসন মাজা নিয়ে কথা বলছিল। কথা কানে যেতেই কাকীমা ভাবলে বুঝি মা কারো সঙ্গে গল্প করছে।

মা বলত, আমি তো গল্প করিনি, এই কামিনীকে বলছি ভাতের থালাটা আগে মেজে দিতে।

কাকীমা বলত, তা কামিনীকে হুকুম করছ করো, কিন্তু লাইটটা নিভিয়ে কথা বললে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

কাকীমার কাছে সব অপব্যয়। অকারণে আলো জ্বেলে রাখা অপব্যয়, ক্ষিধে পাওয়া অপব্যয়, এমন কি লাইট জ্বেলে পড়াশোনা করাও অপব্যয়।

তা আমার একটা সৌভাগ্য ছিল। সৌভাগ্যটা হচ্ছে এই যে আমাদের বাড়িটার ঠিক সামনেই আমাদের বাড়ির গা ঘেঁষে একটা ল্যাম্প-পোষ্ট ছিল।

সদরের রোয়াকের ওপর ল্যাম্প-পোষ্টের নিচেয় বসে রাত জেগে লেখাপড় করতাম। তাতে কাকীমার বকুনি খাওয়ার হাত থেকে বাঁচতুম, স্কুলের পড়াশোনা না করার অভিযোগে মাস্টার মশাইদের শাস্তির হাত থেকেও বাঁচতাম।

একদিন রাত্রে এমনি একমনে সেই রোয়াকের ওপর ল্যাম্পপোষ্টের আলোর নিচেয় বসে লেখাপড়া করছি। তখন আমি ক্লাস ইলেভেন্-এর ছাত্র সামনে পরীক্ষা। আমার কোনও দিকে নজর নেই। রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা-বারোটা হবে, এমন সময়ে রাস্তার ওপর থেকে একজন মেয়ের গল শুনতে পেলাম। মেয়েটা বলছে, একটু শুনবেন—

আমি সেদিকে চেয়ে দেখলাম! অল্প বয়েস মেয়েটার। বেশ সাজগোজ দেখি আমার দিকে চেয়েই মেয়েটা কথা বলছে।

তখন আমার একটু আগ্রহ হলো। জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে বলছেন

মেয়েটি বললে হ্যাঁ, আমার একটা কথা রাখবেন?

আমি বললাম, বলুন কী কথা?

মেয়েটি বললে, আমার বড় ভয় করছে, আপনি যদি একটু আমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেন।

আমি তো অবাক! কোথাকার কে মেয়ে তার ঠিক নেই, জীবনে কখনও তাকে দেখিনি, তার ওপর আবার অত রাত!

আর তাছাড়া মেয়েটার সঙ্গেই বা কেউ নেই কেন? একলা-একলা ও বয়েসী মেয়ে কেন বাড়ি থেকে এখন বেরিয়েছে?

আমি বললাম, আমি তো আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না।

মেয়েটা বললে, আমিও তো আপনাকে চিনি না। নেহাত বিপদে পড়ে বলেই আমি আপনার সাহায্য চাইছি।

বললাম, বলুন, কী করতে হবে বলুন?

মেয়েটা বললে, আমাকে আমার বাড়িতে একটু পৌঁছে দেবেন? সামনে মাঠটার কাছে একটু গুণ্ডাদের ভয় আছে। রাত্তির বেলা ওখানে দি আমার যেতে ভয় হয় খুব।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বাড়ি কোথায়?

মেয়েটা বললে, বস্তিপাড়ায়।

আমি নাম শুনে চিনতে পারলাম না জায়গাটা, জিজ্ঞেস করলাম বস্তিপা কোন্ জায়গায়?

মেয়েটি বললে, ওই যে বড় মাঠটা পেরিয়ে নতুন কলোনী হয়েছে, তার নাম বস্তিপাড়া।

আমার শোনা ছিল দেশ ভাগাগাগির পর ওখানে অনেক নতুন লোক এ

নিজস্ব বাড়ি করেছে। কিন্তু ওদিকে যাইনি কখনও। আগে। বাজারে গিয়ে আমার সঙ্গে অনেক নতুন মুখ দেখে কোথায় থাকে জিজ্ঞেস করতে তারা বস্তিপাড়ার নাম করছিল। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এত রাত্তিরে বাড়ি থেকে একলা বেরিয়েছিলেন কেন?

মেয়েটা বললে, এসেছিলাম সিনেমা দেখতে—নাইট-শোতে।

বললাম, নাইট-শোতে কেন এসেছিলেন? তাহ'লে তো জানতেনই যে বেশি রাত হবে বাড়ি ফিরতে।

মেয়েটি বললে, ইভিনিং-শো'র টিকিট পাই নি যে, তাই নাইট শো দেখলাম। তখন ভেবেছিলাম, কেউ না কেউ বস্তিপাড়ার দিকে যাবেই, কিন্তু এখন দেখছি কেউ এদিকে এল না।

আমি ভাই কি করবো বুঝতে পারলাম না। একটা অচেনা মেয়ের সঙ্গে ওই রাত্রে যাওয়া, কার মনে কি আছে কে বলতে পারে!

তারপর হঠাৎ নজরে পড়ল মেয়েটা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তুমি কল্পনা করতে পারবে নিশ্চয়ই যে তখন আমার কী রকম মনের অবস্থা। আমি কোনও মেয়ের সঙ্গে তখনও পর্যন্ত মিশিনি। মেয়েদের সম্বন্ধে আমার তখনও পর্যন্ত কোনও দুর্বলতা ছিল না।

আর তার ওপর সেই অত রাতে নির্জনে একজন মেয়ে আমার সাহায্য চাইছে, এবং শুধু সাহায্য নয়, সাহায্য না-পেয়ে হতাশ হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত কাঁদছে, এ-ঘটনা যতই রোমাঞ্চকর হোক, আমার মত ছেলের পক্ষে সেটা একান্ত ভীতিজনক।

আমি ভাই সত্যিই খুব ভয় পেয়ে গেলাম। বিশেষ করে তখন আমার মা, আমার কাকা-কাকীমার কথা মনে এল। ভাবলাম, তারা যদি কেউ দেখতে পায়! তারা দেখতে পেলে আমার যে কী সর্বনাশ হবে, তা আমি কল্পনায় দেখতে পেলাম। আমার আর্থিক অবস্থা, বিশেষ করে আমার মা'র অসহায় মূর্তি সব কিছু আমার চোখে ভেসে উঠল।

মনে হলো, তখন যদি এমন কাউকে দেখতে পেতাম যে ওই বস্তিপাড়ার দিকে যাবে, তাহ'লে মেয়েটাকে তার হাতে গছিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। তাহ'লে আমাকে আর বিব্রত হতে হত না।

কিন্তু ঈশ্বরের বোধহয় তেমন ইচ্ছে নয়। তাই আমি যখন কী করব, না করব ভাবছি, তখন মেয়েটার মুখের চেহারাটা দেখে কেমন করুণা হলো। আর তোমাকে এতদিন পরে বলতে লজ্জা নেই, মেয়েটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে আমার মনে হল মেয়েটা সুন্দরী।

কিংবা এও হতে পারে যে মাঝ-রাত্তিরের আলো-আঁধারির একটা মায়া আছে। সেই মায়ার জালে জড়িয়ে গিয়ে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীরও মতিভ্রম

হয়। বোধহয় আমার অবস্থাও ঠিক সেই রকম হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপাল-কুণ্ডলা'য় পড়েছিলাম পথ হারিয়ে গল্পের নায়ক নবকুমার যখন হতাশ হয়ে পড়েছে তখন হঠাৎ কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ পেয়েছিল সে। তখন নবকুমারের মনে যে অনুভূতি হয়েছে, সেই মেয়েটাকে দেখে আমারও ভাই সেই রকম অনুভূতি হল। ঠিক কপালকুণ্ডলার মত আমাকেও সেই মেয়েটা আকর্ষণ করতে লাগল। মনে হল, সে যদি আমাকে মরতে যেতেও বলে তো আমি যেন তাও যেতে পারি।

তা আমি ভাই করলাম কী, আমি তাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করে বসলাম। আমি ঠিক কী কথা বলব বলে ভাবছি। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে যেন কথাটা বেরিয়ে গেল। বললাম, আপনার নাম কী?

মেয়েটি বললে, সন্ধ্যা ভাদুড়ী—আমাকে 'তুমি' বলে কথা বলবেন।

তা সামান্য কয়েক মিনিটের পরিচয়ে কখনও কি কাউকে 'তুমি' বলে ডাকা যায়? আমি বললাম, আপনার সঙ্গে তো আমার বেশি পরিচয় হয় নি, এত অল্প সময়ে আপনাকে আমি কী করে 'তুমি' বলব! আর আপনিও তো আমার সমান বয়েসী মনে হচ্ছে।

মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠল, আপনার চেয়ে অনেক ছোট, আপনি আমাকে 'তুমি' বললে, আমি কিছুই মনে করব না।

এতখানি নির্ভরতায় আমি খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। ভাবলাম, একটা মেয়েকে একটু সাহায্য করলে আমার ক্ষতিটা কী? সে জন্যে তো আমার কোনও পয়সা খরচ হচ্ছে না। বললাম, আচ্ছা, তুমি দাঁড়াও, আমি এখুনি আসছি—বলে আমি বাড়ির সদর দরজায় তালা বন্ধ করে আবার রাস্তায় এসে নামলাম। বললাম, চল!

অন্ধকার রাত। সামনে আমার পরীক্ষার কথা আমার মনে রইল না। কাকা বা কাকীমা জানতে পারলে কী বলবে তারা, তাও মনে এল না। এমন কি আশ্চর্য, আমার মা-র স্বপ্নের কথা, মা-র ওপর অত্যাচারের কথা আমার মনে এল না তখন। আমি মেয়েটির পাশে-পাশে চলতে লাগলাম। প্রথমে আমিই কথা বললাম। বললাম, এত রাত্তিরে তোমার কিন্তু সিনেমা দেখতে যাওয়া উচিত হয় নি। এখনকার দিনকাল তো খারাপ।

সন্ধ্যা ভাদুড়ী বললে, আমি তো বিকেল বেলাই ছবি দেখতে এসেছিলাম, কিন্তু টিকিট পাইনি বলে নাইট শোতে দেখলাম।

বললাম, তা এতক্ষণ সময় কোথায় কাটালে?

সন্ধ্যা বললে, একটা চায়ের দোকানে কেবল এক কাপ চা নিয়ে বসেছিলাম।

বললাম, তোমার এত সিনেমা দেখবার সখ?

সন্ধ্যা বলল, হ্যাঁ, আমার খুব শখ, সিনেমা দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। আপনার সিনেমা দেখতে ভাল লাগে না ?

আমি তখনও কোন সিনেমা দেখিনি। তাছাড়া সিনেমা দেখবার পয়সা তো আমার পকেটে থাকত না! আমাদের যুগে গুরুজনরা আমাদের সিনেমা দেখতে নিরুৎসাহ করত।

তাই বললাম, আমার সিনেমা দেখতে তেমন ভাল লাগে না।

সন্ধ্যা বললে, সেকি, আপনি সিনেমা দেখেন না ? আপনিও দেখছি ঠিক আমার বাবার মত, আমার বাবারও সিনেমার ওপর ভীষণ রাগ ছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বাবার যদি সিনেমার ওপর এত রাগ. তো তুমি যে সিনেমা দেখতে এসেছ. এ-কথা বাবা জানলে রাগ করবেন না ?

সন্ধ্যা বললে, বাবা জানতে পারলে তো ? আমি মাকে বলে দিয়ে এসেছি যে, যদি বাবা খোঁজ করে তো বলো, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।

আমি বললাম, তোমার মা তো ভাল দেখছি।

সন্ধ্যা বললে, আমার নিজের মা নয়, সৎমা।

আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম। অবাক হয়ে গেলাম মেয়েটার সরলতা দেখে। আমি তো অচেনা লোক তার কাছে, তবু আমার সামনে নিজের পারিবারিক কথা বলতে তো লজ্জা করছে না।

বললাম, তোমার নিজের মা কবে মারা গেছেন ?

সন্ধ্যার মুখটা যেন কেমন করুণ হয়ে উঠল।

বললে, আমি নিজের মা'কে কোনদিন দেখিই নি।

সন্ধ্যার কথা শুনে আমার মনটা সত্যিই ভাই কেমন যেন ভিজে নরম হয়ে উঠল। মা ছিল আমার জীবনের সর্বস্ব। আমি জানতাম, মা থাকার কী সুখ। তাই মা না থাকার দুঃখ কী, তাও আমি কল্পনা করতে পারতাম! তাই যখন শুনলাম যে মেয়েটার মা নেই, তখন সত্যিই তার জন্যে আমার কষ্ট হতে লাগল খুব। আমার চোখের সামনে মেয়েটার কষ্টের ছবি স্পষ্ট ফুটে উঠল। আমি সেই অন্ধকারের মধ্যেই রাস্তায় চলতে-চলতে তার দিকে চেয়ে দেখলাম, তার চোখ দু'টো কান্নায় ছল-ছল করছে।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সৎমা তোমায় ভালবাসে ?

জবাবে মেয়েটা বললে, সৎমা কি নিজের মা'র মত হয় কখনও ?

বললাম, তোমার নিজের মা হলে তোমাকে এ-রকম করে একলা কখনও সিনেমা দেখতে দিতেন না। আর তোমার ভাই-টাই কেউ নেই ?

মেয়েটা বলল হ্যাঁ, আমার দাদা আছে। বয়েসে আমার চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু বিয়ে করার পর দাদা বউদিকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

মেয়েটা বললে, আমার বউদি লোক ভাল নয়। বরাবর দাদা আমাদের সঙ্গেই থাকত, কিন্তু যেদিন থেকে দাদা একটা চাকরি পেলে সেইদিন থেকেই দাদা অন্যরকম হয়ে গেল। বউদির আর ইচ্ছে হলো না, আমাদের সঙ্গে থাকতে—দাদাকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। যতদিন দাদার চাকরি হয় নি, ততদিন বউদি আমাদের সঙ্গেই থাকত।

বললাম, সব সংসারে আজকাল এই রকমই তো হচ্ছে।

মেয়েটি বলতে লাগল, তখন আমি ছাড়া বাবাকে আর আমাকে দেখবার আর কেউই ছিল না। আমার বয়েস তখন কম। আমি তখন সংসারের কিছুই বুঝতুম না। আমি তখন বাবাকে কেবল জিজ্ঞেস করতুম—দাদা কোথায় গেল বাবা? বাবা বলত—দাদা মারা গেছে! তারপর একদিন নতুন মা এল। সেই নতুন মা'ই আমাদের বাড়ি এসে ভাঙা-সংসারটাকে মাথায় তুলে নিলে—নইলে বাবাও বাঁচত না, আর আমিও মরে যেতাম।

রাস্তায় চলতে-চলতে মেয়েটার কাহিনী শুনতে লাগলাম। দূরে দেখতে পেলাম সেই মাঠটা। সেই মাঠটা পর্যন্ত মেয়েটাকে পৌঁছে দিতে পারলেই আমার কর্তব্য শেষ।

কিন্তু কেন জানি না ভাই আমার মনে হতে লাগল, মাঠটা যেন বড় তাড়াতাড়ি এসে গেল। এত তাড়াতাড়ি মাঠটা না এলেই বুঝি ভাল হতো। মনে হতে লাগল, মেয়েটি আমাকে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবার অনুরোধ করলে যেন আমি কৃতার্থ হয়ে যাব।

আমি ভাই তখন থেকেই জানতাম যে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মাৎসর্য—ওইগুলোই হচ্ছে মানুষের আসল শত্রু। কিন্তু অনেক শাস্ত্রজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অনেকে ওইগুলোর খপ্পরে পড়ে ধ্বংস হয়েছে, এও আমার জানা ছিল এবং পড়াও ছিল। কিন্তু সেই অবস্থায় পড়ে আমি যেন কেমন সব ভুলে গেলাম। মাঠটা পেরোবার পরও আমি কিছু আপত্তি করলাম না। আমি পাশাপাশিই চলতে লাগলাম।

হঠাৎ একটা অন্ধকার মত জায়গায় এসেই মেয়েটা থমকে দাঁড়াল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এ কি, থামলে কেন।

চেয়ে দেখি মেয়েটার চেহারা আমূল বদলে গিয়েছে। তার চাউনি দেখে আমার ভয় লেগে গেল। এ কি? এমন করে চাইছে কেন সে আমার দিকে? জিজ্ঞেস করলাম, কী হল তোমার? আমার দিকে অমন করে চাইছ কেন?

মেয়েটা বললে, তুমি কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলে? এই ফাঁকা মাঠের মধ্যিখানে?

আমি? আমি তাকে ফাঁকা মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়েছি? বলছে কী

মেয়েটা! আমি আঁৎকে উঠেছি তার কথাটা শুনে। মেয়েটা তখন গলাটা চড়িয়ে দিয়েছে। বললে—আপনি আমাকে নিয়ে না এলে কি আমি এখানে আসতাম? বলুন, আপনার কী মতলব?

আমি চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। অন্ধকার ফাঁকা মাঠ। কিন্তু তবু মনে হয় যেন অন্ধকারের আড়ালে কারা নিঃশব্দে লুকিয়ে আছে, লুকিয়ে-লুকিয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে। আমি ভয়ে একটু দূরে সরে এলাম। কিন্তু মেয়েটা এবার খপ্ করে আমার একটা হাত ধরে ফেললে। বললে, কোথায় পালাচ্ছেন? ভেবেছেন, পালিয়ে গিয়ে পার পাবেন? আমি এখুনি চীৎকার করে লোক ডাকব।

ক্ষীণ একটা প্রতিবাদের সুরে বললাম, তুমিই তো আমাকে টেনে নিয়ে এলে। বললে, অন্ধকারে একলা বাড়ি যেতে তোমার ভয় করছে।

মেয়েটা তখন নিজের গলাটা চড়িয়ে দিয়ে বললে, বানানো গল্প বলে নিজের দোষ এড়াতে চাইবেন না, তাতে আপনারই বিপদ হবে—বলুন আমাকে কেন জোর করে এখানে নিয়ে এলেন? কী মতলব আপনার, বলুন?

আমি তখন ভয়ে কাঁপছি। তবু খানিকটা সাহস নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কেন এসব মিথ্যে কথা বলছ?

মেয়েটা বললে, চুপ করুন, এখন ভালোয়-ভালোয় আপনার আংটিটা খুলে দিন।

মনে পড়ে গেল আমার আঙুলে একটা আংটি আছে। বাবা যখন বেঁচে সেই সময়ে আমার মা আমার পৈতের সময় ওই আংটিটা উপহার দিয়েছিল। সোনার দান হিসেবে নয়, ওই আংটিটা ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। আংটিটার ওপর আমার নামের প্রথম অক্ষরটা মিনে করা ছিল। মেয়েটা আবার চেঁচিয়ে উঠল, দিন আংটিটা, নইলে কিন্তু গণ্ডগোল করব আমি, চীৎকার করে লোক ডাকব।

অন্ধকারে মেয়েটার মুখ ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। সঙ্গে-সঙ্গে কল্পনায় চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল একদল পুলিশের মুখ। তারপর কোর্টঘর, মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগ, বিচার। আর তারপর তার সঙ্গে-সঙ্গে মা'র ওপর কাকীমার অত্যাচার। মা'র কষ্টের কথা মনে হতেই আমি নরম হয়ে গেলাম!

সঙ্গে-সঙ্গে আমি আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে মেয়েটাকে দিলাম। আর কোত্থেকে অন্ধকার ফুঁড়ে কয়েকজন লোক একেবারে আমার সামনে এসে হাজির হলো। সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠল। দেখে মনে হলো সবাই যেন মেয়েটার দলের লোক। মেয়েটাকে নিয়ে তারা সবাই হাসতে-হাসতে চলে

গেল। যাবার সময় বলে গেল—এই শালা, যদি পুলিসে খবর দিস্ তো তোকে আমরা খুন করে ফেলব, সাবধান!

তারপরেই তারা অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

* * *

আমি এতক্ষণ গল্প শুনছিলাম। জহর গল্প থামাতেই জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

জহর বললে, আমার জীবনে ভাই এটা-ই দ্বিতীয় দুর্ঘটনা। প্রথম দুর্ঘটনাটা ছিল আমার বাবার মৃত্যু।

জহরকে আমি ছোটবেলা থেকেই চিনতাম। জহরের বাবা যখন মারা যান, তখন সে আমাদের স্কুলে পড়ত না। জহর তখন অন্য কোনও জায়গায় পড়ত। বাবা মারা যাওয়ার পর যখন সে মালদা'য় তার কাকার বাড়িতে মাকে নিয়ে গলগ্রহ হয়ে এল তখন থেকেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। সেই জহরের এখন এত বয়েস হয়েছে। জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত খেয়ে মজবুত হয়েছে তার মনটা। মনে আছে, যেদিন আমরা মালদা থেকে চলে আসি, সেদিন তার প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। আমাদের বাড়িতে এসে অনেকক্ষণ বসে-বসে আমার সঙ্গে গল্প করছিল।

সে-সব কথাগুলোও আমার মনে আছে এখনও।

জহর বলেছিল, কলকাতায় গিয়ে আমাকে চিঠি দিবি তো?

আমি বলেছিলাম, নিশ্চয় দেব। তুই উত্তর দিবি তো?

জহর বলেছিল, হ্যাঁ, নিশ্চয় দেব।

কিন্তু ছোটবেলাকার প্রেম, হতেও যেমন, যেতেও তেমনি। মালদা থেকে কলকাতায় এসে আবার নতুন বন্ধু-বান্ধব পেয়ে গেলাম। তাদের সঙ্গে মিশতে-মিশতে মালদার কোন্ এক জহরের কথা মনে পড়তো তো ভাবতাম, তাকে পরের দিনই চিঠি দেব। কিন্তু পরের দিন আর তার কথা মনে মনেই পড়তো না।

জীবনের এইটেই তো মজা। এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে যাওয়া, আর অতীতকে ভুলে নিকট ভবিষ্যতের আশায় অপেক্ষা করে থাকা। এই এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে যাওয়ার পট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই ক্রমে-ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার নামটাই হল জীবন। এই জীবনকে পর্যালোচনা করতে গিয়েই যত গল্প-নাটক-উপন্যাসের সৃষ্টি। এতে এত বৈচিত্র্য যে কোটি-কোটি বছর ধরে লিখলেও তা ফতুর হবে না। ফতুর হবারই নয়।

তাই আমার স্বভাব এই যে যখন যেখানেই যাই, সেখানেই কোনও লোক পেলে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিই। হাজার-হাজার গল্প শুনতে-শুনতে তার মধ্যে থেকে হয়তো একটা চরিত্র বা কাহিনী পেয়ে গেলাম। আর তাতেই আমার কাজ হয়ে যেত।

এতকাল এই করেই তো আমার চলছে। কিন্তু এতদিন পরে যে জহরের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে, এও নিশ্চয় ঈশ্বরের বিধান। নইলে এই সময়ে দেখা না হলেই তো হতো।

এখন আমারও বয়েস হয়েছে, জহরেরও বয়েস হয়েছে। সে এখন এ্যাডভোকেট। বলতে গেলে একজন নামজাদা এ্যাডভোকেট সে। বিয়ে হয়েছে, ছেলে-মেয়ে হয়েছে, বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে। যা-যা হলে মানুষ নিজেকে সার্থক হয়েছে বলে মনে করে, তার সব কিছুই তার হয়েছে। মক্কেলও তার যেমন প্রচুর, আয়ও তেমনি প্রচুর। এখন শনিবার দিনটা কেবল তার ছুটি। সেইদিন কোর্ট-মক্কেল সবকিছু থেকে পালিয়ে সে অজ্ঞাতবাস করে আমার বাড়িতে এসে।

জহর বলে, আমি ঠিক করেছি ভাই, যে এই একটা দিন সবকিছু থেকে আমি ছুটি নেব। এই একটা দিন আমি কোর্টের কথা ভাবব না, টাকার কথাও ভাবব না। আমি শনিবার দিনটা শুধু বিশ্রাম নেব। শনিবার দিনটা আমি এমন লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করব, যারা মক্কেল নয়, জর্জ নয় উকিল নয়, যারা শুধু মানুষ, মক্কেল-জর্জ-উকিল ছাড়া অন্য কিছু যাদের প্রফেশন।

জহর বলত, অভাব আমি অনেক দেখেছি, স্বচ্ছলতাও আমি অনেক দেখলাম। শুধু আমার ব্যাপারেই নয়, আমার মক্কেলদের ব্যাপারেও দেখলাম যে বেশি টাকা যাদের নেই, যারা সামান্য দিন আনে দিন খায়, তারাই সুখী। বিশেষ করে যারা ভাড়াটে।

জহর আরো বলত, কিন্তু সেটা কি আমার ইচ্ছের অধীনে? ঝঞ্ঝাট যেমন আসে মানুষের জীবনে, তেমনি শান্তিও আসে। কিন্তু দু'টোই ক্ষণস্থায়ী। ঝঞ্ঝাটের সময় মনে হয় এ বুঝি আর কাটবে না, আবার শান্তির সময়ে মনে হয়, এই শান্তি বুঝি চিরস্থায়ী। কিন্তু ঝঞ্ঝাট আর শান্তি দেবার যিনি মালিক, তিনি বোধহয় তা জানতে পেরে মনে-মনে হাসেন। তাই তিনি কখন যে কাকে কি দেবেন, তা আগে থেকে কেউ কিছু বলতে পারেন না। বিপদে পড়লেই তাই আমরা ভগবানকে ডাকি আর শান্তির সময়ে আমরা অহঙ্কারে আত্মহারা হয়ে যাই। আমরা ভাই আসলে সবাই বুদ্ধিমান। কেউ ভক্তিমান নই। যখন ঠাকুরকে পাঁচসিকে প্রণামী দিই, তখন ভাবি পাঁচসিকে পূজো দিয়ে কিভাবে পাঁচ হাজার টাকা লাভ করব। এটা হল বুদ্ধিমানের পূজো। কত লগ্নী করে কতগুণ মুনাফা হল? কিন্তু ভক্তিমানের পূজো! সে অন্য রকম। ঠাকুরকে পূজোর জন্যেই পুজো করা—তাতে লাভ-লোকসান হলো, তা ভাববার বালাই নেই।

জহর উকিল মানুষ। কথা বেচা তার কাজ। তাই আমার সঙ্গেও যখন

সে কথা বলে, তখনও সে ভাবে আমি যেন জর্জ বা ম্যাজিস্ট্রেট। তাই আমি তাকে বাধা দিই না। যখন তার বক্তৃতা চলছে তখন আমি বাধা দিয়ে বললাম, এ তো ভাই তোমার গল্প হচ্ছে না, এ তো ভাই উপদেশ শোনানো হচ্ছে।

জহর বললে, মনে করে দিয়ে তুমি ঠিকই করেছ ভাই। আমি তো তোমাদের সাহিত্য-টাহিত্য বুঝি না, তাই যা মনে আসে, সেইটেই বলে যাই।

বললাম, এখন এ-সব তো হল, সেদিন সেই ঘটনার পর কী হল,তাই বল?

জহর বলতে লাগল—এখন তো ভাই আমাদের বয়েস হয়েছে, তাই সুযোগ পেলেই পুরনো কথা বলতে ইচ্ছে করে। লোক পেলেই তাই ছোটবেলার কথা বলতে শুরু করে দিই। তা তুমি যখন কালকে বললে যে, তুমি ভেবে পাচ্ছ না যে কী নিয়ে লিখবে, তখন আমি বাড়িতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলাম। অন্য দিন ঘুম আসবার আগে কেবল ইনকামট্যাক্স আর অক্কেলের কথা ভাবি। কিন্তু কাল ভাবতে লাগলাম তোমার গল্পের কথা। আর সমস্ত জীবনটাই ভাবতে শুরু করলাম। আগে কী আমি ছিলাম, আর এখন কী আমি হয়েছি।

সত্যি ভাই, একদিন আমি একটু বেশি ভাত খেয়েছিলাম বলে আমার কাকীমা আমাকে খুব কথা শুনিয়েছিলেন, সেদিন আমার খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আর এখন আমার বাড়িতে চারজন বাইরের লোক খায়। এ সব কোথা থেকে হলো? কে এ সব করালে?

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ ভাই ছোটবেলাকার সেই ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। সেই যে ঘটনাটা আমি একটু আগে তোমাকে বললাম। কিন্তু সেদিনকার আমার অবস্থাটা তুমি বোঝ। আমি লজ্জায় ভাই সেদিন বাড়ি ফিরব কেমন করে বুঝতে পারছিলাম না।

যখন মনের এই রকম অবস্থায় বাড়ির সামনে এলাম তখন চেয়ে দেখলাম, বাড়ির সদর দরজায় যেমন তালা দিয়ে গিয়েছিলাম তেমনি তালা বন্ধই রয়েছে। কোথাও কেউ নেই, কেউ টেরও পায়নি। জানাজানি হয়ে গেলে হয়তো খুবই বকুনি খেতাম। কিন্তু ভাগ্য ভাল যে কেউ টের পায় নি। কিন্তু জানাজানি হয়ে গেল ঠিক পরদিনই।

মা কিন্তু দেখতে পেয়েছে ঠিক। আমি তখন খাচ্ছি। হঠাৎ মা বললে, হ্যাঁ রে, তোর আংটিটা কোথায় গেল?

আমি কী বলব, কী জবাব দেব, বুঝতে পারলাম না।

শেষকালে মিথ্যে কথা বললাম, হারিয়ে গিয়েছে মা।

মা রেগে উঠল—আংটি হারিয়ে গেল! তোর পৈতের সময়ে কত টাকা খরচ করে অত ভাল আংটিটা গড়িয়ে দিলাম, আর তুই কিনা সেটা হারিয়ে ফেললি?

আমি বললাম, মা তুমি রাগ করো না, আমি দোষ করে ফেলেছি, এবার থেকে সাবধান হবো।

কাকীমার বাড়িতে মা আমাকে বেশি জোর করেও বকাবকি করতে পারছে না। কারণ কাকীমা টের পেলে আরো অনর্থ বকাবকি করবে।

মা গলা নামিয়ে বলতে লাগল, আমি তখনই বলেছিলাম ও-আংটি তুই পরিস নি, বড় হয়ে পরবি, তা আমার কথা তো তুই শুনলি না, এখন তুই বোঝ। আমার আর কী? আর কি কখনও অমন আংটি গড়িয়ে দিতে পারব? আমার কি কখনও তেমন অবস্থা হবে?

মা'র গালাগালি আমি সব চুপ করে হজম করে নিলাম। কিছু বলবার আর মুখ রইল না আমার। আর তারপর আস্তে-আস্তে সবই সহ্য হয়ে গেল। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে জীবনে আর কখনও বিলাসিতা করব না।

আংটিটা অবশ্য দেখতে খুব ভাল ছিল। সেকালে ওইটার জন্যে স্যাকরা খুব দামও নিয়েছিল শুনেছি।

কিন্তু সেই ব্ল্যাকমেলের ঘটনাটা ভাই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলে। ওই ঘটনাটা না ঘটলে হয়তো আমি আজ যা হয়েছি, তা হতে পারতাম না। সেই যে সামান্য একটা আংটি চুরি হয়ে গেল, তার পরদিন থেকে আমি অন্য মানুষ হয়ে গেলাম। আমার দৃষ্টি বদলে গেল। আমি নূতন করে জগৎকে দেখতে শুরু করলাম। সামান্য একটা আংটি আমাকে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে গেল ভাই।

এর পর অনেক বছর কেটে গেছে। ঝড়ের মতই কেটে গেছে বলতে গেলে। কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল, আমি কিছুই জানতে পারিনি ভাই। তার মধ্যে আমার মা'র মৃত্যুটা ছিল তৃতীয় দুর্ঘটনা।

আমার সেই আংটি হারানোর দুঃখ মা'র আর জীবন পর্যন্ত যায় নি। টাকার জন্যে ঠিক নয়, ওইটে আমার বাবার প্রথম আর শেষ উপহার। আমার বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাই মারা যাবার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা অনাথ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাবার শেষ স্মৃতি ওই আংটিটা।

সেই আংটিটা ভাই খুব ভাল ছিল। ভাল বলতে বলছি খুব দামী। অনেকখানি সোনা যেমন ছিল, তেমনি তার ওপরে মিনের জমি। সেই মিনের জমির ওপরে একটি সুন্দর 'জে' অক্ষর লেখা। আমার পৈতের সময় বাবা ওই আংটিটা আদর করে আমাকে দিয়েছিলেন। আর আমি এমন পাষণ্ড যে সেই আংটিটাই কিনা হারিয়ে ফেললাম।

মা শেষ জীবনে অসুখে বিছানায় শুয়ে থেকেও কেবল সেই আংটিটার কথা বলত। আমার স্ত্রীকে বলত—বউমা, জহরের হাতে কিছু টাকাপয়সা দিও না, ওর বড় হারানো স্বভাব আছে। ওর আঙুলে একটা আধ ভরির

আংটি গড়িয়ে দিয়েছিলাম ওর পৈতের সময়, সেটা পর্যন্ত হারিয়ে ফেললে। ও বড় আখ্‌খুটে ছেলে, সব জিনিস কেবল হারাবে।

আমি তখন কত বড় হয়ে গিয়েছি, উকিল হয়ে আমার খুব পসার হয়েছে, কলকাতা শহরে বাড়ি করেছি, তবুও মা'র চোখে আমি সেই তখনও শিশু ছিলাম। মা'র চোখে আমি আর কখনও বড় হলাম না।

আমার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করত, হ্যাঁ-গো, তুমি নাকি ছোটবেলায় তোমার পৈতের আধ ভরি সোনার আংটিটা হারিয়ে ফেলেছিলে ?

আমি প্রশ্নটা শুনে হাসতাম।

জিজ্ঞেস করতাম, তাহ'লে মা তোমাকেও কথাটা বলেছে ?

স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, সেটা নাকি মিনে করা আংটি ছিল, আর তাতে তোমার নামের প্রথম অক্ষরটা লেখা ছিল ?

অথচ মা জানত যে তখন ও-রকম একশোটা আংটি কেনবার অবস্থা আমার হয়েছিল। কিন্তু সামান্য আধ ভরি সোনার আংটির শোক মা শেষ জীবন পর্যন্ত ভুলতে পারে নি।

এখনও আমার দুঃখ মা'র কথা ভেবে। দুঃখ-কষ্ট করে আমাকে মানুষ করার পেছনে মা'র যে আনন্দ হবার কথা, তা হয় নি ভাই। আমার যখন ভাল অবস্থা হল মা-ও তখন অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। সেই বিছানায় শুয়ে-শুয়েই মা স্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করত—আজ কি মাছ এসেছে বাজার থেকে বউমা ?

স্ত্রী বলত মাছের নাম। কোনও দিন ইলিশ, কোন দিন গল্‌দা চিংড়ি, কোনও দিন আবার রুই মাছ। ইলিশ মাছ বাজার থেকে এসেছে শুনলেই মা আমার স্ত্রীকে মাছ কি রকম করে রাঁধতে হবে, শিখিয়ে দিত।

মা বলত, ইলিশ মাছটা ভেজো না বৌমা, বুঝলে ? ইলিশ মাছ ভাজলে নষ্ট হয়ে যায়, জহর ভাপে রান্না ইলিশ মাছ খেতে ভালবাসে। ইলিশ মাছ একটা মুখ ঢাকা কৌটোর মধ্যে পুরে ভাতের মধ্যে ছেড়ে দেবে। তোমার ভাতও সেদ্ধ হবে, আবার মাছটাও ভাপে সেদ্ধ হবে।

তারপর···

মা বিধবা মানুষ, মাছ খেত না। কিন্তু আমি মাছ খেতে ভালবাসি, সেই জন্যে স্ত্রীকে তাই শিখিয়ে দিত। আর শুধু কি মাছ ?

একদিন আবার জিজ্ঞেস করত, হ্যাঁ বউমা, আজ কি-কি বাজার এসেছে ?

আমার স্ত্রী পরপর তালিকাটা বলে যেত। আলু, পটল, ঢ্যাঁড়স ইত্যাদি।

মা বলত, বউমা, কিছু মনে করো না তুমি, তোমাদের বাজার করাটা বাপু ভাল নয়। রোজই শুনছি সেই একই বাজার। কেন, বাজারে কি আর কিছু জিনিস নেই ? রোজ কেবল সেই এক থোড-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড

আমি কি খেতে ভালবাসি, মা'র তা মুখস্থ ছিল। সকাল বেলা বাজারে যাবার আগে মা বলে দিত সেদিন কি রান্না হবে না হবে। অথচ মা নিজে খেত শুধু সাবু আর বার্লি। ওই সাবু আর বার্লি খেয়ে-খেয়ে মা'র অরুচি হয়ে গিয়েছিল শেষকালটায়। মুখে কিছুই দিতে পারত না, মুখে দিলেই সব বমি হয়ে যেত।

আমি প্রতিদিনই কোর্ট থেকে এসে বাড়ির ভেতরে মাকে দেখতে যেতাম।

পাশে বসে মাকে জিজ্ঞেস করতাম, আজ কেমন আছো মা?

আমাকে দেখেই মা বলত, ওরে, বউমা একেবারে কিছুই রান্না করতে পারে না রে জহর!

আমি বলতাম, কেন মা, তোমার বৌমা তো ভালই রান্না করে।

মা বলত, ছাই, ছাই রান্না করে। আজকে শুনলাম নাকি ছোলার ডাল রান্না করেছে। শুনে জিজ্ঞেস করলাম, ছোলার ডাল যে রেঁধেছো, তাতে কী দিলে? আমি শুনে অবাক রে! বউমা ছোলার ডালও রাঁধতে জানে না। ছোলার ডালে নারকেল কুঁচো আর তেজপাতা দিতে হয়, তাও বউমা জানে না। আমি তখনই বললাম, দেখো বউমা, জহর ও ও-ছোলার ডাল মুখে দিতে পারবে না!

আমি বললাম, হ্যাঁ মা, ঠিক বলেছ, আমি ও-ডাল মুখেই দিই নি আজ।

মা বলত, মুখে দিতে পারবি কী করে? বউমা যখনই বলেছে, তখনই আমি বুঝেছি ও-ডাল মুখে দেবে না···

বউমা রান্না সম্বন্ধে অপটু, তা শুনলে মা খুব খুশি হত। তার পর দুঃখ করে বলত, আমার শরীরও এই সময়ে এমন হলো যে তোকে আমি নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে পারছি না।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলতাম, তাতে কী হয়েছে, তুমি যখন ভাল হয়ে উঠবে তখন আবার আমাকে রান্না করে খাওয়াবে। এখন দু'দিন একটু কষ্ট না হয় করলাম।

মা বলত, আর কি আমি ভাল হব রে! আবার তোকে রান্না করে খাওয়াতে তো আমার ভালই লাগে, কিন্তু ভগবান যে আমায় মেরে রেখেছে। আমি কী করব বল?

আমি মা'কে সান্ত্বনা দিতাম, আর মা'র রান্নার খুব প্রশংসা করতাম। সে-সব শুনে মা কিছুক্ষণের জন্যে অন্ততঃ শান্তি পেত।

আমার জন্যে মা'র যে কত দুশ্চিন্তা ছিল, তা মা'র শেষ জীবনে আমি অনেক প্রমাণ পেয়েছিলাম। মা বরাবর দুঃখ করত যে নাতির বিয়েটা মা দেখে যেতে পারলে না। আমার ছেলে তখন ডাক্তারী পড়ছে। নাতবউয়ের মুখ না দেখে মারা যাওয়া মা'র কাছে ছিল বড় কষ্টের।

মা তাই দুঃখ করত—জ্যোতির বউ আমি আর দেখে যেতে পারলাম না, এইটেই আমার দুঃখ রয়ে গেল।

জ্যোতি জন্মাবার পর থেকে সে তার ঠাকুরমার কাছেই থাকত। মা'র তখন স্বাস্থ্য ভাল ছিল। এক হাতে রান্না, আর এক হাতে নাতিকে দেখা-শোনা। তবু মা'কে কখনও ক্লান্ত হতে দেখিনি। আগে মা নিজের দেওরের বাড়িতে খেটেছে, আবার সংসারেরও ঠিক তেমনি মুখ বুঁজে খেটে যেত। অথচ আমার বাড়িতে ঠাকুর-চাকর-ঝি কোনও কিছুরই অভাব ছিল না।

আমি বলতাম, মা, তুমি একটু বিশ্রাম করো না, এখন আমার অবস্থা ভাল হয়েছে, কাজ করবার জন্যে তো যথেষ্ট লোক রেখেছি, এখন তুমি একটু বিশ্রাম নাও না।

মা বলত, লোক রেখে তো আমার ভারী উপকার হয়েছে, কেবল মাইনে খাওয়ার লোভ সকলের, কাজের বেলা অষ্টরম্ভা। আমি যেদিকে দেখব না, সেই দিকে চিত্তির।

আমি বলতাম, ওদের দেখা-শোনা করার জন্যে তো তোমার বউমা রয়েছে, সে-ই দেখছে। তোমার এখন বয়েস হয়েছে, পূজা-অর্চনা নিয়ে থাকলেই পারো।

মা বলে, বউমা এ-কালের মেয়ে, ভেজাল খেয়ে মানুষ। বউমা কী করে এতগুলো লোককে দেখা-শোনা করবে? আমরা সেকালের খাঁটি দুধ, খাঁটি তেল-ঘি খেয়েছি, অত সহজে আমাদের শরীর খারাপ হয় না। তুই লোকজন সব ছাড়িয়ে দ্যাখ্, দেখবি আমি একলা সংসারের সব দিক এক হাতে সামলাব।

ফলে যা-হবার তাই হলো। মা একদিন শুয়ে পড়ল। অত পরিশ্রম সহ্য হবে কেন? সংসারের অন্য সকলকে দেখতে গিয়ে নিজের দিকটা একেবারে নজর দেয়নি। অবেলায় খেয়েছে। অত্যাচার করেছে প্রচুর। পাছে চাল নষ্ট হয়, তাই আগের দিনের ভাত-জল দিয়ে ভিজিয়ে পরের দিন খেয়েছে। তার ওপর এক বেলা উপোস। বার-তিথি, একাদশী-পূর্ণিমা সব মেনেছে। আর বিছানায় শুয়েই কি নিশ্চিন্ত থেকেছে? ডালে কি ফোড়ন দিতে হবে তাও বলে দিয়েছে ঠাকুরকে, তেমনি আবার রাত্তিরে সদর দরজায় তালা লাগানো হয়েছে কিনা, তাও খবরদারি করেছে।

আজ মনে হয়, মা যদি এখন বেঁচে থাকত, তাহ'লে বোধহয় আমার সংসারে খরচ এত বাড়ত না। আসলে মা'ই ছিল আমার জীবনে লক্ষ্মী। যেদিন থেকে মা চলে গেছে, সেইদিন থেকেই আমার সংসারে অলক্ষ্মী ঢুকেছে।

এতক্ষণ গল্প শুনছিলাম জহরের মুখ থেকে। বললাম, কেন, তোমার সংসারে আবার অলক্ষ্মী ঢুকল কী করে?

জহর বললে, সেই কথা বলতেই তো এত সাতকাণ্ড ভূমিকা ফাঁদছি হে! আগে গোড়ার ভিত্‌টা পাকা না করলে, সাত-তলা বাড়ি তুলব কী করে?

আমি বললাম, পূজা সংখ্যার উপন্যাস, বুঝতেই তো পারছ। ভিত্ বেশি পাকা করতে গেলে অনেক সময় নেবে, পাঠক-পাঠিকা তাতে অধৈর্য হয়ে উঠবে। আমাদের দেশের পাঠক-পাঠিকাদের তো জানো তুমি, তারা গল্পের শেষে কী ঘটবে, সেইটেই আগে-ভাগে জানতে চায়।

জহর বললে, আমি ভাই সে-সব জানি না। আমি উকিল এ্যাডভোকেট মানুষ, আমি শুধু এই জানি যে কেসটা ষ্ট্রং করতে গেলে তার এভিডেন্সগুলো ষ্ট্রং করতে হয়—আমার মা'র কথা এত বিশদ করে এই জন্যেই বলছি যে ওই আংটি হারাবার পর থেকে মা তার দুঃখ কিছুতেই ভুলতে পারেনি। যখন বড় হলাম, তখন ও-আংটিটা আর আমার হাতে আঙুল ঢুকত না। আমি ওটা আর তার পরতাম না। মা বলেছিল যে, পৈতের আংটি খুলতে নেই। তাই একটা স্যাকরা ডেকে আরো বড় করে দিয়েছিল যাতে আমি আঙুলে পরতে পারি। আগেকার আংটির চেয়ে এ আংটিটা দেখতে আরো ভালো হল, আরো দামী।

তারপর মা'র পীড়াপীড়িতে আমার ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে পাত্রীর সন্ধান করতে লাগলাম।

ছেলের বিয়ে করতে ততো ইচ্ছে ছিল না। কারণ তখনও সে ছাত্র। কিন্তু ঠাকুরমার ইচ্ছে পূরণ করতে গেলে বিয়ে করা ছাড়া উপায় নেই।

ডাক্তারী পড়া ছাত্রের মত পাত্র যে আজকালকার বাজারে কত লোভনীয়, তা তুমি নিশ্চয় জান। আমার ছেলে তাই-ই। তার ওপর স্বভাব-চরিত্র, স্বাস্থ্য সব দিক দিয়েই মেয়ের অভিভাবকদের কাম্য।

আমিও ছেলের জন্যে মেয়ে দেখে বেড়াতে লাগলাম। পাত্রী পছন্দের ব্যাপারে একটা জিনিসের ওপরেই আমার লক্ষ্য ছিল, সেটা হল সৎ বংশ আর পাত্রীর স্বাস্থ্য আর রূপ। যৌতুক সম্বন্ধে আমার কোনও দাবি-দাবা ছিল না।

এমনি করে প্রায় শ'খানেক পাত্রী দেখার পর শেষ পর্যন্ত একটি পাত্রী পছন্দ হয়ে গেল, ঠিক যেমনটি আমার পছন্দ। প্রথম বংশ। কলকাতার সবচেয়ে অভিজাত আর বনেদী পাড়া হল জোড়াসাঁকো। সেইখানেই তাদের সাত-পুরুষের বাস। পাত্রীর বাবা নেই। বিধবা মা আছে। তার একমাত্র মেয়ে! বিরাট সম্পত্তির মালিক। মা মারা যাবার পর ওই সম্পত্তির মালিক হবে জামাই।

এই রকম সব লোভ দেখালে আমাকে ঘটক।

আমি উকিলমানুষ, ও-লোভে আমি ভুলিনি। কারণ আমি আমার পেশার সূত্রে উত্থান যেমন দেখেছি, পতনও দেখেছি তেমনি। সম্পত্তির সরিকি-ঝগড়াতে কত বংশকে ধ্বংস হয়ে যেতে যেমন দেখেছি, তেমনি কত

বিত্তবান মানুষকে তার অতুল ঐশ্বর্য একটি সইতে রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে দিয়ে ফতুর হতেও দেখেছি।

তাই সম্পত্তির লোভে আমাকে কাবু করতে পারলে না ঘটকরা।

বংশ, স্বাস্থ্য আর রূপ এই তিনটেই ছিল আমার পছন্দের ইয়াডস্টিক বা মানদণ্ড। বংশ ভাল মেলে তো স্বাস্থ্য মেলে না, আর বংশ এবং স্বাস্থ্য দুই মেলে, তো রূপ মেলে না।

মা ছটফট করত। আমি পাত্র দেখে বাড়িতে এলেই প্রথমে আমাকে মা'র কাছে যেতে হত। গিয়ে বলতে হতো কেমন পাত্রী দেখে এলাম। মা না শুনে কিছুতেই ছাড়বে না।

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করবে কী-রকম পাত্রী, পাত্রীর কে-কে আছে। এমন কি তারা কী খাওয়ালে, কুটুম কেমন, এমনি নানা কথা মা'কে সবিস্তারে বলতে হবে। মাকে না বলে জীবনে আমি কোনও কাজ করিনি। তার ওপর নাতির কত সাধের বিয়ে। মা'র যদি দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকত তো আমাকে কিছুই করতে হতো না, মা একলাই সব দিক সামলাত। কিন্তু মা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ মা'র অনুমতি না নিয়ে আমি কিছুই করতে পারি না। সব শুনে মা একসময় বলত, না রে জহর, তুই এখানে ছেলের বিয়ে দিস্ নি।

আমি অবাক হয়ে যেতাম। বলতাম, কেন মা ?

মা বলত, শুধু চা খাইয়ে তোকে ফেরত দিলে, এ-সব বাড়িতে আমি নাতির বিয়ে দেব না।

মা'র অনেক বাতিক ছিল। আমার জন্মের কিছুদিন পরেই মা বিধবা হয়েছে। পরের বাড়ির রান্না করে আমাকে মানুষ করেছে, এই কষ্ট পেয়েই মা জানত কাকে বলে ভদ্রতা, কাকে বলে বনেদিয়ানা, কাকে বলে কুটুম্বিতা।

মা-র যখন আপত্তি, তখন সেখানে সম্বন্ধ করা সম্ভব হল না। শুধু চা খাইয়ে যারা ভাবী কুটুমকে আপ্যায়ন করে, তারা যে বনেদী বংশের লোক নয়, তা মা'কে বলে দিতে হত না।

শেষকালে সেই জোড়াসাঁকোর বনেদী বাড়িতেই সম্বন্ধটা পাকা করলাম। মা-ও বললে, রূপোর রেকাবিতে করে সন্দেশ দিয়েছে, ঘোলের সরবৎ খাইয়েছে, এ-ঘটনা মা'র কাছে বনেদীয়ানার নজির।

মা আরো বললে, মেয়ের মাথায় চুল কেমন ? খুলে দেখে'ছিস তো ?

আমি বললাম, হ্যাঁ মা, আমাকে বলতে হয়নি, ওরা নিজেরাই খোঁপা খুলে দেখিয়ে দিলে, আজকালকার ঝুটো খোঁপা নয়, একেবারে কোমর পর্যন্ত চুল।

শুনে খুশী হল মা। তারপর জিজ্ঞেস করলে, আর পায়ের আঙুল ? ফাঁক-ফাঁক না লাগা-লাগা ?

বললাম, লাগা-লাগা।

মা আবার জিজ্ঞেস করলে, আর গড়ন-পিটন ?

আমি বললাম, সে তো আমি তোমাকে বলেইছি মা, সেদিক দিয়ে কোনও খুঁত নেই।

শেষ পর্যন্ত মা যখন সম্মতি দিলে তখন আর দেরি করলাম না। ওখানেই পাকা কথা দিলাম।

একদিন ঘটা করে আমার ছেলের বিয়ে হয়ে গেল। তখনকার দিনে খাওয়ানোর জন্যে তো কোনও বাঁধাবাঁধি ছিল না। বরযাত্রীরা খেয়ে সহাস্যমুখে প্রশংসা করলে। আর তারপর আমরা বউ-ভাতের দিনও খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছিলাম, আত্মীয়-স্বজন সবাই তারও খুব প্রশংসা করলে।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। বিশেষ করে মা যখন তার নাতবউকে দেখে খুশী হয়েছে, তখন আমার কিছু বলবার রইল না।

* * *

জহর গল্পটা থামতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ-কি, এখনও তোমার ভূমিকা চলছে নাকি ? পাঠক-পাঠিকা যে অধৈর্য হয়ে উঠছে।

জহর বললে, ভাই ওসব তুমি লেখাবার সময়ে ঠিক করে নিও। আমি তো লেখক নই, আমি শুধু তোমাকে গল্পের কাঁচা মাল জুগিয়ে যাচ্ছি। তুমি এর মধ্যে তোমার দরকার মত মাল-মশলা ঢুকিয়ে নিও।

আমি বললাম, যা-হোক, সে আমার ব্যাপার, আমি বুঝব। শুধু দেখবে শেষকালে যেন ক্লাইমেক্স ঠিক থাকে। সেখানেই গল্প-লেখকের কেরামতি।

জহর বললে, সে হয়তো আছে, হয়তো নেই। আমি শুধু যা ঘটেছিল, তাই ঠিক-ঠিক বলে যাচ্ছি কোথাও এতটুকু বাড়াবও না। একটু আগেই বলেছি যে আমার ছেলের বিয়ে হয়ে গেল। আমি সেই বিয়ের পরই আবার নিজের ওকালতির কাজে জড়িয়ে গেলুম। আমি নতুন বৌকে বলে দিলাম—বউমা, তোমায় সংসারের কাজ কিছু দেখতে হবে না। তুমি শুধু আমার মা-কে একটু সেবা করবে, আর কিছু তোমায় করতে হবে না।

কিন্তু আমি যখন ভাবলাম যে এইবার আমার জীবনে পরম সুখ পেলাম, তখন বোধহয় আকাশের আড়ালে অদৃশ্য যে-দেবতা থাকেন, তিনি একটু হাসলেন।

গল্প শুনতে শুনতে আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন, ভগবানের কথা বলছো ? ভগবান হাসলেন কেন ?

জহর বললে, হাসলেন এই ভেবে যে মানুষ কত আশাবাদী। দেখ আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে 'আশায় বাঁচে চাষা'। এ-কথাটা শুধু চাষীদের বেলাতেই যে সত্যি তা নয়, সমস্ত মানুষের বেলাতেই সত্যি। হিটলার যদি জানতেন যে শেষে তাঁর ওই মর্মান্তিক পরিণতি হবে, তিনি শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যাবেন, তাহ'লে কি লেখাপড়া শিখতেন, না কাব্য-সাধনা করতেন? সম্রাট সাজাহান যদি জানতেন যে, ছেলেরা শেষ জীবনে তাঁকে দুর্গের মধ্যে বন্দী করে রাখেব তাহ'লে কি তিনি বিয়ে করতেন? নেপোলিয়ন যদি জানতেন যে, তাঁকে শেষজীবনে সেণ্ট্ হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করতে হবে তাহ'লে কি তিনি ফ্রান্সের সিংহাসনে বসতেন? আর আমিও যদি জানতুম যে, আমার পুত্রবধূ এসেই আমার জীবন বিষময় করে দেবে, তাহ'লে কি আমি ছেলের বিয়ে দিতুম ওখানে ওই পাত্রীর সঙ্গে?

আমার বেয়ান বিধবা হলেও অনেক বিষয়-সম্পত্তির মালিক। আমি জানতুম যে বিধবা বেয়ানের মৃত্যুর পর একদিন আমার ছেলেই তাঁর সব সম্পত্তির মালিক হবে। তা সম্পত্তির লোভ আমার নেই। আমি যে লোভী মানুষ নই, তা আমি বলছি না। আমারও লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ-মাৎসর্য সবই আছে।

কিন্তু ধর্মের লোভ কি খারাপ? সততার লোভ কি খারাপ? পুণ্যের লোভ কি খারাপ? আমার ভাই, সেই লোভ আছে। আমার ভাই সুনামের লোভ আছে। ছেলের বিয়ে দিয়ে আমি চেয়েছিলাম যে আমার সুনাম হোক। তা সেই সুনামেই আমার আঘাত লাগল।

আমার ছেলের বিয়ে দেবার পর থেকে বাড়িতে এসে শুনতে পেতাম যে ছেলের শাশুড়ি নাকি এসেছিল তার মেয়েকে দেখতে।

ছেলে শাশুড়ি এসেছে বাড়িতে, সুতরাং বাড়ীর সবাই তটস্থ।

বড়লোক কুটুম, তা সত্বেও যখন মেয়ের বিয়ে দিয়েছে তখন মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাতে হবে। একমাত্র কন্যা, তাকে ছেড়ে থাকতে যে কত কষ্ট হয়, তা সবাই বুঝতে পারে।

বউমার মা কিন্তু প্রথমেই মা-র কাছে এসে বসে। পাশে বসে জিজ্ঞেস করে—মা, কেমন আছেন আজকে?

মা-ও খুব খুশী। নাতির শাশুড়ি যে এমন হতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারে নি মা।

মা-র কাছে আমি যেতেই মা বলতো, জানিস্ জহর, বউমার মা এসেছিল আজকে। আমার কাছে বসে-বসে অনেক কথা বললে। অত বড়লোকের বউ অথচ এতটুকু দেমাক নেই তার।

মা খুশী হলেই আমি খুশী হতুম। মা সারা জীবন দুঃখ কষ্টে কাটিয়েছে। শেষ-জীবনে নাতবউয়ের মুখ দেখবার সাধ ছিল, তাও মিটেছে। তারপরে কুটুম এত ভাল হবে, তাও কল্পনা করতে পারেনি মা। সেই সাধও মা-র মিটল। এসব দেখে আমারও ভাই খুব আনন্দ হল। আমার জীবনে মা-ই সব। মাঝে-মাঝে আবার বউমার মা ভাল কিছু রান্না রেঁধে নিয়ে আসত আমার মা-র জন্যে।

সে কথা আবার আমার মা আমাকে বলত। বলে আমার স্ত্রীকে আবার বলত, বউমা, তুমি এই রকম রান্না রাঁধতে পার না? এই রান্নাই জহর খেতে ভালবাসে বউমা, আহা আমার যদি আজকে গতর থাকত, তো জহরের এত কষ্ট হত? জহর সারাদিন খেটে-খেটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা উপায় করছে, আর তাকে দেখবারই কেউ নেই,—আমায় চোখ দিয়ে এও দেখতে হচ্ছে!

সমস্ত যখন এই ভাবেই চলছে, তখন হঠাৎ খবর এল বউমার মায়ের নাকি খুব অসুখ। বউমাকে নিয়ে আমার ছেলে শাশুড়ীকে দেখতে গেল। ছেলে বউমাকে সেখানে মা'র কাছে রেখে বাড়িতে আসতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোর শাশুড়ি কেমন আছে?

ছেলে বললে, ওষুধ দিয়েছি। এখন একটু ভাল আছেন, কালকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসব। দেখি তিনি কি বলেন?

জিজ্ঞেস করলাম, রোগটা কী?

ছেলে বললে, আমার তো মনে হচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে গাফিলতিতেই এইটে হয়েছে। সপ্তাহের মধ্যে তিন দিনই তো উপোস!

আমি অবাক। জিজ্ঞেস করলাম, উপোস? উপোস করেন নাকি খুব? অত উপোস করেন কেন?

ছেলে বললে, ওই বলে কে? আমি মা'কে অনেক বলেছি, কিন্তু তিনি কেবল বলবেন, আমি বিধবা মানুষ, আর ক'টা দিনই বাঁচব, পূজো-অর্চনা না করলে পরলোকে গিয়ে ভগবানের কাছে আমি কী জবাবদিহি করব বাবা?

ছেলে শাশুড়িকে বলত, তা আপনার জীবনটা বড়ো, না পূজোটা বড়ো মা?

ছেলের শাশুড়ি বলত, ও-কথা বলো না বাবা, ও-কথা বলতে নেই, ঠাকুর-দেবতাকে নিয়ে ও-কথা বলা উচিত নয়, তাতে অমঙ্গল হয়।

আমার ছেলে তবু শাশুড়িকে বোঝাত—মা, এবার থেকে আমি যা ডায়েট-চার্ট করে দেব, আমি সেই অনুযায়ী খাবেন।

জামাইয়ের কথা শাশুড়ি অমান্য করতে সাহস করত না। মুখে বলত, তা শরীরের জন্যে করতেই হবে বাবা, তুমি যখন বলছ, তখন মেনে চলতেই হবে। কিন্তু দু'-একদিন পরেই আবার সব নিয়ম পালটে যেত। হঠাৎ হয়তো বাড়ির পুরুত মশাই এসে হাজির হত।

পুরুত মশাই যা বিধান দিতেন, গিন্নীও তাই-ই করতেন। আমার ছেলের শাশুড়ি ডাক্তারের কথার চেয়ে ঠাকুরমশাইয়ের কথাকে বেশি মূল্য দিতেন। এমন কোনও ব্রত নেই, যা তিনি পালন করতেন না। এমন কোনও পূজো নেই, যা তিনি করতে চাইতেন না। লক্ষ্মী পূজো থেকে শুরু করে মনসাপূজো পর্যন্ত সমস্ত পূজোই তাঁর করা চাই।

বউমা বলত, মা তুমি এত পূজো, এত ব্রত, উপোস করো কেন?

মা বলত, করি কি আমার নিজের জন্যে রে, করি তোদের জন্যে। তোদের ভালোর জন্যেই তো দিন-রাত আমার চিন্তা।

সব শুনে আমার মা বলত, ভালোই তো। অনেক পুণ্যি করে এসেছিল তোমার মা, তাই যেমন ইচ্ছে পূজো-ব্রত সব কিছু করতে পারছে। আর আমার দেখ দিব্যি কপাল, একনাগাড়ে শুয়ে পড়ে আছি তো পড়েই আছি। আর জন্মে যে কত পাপ করেছিলাম, তাই আমার এত ভোগান্তি।

মা-র অসুখ বলে বউমাও সব সময়ে আমাদের বাড়ি থাকতে পারত না। এখানে দু'দিন থেকেই আবার ক'দিনের জন্যে বাপের বাড়িতে চলে যেতো। ছেলে রোজ একবার করে শ্বশুরবাড়িতে যেত আর অনেক রাত্রে এ-বাড়িতে ফিরে আসত। ছেলে বাড়িতে এলেই আমি জিজ্ঞেস করতাম, আজ কেমন আছেন তোমার শাশুড়ি?

ছেলে বলত, কাল ভাল ছিলেন, কিন্তু আজ আবার শরীরটা খারাপ হয়েছে।

—কেন? হঠাৎ আবার শরীর খারাপ হল কেন?

ছেলে বলত, কাল যে একাদশী গেছে—একেবারে নির্জলা উপোস একাদশীর দিনে ওষুধ পর্যন্ত মুখে দেবেন না।

আমি বলতাম, তা একাদশীর খবরটা তাঁকে দেওয়া হয় কেন? কে সে-খবর দেয় তাঁকে?

ছেলে বলত, ওই সব পুরুত আর ঠাকুরমশাইরা। সে একেবারে একগাদা পুরুত আর একগাদা পণ্ডিত। তাদের সকলের মাসোহারা বন্দোবস্ত করা আছে। মাসে-মাসে তারা সব টাকা পায় আর তার সঙ্গে সিধে। কারো পাওনা মাসে পাঁচ সের চাল, কারও আবার তিন সের। কারো দু'বছরে একটা করে কম্বল, আর কাউকে বছরে দু'টো গামছা।

এসব আমার শ্বশুরমশাই বেঁচে থাকতেই।

আমার ছেলের শ্বশুরবাড়িটা ভাই অদ্ভুত। খুব বনেদী বংশ বটে, কিন্তু সব আলাদা-আলাদা হাঁড়ি। এক বাড়িতে সাতাশটা সরিক। সাতাশটা রান্নাঘর। তাই কারো রান্নাঘরে ঠাকুর রান্না করছে, কারো রান্নাঘরে বাড়ির গিন্নী। তাই পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের রেষারেষি আছে। এক বাড়িতে মাংস রান্না হল, তো অন্য বাড়িতে কুঁচো চিংড়ি।

ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করবার সময় অতটা টের পাই নি। নাম করা বংশ। তিন পুরুষ আগে আমার বউমার বাবার ঠাকুর্দা সেকালে রায়বাহাদুর হয়েছিলেন। তাঁর বাবা প্রথমে ওই জোড়াসাঁকোতে বাড়ি করেন। তারপর থেকেই ওই বংশের উন্নতি শুরু হল।

মেয়ে দেখার দিনে পাত্রীর কাকা এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, বড়দা বেশিদিন বাঁচেন নি, তখন থেকে বৌদি ছিলেন, আমাদের কাছেই আছেন। এই মেয়েটি আমার বড়দার একমাত্র সন্তান।

সেইদিনই শুনেছিলাম যে বউমার মা সারাদিন কেবল পুজো-আর্চা নিয়েই থাকেন। কিন্তু সেই পুজো নিয়ে থাকা যে এতখানি, তা-তখন কল্পনা করি নি। ভেবেছিলাম তা হয়। অনেক বাড়িতেই বাড়ির গৃহিণীদের দিন-রাত ঠাকুর-পুজো আর ঠাকুর-সেবা নিয়েই দিন কাটাতে দেখেছি। কিন্তু তারও একটা মাত্রা আছে। তবে বউমার মা-র মতন কাউকে দেখি নি। আমার মা সব শুনে বললে, আমারও একবার তোর বউমার মাকে দেখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু যাই কী করে?

সেবার অনেক কষ্টে মা'কে কোনও রকমে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। আর তখন ডাক্তারে-ডাক্তারে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল বাড়ি। যতক্ষণ তাঁর জ্ঞান ছিল,

ততক্ষণ কেউ একাদশীর দিনে তাঁকে একফোঁটা জলও খাওয়াতে পারে নি, এমনি নিষ্ঠাবতী মহিলা তিনি।

* * *

জহর গল্প বলতে-বলতে এবার থামল। আমি গোড়া থেকে শুনছিলাম। বললাম, এ তুমি ক'টা গল্প বলছ ভাই? তুমি তো গল্প আরম্ভ করলে মালদা'র। এখন বলছো তোমার জোড়াসাঁকোর বেয়াই-বাড়ির গল্প। এর সঙ্গে মালদা'র গল্পের তো কোনো মিল পাচ্ছি না।

জহর বললে, একটা মিল আছেই, নইলে এত কথা বলছি কেন? আমি এ্যাড্‌ভোকেট মানুষ, আবোল-তাবোল কথা বলা ভাই আমাদের লাইনে নিয়ম নেই। জজসাহেব তাহ'লে বলা বন্ধ করে দেবে—আমি যা বলছি, তা শুধু শুনে যাও। তুমি দেখনি, আমাদের পৃথিবীতে পাহাড়-সমুদ্র-মরুভূমি সমস্ত কিছু আপাতঃদৃষ্টিতে কেমন এলোপাথাড়ি। মনে হয় যেন সৃষ্টিকর্তা নিজের খেয়াল-খুশীতে যেখানে যেটা ইচ্ছে এলোপাথাড়ি করে বসিয়ে দিয়েছে, তাই নয়? কিন্তু সেই এলোপাথাড়ি জিনিসগুলোই আবার যখন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে দেখি তখন কি মনে হয় না যে, এই আপাততঃ-এলোপাথাড়ি জিনিসগুলোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে?

আমার এই কাহিনীর মধ্যেও সেই সামঞ্জস্য সেই ঐক্য পাবে, যখন এ-গল্পের শেষটুকু শুনবে! আমি যে এ্যাড্‌ভোকেট, তা-তো প্রথমেই বলেছি। এ্যাড্-ভোকেটরা যখন জর্জের সামনে তার সওয়াল করে, তখন অনেক সময় মনে হয় উকিল বুঝি আবোল-তাবোল বকছে। কিন্তু যখন সওয়াল শেষ হয়' তখন বোঝা যায় যে, সমস্ত আবোল-তাবোলের মধ্যেও একটা স্থির লক্ষ্য ছিল। তখন সমস্ত আবোল-তাবোল কথা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমার এই কাহিনীও ভাই তাই।

ভাগ্যের এমনই এক চক্র যে ছোটবেলা থেকে আমি যা-যা কাজ করেছি, সেই প্রত্যেকটি কাজের এখন ডিভিডেণ্ড পাচ্ছি। ভাল কাজে ভাল ফল পেয়েছি, এবং খারাপ কাজে খারাপ ফল পেয়েছি। এখনও পাচ্ছি। পরকালের জন্যে আমাকে আমাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না। এবং সত্যি কথা বলতে কী, কাউকেই সে অপেক্ষা করতে হয় না।

আমার ছেলের শ্বশুর ছিলেন বড়লোকের ছেলে। বাপের টাকার শেষ নেই, তাই তিনি যাকে সামনে পেতেন নিজের হাতে তাদের সকলেরই মাথা কাটতেন। একবার রেসের মাঠে গিয়ে তিনি এক লাখ টাকার একটা চেক

কেটেছিলেন। রেসের মাঠের ইতিহাসে সেই-ই প্রথম আর সেই-ই শেষ ঘটনা। তারপর থেকেই রেসের মাঠে নিয়ম হয়ে গিয়েছিল, যে এক লাখ টাকার একখানা চেক আর কাটা যাবে না।

বাপ ছিলেন ভারি কড়া। প্রথম-প্রথম ছেলেকে সাবধান করে দিতেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে ছেলে আর শোধরাচ্ছে না, তখন তাকে আর তিনি বাড়িতে ঢুকতে দিলেন না। তাই যতদিন বাপ বেঁচেছিলেন, ততদিন ছেলেও আর বাড়িতে আসেন নি।

একদিন হঠাৎ যখন তিনি খবর পেলেন যে বাবা মারা গেছেন, তখন তিনি বাড়ি এসে হাজির। সঙ্গে নতুন বিয়ে করা স্ত্রী।

কাকা-কাকিমা, খুড়তুতো-জাঠতুতো ভাইরা এসে দাঁড়াল।

মাথা ন্যাড়াও করেননি তিনি, শ্রাদ্ধ করা তো দূরের কথা। বউকে নিয়ে তিনি নিজের ঘরে এসে ঢুকলেন। যাঁরা তার অংশ ভোগ করতে পারবে বলে আশা করেছিলেন, তাঁদের আশায় ছাই পড়ল। তাতে বউমার বাবার কিছু এল গেল না। তিনি নিজের সম্পত্তি আলাদা করে নিলেন মামলা করে। অনেক দিন লাগল সে-মামলার ফয়শ্‌লা হতে। যখন ফয়শ্‌লা হল, তখন নিজের খুশী মতন চলতে লাগলেন।

আমার বউমার কাছ থেকেই ভাই আমি এই সব গল্প শুনেছিলাম। বউমার ঠাকুরদা কোন উইল করে যান নি তাই রক্ষে। তিনি তাঁর ন্যায্য অংশ নিয়ে আলাদা করে ভাইদের বাড়ির দিকে পাঁচিল তুলে দিলেন। সরিকদের মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। জোড়াসাঁকোর গাঙ্গুলী বংশ এইরকম সাতাশটা ভাগে ভাগ হয়ে গেল। কিন্তু বউমার বাবা তাঁর হাল-চাল তখনও বদলালেন না। সেই সময়ে বউমা ওই বাড়িতে জন্মাল। যতদিন ছোট ছিল বউমা, ততদিন কিছু জানতেই পারে নি। তারপর একটু বয়েস হবার সঙ্গে-সঙ্গে দেখতে পেলে তারা অত বড় বাড়িতে আলাদা। অনেকগুলো রান্নাঘর তাদের বাড়িতে। যতগুলো রান্নাঘর ততগুলো হাঁড়ি। বাইরে থেকে তারা এক, কিন্তু—ভেতরে খাবার সময় আলাদা। বউমা আমার কাছে গল্প করত—পাশের বাড়ির ভাই-বোনরা যখন খেত, মা আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলত—ওরা এখন খাচ্ছে, তুমি ওখানে যেও না।

বউমা বলত, কেন মা, ওখানে গেলে কী হয়? মা বলত, ওখানে গেলে তোমাকে হ্যাংলা বলবে, বলবে এ মেয়েটা খেতে পায় না।

এই রকম করে মেয়ে বড় হল। স্কুলে ভর্তি হল। মনে আছে, তখন থেকেই মা কেবল ঠাকুর-দেবতা নিয়েই থাকত। একটা-না-একটা পুজো রোজই বাড়িতে হত। কোনও দিন লক্ষ্মীপুজো, কোনও দিন কালীপুজো, কোনও দিন শিবপুজো। পুজোর আর কামাই ছিল না কোনও দিন। আর প্রায়ই মা উপোস করত।

মেয়ে জিজ্ঞেস করত, কই মা তুমি যে খেলে না? মা বলত, আমার আজকে খেতে নেই, আজকে যে অশোকষষ্ঠী—তা জানো না তুমি?

মেয়ে জিজ্ঞেস করতো, এত পুজো করে কী হয়, এত উপোস করে কী হয় মা? মা বলত, কী আবার হবে, ভালোই হবে। তোমাদের ভালোর জন্যেই তো করি। তোমার ভাল হবে, তোমার বাবার ভাল হবে। তোমাদের দু'জনের ভাল হলে আমারও ভাল হবে।

মাকে জিজ্ঞেস করত, তুমি এত পুজো-টুজো কেন করো মা, আর কারোর মা তো এত পুজো করে না, এত উপোস করে না।

মা বলত, ওরা পুজো না করলে ভগবানই রাগ করবে ওদের ওপর। আর আমি পুজো করি বলে দেখবে তোমার কেমন ভাল হবে।

মেয়ে জিজ্ঞেস করত, আমার কী ভাল হবে মা?

মা বলত, তুমি যখন বড় হবে, তখন দেখবে, তোমার কেমন ভাল বর হবে, কেমন ভাল ছেলে হবে, সমস্ত ভাল হবে তোমার। লক্ষ্মী তোমার ঘরে বাঁধা থাকবে।

মেয়ে শুনত সব। জিজ্ঞেস করত, তোমার মা-ও খুব পুজোআর্চা করত বুঝি? তাই তোমার বুঝি এই বাড়িতে বিয়ে হয়েছে?

মা বলত, হ্যাঁ, তাই তো তোমার মত এমন লক্ষ্মী মেয়ে হয়েছে আমার—তুমি যেমন আমার খুব লক্ষ্মী মেয়ে—বলে মা মেয়েকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেত। আদর করত।

বাবা কিন্তু এসব পছন্দ করত না। বলত, এ ঘরে এসব কী হচ্ছে?

মা বলত, তুমি কিছু মনে করো না, ঠাকুর দেবতার ব্যাপারে তুমি কথা বলতে পারবে না।

বাবা বলত, মিছিমিছি ওই পুরুত-ঠাকুরগুলোকে অত খাইয়ে, টাকা দিয়ে কী লাভ হয় তোমার? ওরা তো বুজরুক।

মা বলত, ছিঃ, ও-কথা বলতে নেই! ঠাকুর রাগ করবে। পুজো করেছি বলেই তোমার মত স্বামী পেয়েছি, মনমত মেয়ে পেয়েছি।

বাবা বলত, এইসব কথা বুঝি ওই বুজরুকগুলো তোমাকে শিখিয়েছে? তুমি তো জান না, ওরা কী সব বস্তু! কেবল ওই সব বলে-বলে তোমার কাছে টাকা মারবার তাল করছে।

আর সত্যিই মা-র সে কী পূজোর ধূম। আর কী সব দান-ধ্যান!

কাউকে অর্থদান, কাউকে স্বর্ণদান, কাউকে ভূমিদান। দান-ধ্যানের শেষ ছিল না মা'র। আর তার সঙ্গে সেবা। মানে ভুরিভোজন। সমস্ত মাসোহারা ব্যবস্থা ছিনু সকলের সঙ্গে। কাউকে মাসে দশ টাকা, কাউকে আবার একশো টাকা। বাবার টাকা ছিল অঢেল। বাবার পৈত্রিক সম্পত্তি তো ছিলই। তার ওপর ঠাকুর্দার কাছ থেকে পাওয়া বাবার অনেকগুলো বাড়ি ভাড়ার দরুণও হাজার-হাজার টাকা আসত। তার সঙ্গে ছিল সোনা-হীরে-মুক্তোর সব গয়না। কত যে গয়না ছিল মা'র, তার হিসেব ছিল না। তাই মা-ও ধর্ম-কর্মের জন্যে দেদার টাকা খরচ করত। সংসারে আপনজন বলতে তো মাত্র তিন-জন। তিন-জনের খাওয়া-পরার জন্যে আর কতই বা খরচ হত। কিন্তু খরচাটা বেশি হত ওই পূজো-হোম আর যজ্ঞের জন্যে।

বাবা যেমন ছিল নাস্তিক, মা ছিল তেমনি ঠিক তার উল্টো। তাই সারা-দিন যে বাবা কোথায় থাকত ঠিক ছিল না। এক-একদিন মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেত মেয়ের। মেয়ে জেগে উঠে অবাক হয়ে দেখত, মা একমনে ঠাকুরের ছবির সামনে বসে-বসে জপ্ করছে।

মেয়ে ডাকত মাকে, মা—

মা আচমকা মেয়ের গলা পেয়ে তার কাছে আসত। বলত, তুমি এখনও ঘুমোওনি মা, এখনও জেগে আছ? ঘুমোও, ঘুমিয়ে পড়, অনেক রাত হয়ে গেছে।

মেয়ে বলত, তুমি কেন জেগে আজ মা? তুমি ঘুমোবে না?

মা বলত, আমার কথা ভেবো না মা, তুমি ঘুমিয়ে পড়। এই আমি তোমার পাশে শুয়ে আছি—বলে মেয়েকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে মেয়ের শুয়ে থাকত। যতক্ষণ না মেয়ের ঘুম আসত, ততক্ষণ শুয়ে থাকত। তারপরে অনেক রাত্রে যখন বাবা আসত, তখন মা ঘরের দরজা খুলে দিত। বাবা মা'কে বলত, কী হল, তুমি এখনও জেগে আছ?

মা বলত, তুমি বাড়ি ফেরোনি, আমি কী করে ঘুমোই? তুমি না ফিরলে কি আমার ঘুম আসে?—বলে মা বাবার খাবার সাজিয়ে দিত।

বলত, খেয়ে নাও তুমি, তোমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছি—

বাবা বেশির ভাগ দিনই বলত, আমি খাব না, আমি খেয়ে এসেছি।

মা বলত, তুমি খাবে না ?

বাবা বলত, তুমি খেয়ে নিয়েছ তো ?

মা বলত, তুমি খাওনি আর আমি তোমার আগে খেয়ে নেব, এ-কথা কী করে ভাবলে তুমি ?

বাবা বলত, তুমি দেখছি মহা মুশকিলে ফেল আমাকে। তুমি বাড়িতে থাক, সময়মত খেয়ে নাও না কেন ? আমি কখন কোথায় থাকি, তার কি ঠিক আছে ?

মা বলত, অন্ততঃ রাত দশটার মধ্যে এলেই পার।

বাবা বলত, তুমি মেয়েমানুষ, সারাদিন বাড়ির মধ্যে থাক, তুমি কী বুঝবে ? আমার কত কাজ, তা জানো ?

মা বলত, কী তোমার এত কাজ ? তোমার যা-কিছু কাজ, তার সবই তো তোমার অফিসের লোকেরা করে।

বাবা বলত, আমার মামলা-মোকদ্দমা নেই ?

মা বলত, সে তোমার উকিল-এ্যাটর্নীরা আছে, তারাই সব করে—সেই জন্যেই তো তারা মাসে-মাসে মোটা মাইনে পায়।

বাবা বলত, উকিল-এ্যাটর্নীর ওপর সব ভার ছেড়ে দিলেই হয়েছে, তারা সব গ্রাস করে ফেলবে। তুমি তো চেনো না তাদের ? তারা এক-একজন রাঘব-বোয়াল একেবারে।

মা বলত, তা সম্পত্তি থাকলেই মামলা-মোকদ্দমা থাকবে।

বাবা বলত, আবার মামলা-মোকদ্দমা না করলে সম্পত্তিও বেহাত হয়ে যাবে। তুমি তো আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের চেনো না। যেদিন থেকে তোমাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছি, সেইদিন থেকেই জ্ঞাতিরা আমার উপর রেগে আগুন। তারা ভেবেছিল, আমি আর কখনও বাড়ি ফিরব না, তারাই সব ভোগ-দখল করবে। আমি যে তাদের বাড়াভাতে ছাই দিয়েছি। রাগ হবে না ?

মা বলত, সম্পত্তির জন্যেই যদি ওদের এত রাগ আমাদের ওপর, তাহ'লে সম্পত্তি ত্যাগ করলেই পার ! এত সম্পত্তি নিয়ে আমাদের কী হবে ? তার চেয়ে বরং সম্পত্তি একটু কম থাকা ভাল, তাতে তোমারও শরীর ভাল থাকবে, আর এত রাত করে তোমাকে বাড়ি ফিরতে হবে না।

একটু থেকে আবার মা জিজ্ঞেস করত, কী খেলে ?

বাবা বলত, কী আর খাব, ওই বড়বাজারের অফিস-পাড়ায় যা পাওয়া যায় সেই-ই খেলাম, ওই কচুরী আর আলুর দম।

মা বলত, ওমা, ওই বিষগুলো তুমি খাও? তাতে যে তোমার অসুখ করবে!

বাবা বলত, তা অসুখ করলে আর কী করব বল, বড়বাজারে ওর থেকে কোন কিছু ভাল খাবার পাওয়া যায় না।

মা বলত, তুমি যদি বলো তাহ'লে আমি না-হয় গুপীকে দিয়ে তোমার গদীতে খাবার পাঠিয়ে দিতে পারি।

বাবা বলত, তুমি তো খাবার পাঠাবে, কিন্তু খাবে কে?

—কেন, তুমি খাবে!

বাবা বলত, আমি কোথায়-কখন থাকি, তার কি কিছু ঠিক আছে? আমার কি থাকবার জায়গা একটা? কখনও গদীতে থাকি, কখনও যাই উকিলের বাড়ি, কখনও যাই ব্যাঙ্কে। তারপরে আছে শেয়ার মার্কেট। সে-সব কথা তুমি ঠিক বুঝবে না।

মা বলত, আমি তো সেইজন্যেই বলি এ-সব ব্যবসা-ট্যাবসা তুমি ছেড়ে দাও।

বাবা বলত, হ্যাঁ, আমি ছেড়ে দিই আর জ্ঞাতিরা হাসুক।

বাবার মুখে কেবল সব সময়ে জ্ঞাতিদের কথা। জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা করে বাবা যে সম্পত্তির ভাগ কোর্ট থেকে হাতে পেয়েছিল, সেই সম্পত্তি যাতে আরো বাড়ে, সেই কথাই বাবা সব সময়েই ভাবত। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও বাবা সেই সম্পত্তির স্বপ্ন দেখত।

বাবা একবার বলত, সম্পত্তি ঝামেলা, এবার সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে যেদিকে ছু'চোখ যায় সেদিকে চলে যাব—উকিল-পেশ্‌কার আর মোক্তার-মুহুরির জ্বালায় আর পারছি না, মরে গেলাম একেবারে।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই বাবা একেবারে অন্য মানুষ।

বাবা বলত, আজকে আর বাড়িতে খাব না, এখুনি বেরোতে হবে।

মা জিজ্ঞেস করত, কোথায়?

বাবা বলত, আজকে সেই পার্টিশান-কেসটার রায় বেরোবে হাইকোর্টে, তাই উকিলকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতে হবে, সকাল দশটার মধ্যে।

মা বলত, তা তুমি আগে বলবে তো। আগে বললে আমি ঠাকুরকে রান্না করে দিতে বলতুম।

কোথাকার মামলা, কাদের সঙ্গে মামলা, কেন মামলা, সে-সব কিছুই জানত না মা। সঙ্গে-সঙ্গে মা ঠাকুরমশাইয়ের বাড়িতে লোক পাঠাত। ঠাকুরমশাই তাড়াতাড়ি ছুটে আসত।

বলত, কী মা-জননী, আবার তলব কেন ?

মা বলত, আপনাকে এখ্‌খুনি হোমের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঠাকুরমশাই অবাক হত। বলত, কী হয়েছে মা-জননী ?

মা বলত, খুব বিপদে পড়েছি ঠাকুরমশাই, আজকেই যা-হোক একটা যাগ-যজ্ঞ করতে হবে। আজকে হাইকোর্টে মামলার রায় বেরোবে। আপনি অন্তত একটা কিছু করে আমাকে বাঁচান।

আবার মা জিজ্ঞেস করত, কত টাকা আপাততঃ লাগবে ? পাঁচশো টাকায় কুলোবে ?

ঠাকুরমশাই বলত, আপাততঃ তাই-ই দিন, পরে দরকার হলে আমি মা-জননীর কাছে চেয়ে নেব।

সঙ্গে-সঙ্গে আলমারির চাবি খুলে নগদ পাঁচশো টাকা ঠাকুরমশাই-এর হাতে তুলে দিত। আর তারপরে বাড়িতে এলাহি-কাণ্ড শুরু হয়ে যেত। ধূপ-ধুনোর গন্ধে আর কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজে সারা বাড়ি গম-গম করত। সাতাশটা শরিক বুঝতে পারত, আবার বড় শরিকের বাড়িতে কোনও হোম-যজ্ঞের আয়োজন হয়েছে। আর শুধু যে যজ্ঞ হবে তা তো নয়, তার সঙ্গে আছে ব্রাহ্মণ-ভোজন আর মোটা দক্ষিণে।

সেই একদিনেই মা'র হাজার টাকার ওপর খরচ হয়ে যেত।

রাত্তিরে বাবা যখন ফিরত তখন বলত, এ-কি, আজকেও আবার কিছু ব্রত-ট্রত ছিল নাকি তোমার ?

ও বাড়িতে এ-রকম প্রায়ই হত, তাতে অবাক হবার মত কিছু ছিল না। কিন্তু বাবার জানবার ইচ্ছে, সেদিনের পূজোর উপলক্ষটা কী ?

মা কিন্তু সে-কথার উত্তর দিলে না। জিজ্ঞেস করলে, হাইকোর্টে তোমার মামলার রায় বেরোল আজকে ? তুমি জিতেছ তো ?

বাবা জিজ্ঞেস করলে, সেইজন্যেই বুঝি আজ আবার উপোস করলে তুমি ?

মা বললে, তুমি আগে আমার কথার জবাব দাও, তবে আমি তোমার কথার জবাব দেব।

বাবা বললে, আমরা ডিক্রী পেয়েছি।

—ডিক্রী মানে ?

বাবা বললেন, ডিক্রী মানে, আমরা মামলায় জিতেছি।

মা দু'হাতের পাতা জোড় করে অদৃশ্য ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বললে, আমি জানতাম তুমি জিতবেই।

বাবা হাসতে লাগল। বললে, সে তো বুঝলাম, কিন্তু কত টাকা খরচ হলো তোমার শুনি ?

মা বললে, তুমি কেবল খরচের কথা বল, কিন্তু এই যে তুমি আজকে মামলায় জিতলে, এটা কি ভাবছ তোমার উকিলের জন্যে ?

বাবা হেসে বললে, তা না তো কি তোমার গুরুদেবের জন্যে ?

মা বললে, হ্যাঁ, গুরুদেবের জন্যেই তো। গুরুদেব হোম করলে বলেই তো সব ফাঁড়া কেটে গেল তোমার।

বাবা বললে, তা টাকা কত খরচ হল সেইটে বল তো ?

মা বললে, না-গো না, তোমার বেশি টাকা খরচ করিনি গো আমি, সব মিলিয়ে হাজার খানেক টাকাও নয়। তুমি টাকার কথা অত ভাবছ কেন ? এই যে তুমি মামলায় জিতলে, এতে তোমার কত হাজার টাকা লাভ হলো বল দিকিনি ?

মা'র যুক্তির কাছে বাবাকে হার মানতে হতো শেষ পর্যন্ত।

আমাদের গাঙ্গুলী পরিবারের মধ্যে মা'কে কেউ দেখতে পারত না। আমি এক-বার মা'কে জিজ্ঞেস করেছিলাম—মা, তুমি বাড়িতে কারো সঙ্গে মেশো না কেন ?

মা হাসত। বলত, কে বলে মিশি না ? ওরাও তো কেউ আমাদের কাছে আসে না।

আমি জিজ্ঞেস করতাম, কেন আসে না মা ?

মা বলত, কেন আসে না জানিস রে, কারণ আমি গরীব ঘরের মেয়ে বলে। টাকা না থাকাটা যে কী জিনিস তা তুই বুঝলি না, আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি রে ! তাই তো দিনরাত কেবল আমি ভগবানকে ডাকি। তাই তো দিনরাত পূজো করি, ব্রত করি, উপোস করি।

মা'র এ-সব কথা বাইরে কেউ জানত না। মা ঠাকুর-দেবতার পূজোতে যত ইচ্ছে খরচ করত, কিন্তু এমনিতে খরচের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করত।

বাবা বরং বলত মা'কে—কই, তুমি তো আমার কাছে টাকা চাচ্ছো না ? সংসার খরচের টাকা তো এবারে নাওনি তুমি ?

মা বলত, দরকার হলেই বলব, টাকা এখন আমার কাছে আছে।

বাবাও অবাক হয়ে যেত। বাবা বলত, টাকা তোমার কাছে আছে কী করে? তোমাকে তো আমি বেশি টাকা দিই নি।

মা বলত, আমি যে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে টাকা খরচ করি গো।

বাবা বলত, দেখি তোমার ক্যাশ-বাক্স দেখি। দেখি তোমার কত টাকা আছে?

জোর করে একদিন, বাবা-মা'র ক্যাশ-বাক্স দেখলে। দেখা গেল মা'র বাক্সের ভেতরে টাকার বাণ্ডিল। বাবা তো চমকে উঠল। বললে, সে কী, এত টাকা তুমি কোত্থেকে পেলে? চুরি করলে নাকি?

মা বললে, হ্যাঁ, তোমার পকেট থেকে চুরি করেছি।

শুধু কি টাকা! কত জিনিস যে মা'র আলমারিতে থাকত, তার ঠিক নেই। কোনও দিন বাড়িতে বা বাড়ির বাইরে যাবার সময়ও আমার মা'কে কখনও বেশি গয়না পরে যেতে দেখি নি।

অথচ মা'র গয়না যে কত ছিল তা আমি দেখেছি। আলমারি খোলবার সময় কতদিন আমি উঁকি মেরে দেখেছি কত ভাল-ভাল শাড়ি, কত ভাল-ভাল শায়া, শেমিজ, তা আর গুণে শেষ করা যায় না।

আমার মা সব শুনত অবাক হয়ে। বলত, তোমার মা'র অনেক পুণ্যি নাতবউ, অনেক পুণ্যি করে তোমার মা এসেছিল। ভগবান যে তাঁকে কেন এত কষ্ট দিচ্ছেন, ভগবানের মনে কী আছে কে জানে?

বউমা বলত, আমিও তো তাই বলি, মা কেন এমন কষ্ট পাচ্ছে! মা জীবনে তো কাউকে ঠকায় নি, জীবনে কখনও কারো মন্দ চিন্তা করেননি। সারা জীবন যত রকম পূজো-ব্রত-অনুষ্ঠান আছে, পাঁজিতে যা কিছু নিয়ম-কানুন লেখা আছে, সব বর্ণে-বর্ণে পালন করে এসেছে। মা তো তাই এখন বলে, আগের জন্মে বোধহয় আমি অনেক পাপ করেছিলাম, তাই আমার এ-জন্মে এত ভোগ হচ্ছে।

শেষ জীবনে আমার ছেলের শাশুড়ি অসুখে ভুগে যে কত কষ্ট পেয়েছে, সে কথা শুনলে তুমি চমকে যাবে ভাই। ছেলের শ্বশুর ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর টাকা জমিয়েছিলেন, সেই শ্বশুরের মৃত্যুর পর থেকে বউমার মা একেবারে সন্ন্যাসিনীর মত দিন কাটাতেন।

কিন্তু বড় কষ্ট পেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। আমার ছেলেকে আমি জিজ্ঞেস

করেছিলাম, এ কী রকম ডাক্তার তোমরা, একটা রোগীকে সারিয়ে তুলতে এতদিন লাগাচ্ছ কেন? বয়েস তো ওঁর বেশি নয়!

আমার ছেলে আগে প্রকাশ করেনি, পাছে কেউ জানতে পারে। শুধু আমাকে চুপি-চুপি বলেছে, বাবা, ও-রোগ সারবে না!

আমি ছেলের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন সারবে না?

ছেলে বললে, পেটে ক্যান্সার হয়ে গেছে।

ছেলের কথা শুনে আমি স্তম্ভিত। যে-লোক এত ঠাকুর-দেবতা মানত, এত পূজো আর উপোস করত, তার কপালে এত কষ্ট!

ছেলে বললে, ওই সব অনিয়ম অত্যাচার করে করেই ওই হয়েছে। নিজের শরীরের দিকে তো কোনওদিন দেখেন নি। শ্বশুরমশাই রাত একটা-দুটো করতেন বাড়ি ফিরতে। তাই শাশুড়ীও অত রাত পর্যন্ত উপোস করে জেগে থাকতেন!

ছেলের মুখে তার শাশুড়িও আসল রোগটার নাম শুনে বুঝলাম এর আর কোনও প্রতিকার নেই। আমার বড় ভাবনা হল। আমার স্ত্রী আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করলে—তুমি অত গম্ভীর-গম্ভীর কেন? কী হয়েছে তোমার? সব সময়েই দেখছি মুখটা কেমন ভার-ভার!

আমি একটা বাজে কারণ দেখালাম। বললাম, একটা জটিল মামলা খুব ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে। কেসটা খুব সিরিয়াস।

আমাদের কারবারের একটা সুবিধে এই যে নিজের কোন সমস্যাকে আমরা পরের বলে চালিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারি। এই কারণেই আমাদের সম্বন্ধে লোকের এত খারাপ ধারণা। আমরা অনেকটা বহুরূপীর মত। ক্ষণে-ক্ষণে আমাদের রঙ বদলায়। জর্জের সামনে আমরা এক-রকম, আবার মক্কেলের সামনে অন্যরকম। আবার স্ত্রীর সামনে একরকম, পাড়া-পড়শীর কাছে আবার অন্যরকম। আমাদের আসল রূপটা যে কী, সেটা নিজেরাই জানি না—বলে জহর থামল।

* * *

এতক্ষণ জহরের কথা আমি শুনছিলাম। জহর থামতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

জহর বললে, এর 'তারপর' একটা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এখনই তুমি তা

জানতে চেও না। আগ্রহটা ভাল জিনিস, কিন্তু তা বলে অতি-আগ্রহ থাকা ভাল নয়। জর্জের সামনে আমরা সওয়াল করি, কিন্তু সওয়াল করতে উঠে প্রথমেই আমরা আসল পয়েন্টটা প্রকাশ করি না। সেটা আমাদের তুরুপের তাস। সেটা রেখে দিই শেষকালের জন্যে।

বললাম, তাহ'লে তুরুপের তাসটা এবার ছাড়া। এখন তো তোমার গল্প শেষই হয়ে এসেছে।

জহর বললে, শেষই হয়ে এসেছে অবশ্য। কিন্তু ট্রেন যখন কোনও স্টেশনে গিয়ে থামে, তখন তো হুট্ করে তা থামে না। থামবার আগে ট্রেনের গতিটা আস্তে-আস্তে কমে এসে-এসে এক সময়ে থেমে যায়। আমার এ গল্পটাও হল সে রকম। অনেকটা আমার ছেলের শাশুড়ির ক্যানসার রোগটার মতন। ওই রোগ যখন কাউকে ধরে তখন রোগীকে অক্টোপাশের মত আস্তে-আস্তে ধরে। প্রথমে টেরই পাওয়া যায় না, যে রোগ কখন ধরল। যত দিন যায়, তত তার প্রকোপ বাড়ে। বাড়তে-বাড়তে চরমে ওঠে।

এক-সময়ে ডাক্তাররা বললে, হস্‌পিটালে নিয়ে যেতে হবে রোগীকে।

কিন্তু ছেলের শাশুড়ি বললে, আমি হাসপাতালে যাবো না।

ছেলে বললে, কিন্তু বাড়িতে কি অত ভাল চিকিৎসা হয়? তা কি করে সম্ভব?

শাশুড়ি বললে, আমি স্বামী-শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে কোথাও যাব না। মরতে হয় আমি এখানেই মরব।

মেয়ে বললে, মা তুমি অবুঝ হয়ো না, ডাক্তারবাবু তোমার ভালোর জন্যেই বলছেন, তুমি কেন আপত্তি করছ?

মা মাথা নেড়ে বলত, ওরে তুই বুঝবি না, হাসপাতালে গেলে আমাকে কেউ পূজো করতে দেবে না। ঠাকুরকে এখানে চাল-জল কে দেবে? ঠাকুরের ভোগ না দিয়ে যে আমি কিছু মুখে দিই না। হাসপাতালে সে-সব কে করবে?

মেয়ে বলত, তোমার ঠাকুরকে তুমি তাহ'লে হাসপাতালে নিয়ে চল।

মা বলত, দূর, ঠাকুরকে কখনও কি ওই নোংরার মধ্যে নিয়ে যেতে আছে? সব যে ছোঁওয়া-ছুঁয়ি হয়ে যাবে।

যার যখন যেখানে মৃত্যু বাঁধা আছে, সেখানেই তার মৃত্যু হবে। এ আর কারোর ক্ষমতা নেই যে ঠেকাবে। তাই একদিন যখন ছেলে এসে জানালে যে তার শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে, তখন খুব বেশি বিচলিত আমি হইনি। মৃত্যু যেখানে অবধারিত, সেখানে বিস্ময়ের কোন অবকাশ নেই।

আর তাছাড়া যে-যে স্টেশনের টিকিট কেটেছে, সেই স্টেশনেই তাকে নামতে হবে। তার আগের স্টেশনেও না, আর তার পরের স্টেশনেও না। যদি মানুষ তার বরাদ্দ স্টেশনের বাইরে অন্য কোনও স্টেশনে নামে, তাহ'লে তো বিনা-টিকিটে ভ্রমণের অভিযোগে টিকিট চেকারের কাছে দণ্ড দিতে হবে, কিংবা লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে।

যাহোক এসব কথা উকিলের মুখে পাত্তা পায় না। শোভা পায় তোমাদের মুখেই। তবু বলি এই জন্যে যে এটা তো আদালত নয়, আর আমিও এখানে উকিল নই, মানুষ। বলতে গেলে সাধারণ একজন মানুষ। তোমার বন্ধু বিশেষ।

বড়লোক পরিবারের গৃহিণীর মৃত্যু। তার শ্রাদ্ধ-টাদ্ধর ব্যাপারে কত যে ঝামেলা হল, তা বলে তোমাকে আমি ভাই ভারাক্রান্ত করতে চাই না। তার ওপরে সরিকে-সরিকে ঝগড়া। কথায় বলে ভাগের মা গঙ্গা পায় না। তা এ তো ভাগের মা নয়, এর এক সন্তান। অর্থাৎ আমার বউমা। কিন্তু সরিকের বউ তো। সাতাশটা রান্নাঘরের মধ্যে এক রান্নাঘর। সেই রান্নাঘরের দরজায় ঝাঁপ পড়ল। সেখানে আর কেউ কোনওদিন রান্না করবে না।

অনেক ঘটা করে শ্রাদ্ধ হল। কোথাও কোনও কার্পণ্য করলে না আমার বউমা আর আমার ছেলে। শেষকালে প্রশ্ন উঠল সম্পত্তি নিয়ে।

এইখানেই ভাই আমার গল্প শুরু হল। একেবারে কাহিনীর শেষে এসে শুরু। তাই একে তুমি শুরুও বলতে পার, আবার শেষও বলতে পার। জীবনের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত এই যে মানুষের জীবন-পরিক্রমা, এই পরিক্রমা আদি থেকে শুরু করে আবার সেই আদিতে গিয়েই শেষ।

যখন সব শেষ হয়ে গেল, তখন রণক্ষেত্রে আমার প্রবেশ। কারণ আমি উকিল। আবার শুধু উকিল নয়, হাইকোর্টের এ্যাড্ভোকেট। সরিকরা নানা মতলব করে ছেলের শাশুড়ির সব সম্পত্তি নিজেরা গ্রাস করতে চাইলে। কিন্তু বাদ সাধলাম আমি।

সেই মামলা চলল পনেরো বছর। গত পরশুদিন তার রায় বেরিয়েছে। ছেলের শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তি এতদিন সেই আগেকার মতই আটকে ছিল। শাশুড়ির মৃত্যুর পরই সব বিলি ব্যবস্থা হয়ে যাবার কথা। কিন্তু শরিকের শত্রুতার জন্যে কিছু করা যায় নি। কোর্ট থেকে লোক এসে

আলমারি-সিন্দুক-ক্যাশবাক্সতে তালা লাগিয়ে সীল করে দিয়েছিল। অতদিন পরে কাল ডিক্রী পেয়েই কোর্টের লোকের সামনেই সেই সীল ভাঙা হল। আমি হাজির ছিলাম আমার ছেলের পক্ষের উকিল হিসেবে।

যেখানে যত কাগজ-পত্র-দলিল-দস্তাবেজ ছিল, আমি তার সমস্ত কিছুর লিস্ট তৈরি করে নিলাম। সধবা অবস্থায় ছেলের শাশুড়ি যে শাড়ি পরতেন, তাও গোছা-গোছা পাট করে রাখা ছিল। তারপর সিল্কের চাদর, ওড়না, তাও থাকে-থাকে সাজানো রয়েছে। কাপড়চোপড়ের মধ্যে কয়েক হাজার টাকা রেখেছিলেন ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে, তার বেশির ভাগই খরচা হয়নি। গুণে দেখলাম, সেও প্রায় হাজার বারো টাকার মতন। বড় টিপে-টিপে খরচ করতেন তিনি। স্বামী থাকতেও বটে, আর বিধবা অবস্থাতেও। কোথায় কবে কাশীতে কিংবা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন, সেই বাবা বিশ্বনাথের আর জগন্নাথদেবের পট তখনও একভাবে রাখা আছে। একটা জিনিসও তিনি ফেলতেন না। সে ছোটো এক টুকরো কাগজই হোক আর একটা তালপাতা জড়ানো সিঁদুর-পাতাই হোক। আশ্চর্য, একটা জিনিসও তিনি ফেলেন নি। সব জমিয়ে রেখেছেন। কার জন্যে, কীসের স্বার্থে জমিয়ে রেখেছেন, তা কেউ জানে না। মানুষ যে কেন জমায় তাও জানি না, তবু জমাতে হয় শেষ জীবনের দুর্দিনের আশঙ্কাতেই বোধহয়। কিন্তু এ-রকম জমানো প্রবৃত্তিও আমি আমার জীবনে আর কারও দেখিনি। উকিল হিসেবে আমাকে অনেক উইলের প্রোবেট্ নেবার কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু আগে কখনও আমার অভিজ্ঞতা হয়নি ভাই।

তারপর ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের পাস-বই আলমারির মধ্যেই ছিল। কোর্টের অর্ডার আর সাক্‌সেসান সার্টিফিকেট দেখিয়ে টাকাগুলো তোলা হলো।

শেষকালে লকার। লকারের চাবিও ছিল আলমারিতে। সেই চাবি দিয়ে লকার খোলা হল। লকারের ভেতরে উঁকি মেরে আমার চোখ আকাশে উঠল। কত রকম গয়না যে একজন মহিলার থাকতে পারে, তখন তা দেখলাম। আর শুধু কি একটা লকার? সব ব্যাঙ্কের লকার থেকে গাদা-গাদা গয়না বেরোল। আমি নিজে সেই গয়নার একটা লিস্ট তৈরি করলাম। মুক্তো-হীরে-সোনা-রূপো-পান্না কত রকমের গয়না যে, তার সবগুলোর নামও জানি না আমি।

আমি বউমা'কে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মা'র যে এত গয়না ছিল, তা-তো তিনি বলেও যাননি?

বউমা বললে, মা'র বড্ড জমিয়ে রাখার নেশা ছিল। আমি ছোটবেলায় যে সব খেলনা নিয়ে খেলতাম, সেটাও মা ফেলে দিত না, সব জমিয়ে রাখত।

া খুব গরীব ঘর থেকে এসেছিল কি না, তাই ওই রকম অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

তারপর বউমা আবার বললে, বাবা বিয়ের সময় সরিকদের কারোর মত নেয়নি বলেই সরিকরা বাবা-মা'কে ত্যাগ করেছিল। সেই দুঃখেই মা'ও কারোর সঙ্গে কথা বলতো না, কারোর সঙ্গে সম্পর্কও রাখত না। অথচ এক বাড়িতে এক ছাদের তলাতেই থাকত।

বললাম, তাহ'লে তো সারাজীবনই তোমার মা কষ্ট পেয়ে গিয়েছিল।

বউমা, বললে, তার জন্যে তো আমার মা কেবল পুজো-আর্চা নিয়ে থাকত। সরিকদের সঙ্গে এক বাড়িতে থেকেও কারো সঙ্গে কথা বলার সম্পর্ক ছিল না ওটা মা'র ভাল লাগত না। আর বাড়িতে সারাদিন তো কোনও কাজ ছিল না মা'র। আমি চলে যেতাম আমার স্কুলে, আর বাবাও চলে যেত তার অফিসে। তাই একলা-একলা কী আর করবে, কেবল গুরুদেব ঠাকুর আর পূজো।

পনেরো বছর পরে সেই সব সম্পত্তির হিসেব-নিকেশ করতে গিয়ে ভাবছিলাম, এ-সব সম্পত্তি কেন মানুষ জমায়, কিসের জন্যে? কার স্বার্থে? আমি উকিল, কোর্টে-কাছারিতে যে-সব মামলা হয়, তা শুনতে-শুনতে আমার নিজেরই ভাই ঘেন্না হয়ে যায় আমার পেশার ওপর। মাঝে-মাঝে আমার কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করে জেরার সময়ে। তাই তো বলছি, পৃথিবীতে কত রকম যে মানুষ আছে, কত রকম যে চরিত্র আছে, তা আমি দেখেছি ভাই।

কিন্তু আজ পর্যন্ত ছেলের শাশুড়ির মত মানুষ আমি দেখিনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন?

জহর বলতে লাগল, সেই কথাই তো এবার বলছি। লকার থেকে যে-সব গয়না বেরলো, তার লিস্ট করছিলুম কাল। আমার ঘরে তখন কেউ ছিল না। একলা-একলা সব জিনিসগুলোর লিস্ট করতে-করতে হঠাৎ এক কাণ্ড হল ভাই।

জিজ্ঞেস করলাম, কী কাণ্ড?

জহর বলতে লাগল, মনে আছে সেই যে গোড়ায় তোমাকে বলেছিলাম মালদা শহরে একটা মেয়ে আমাকে ব্ল্যাকমেল করেছিল, মানে আমাকে ঠকিয়েছিল? আমার আংটিটা নিয়ে গিয়েছিল?

বললাম, হ্যাঁ, সেই মিনে করা আধভরি সোনার আংটিটা?

জহর বললে, যেটা আমার পৈতের সময় বাবা তৈরি করে দিয়েছিল, মিনের ওপর ইংরাজী 'জে' অক্ষরটা লেখা, সেই আংটিটা হঠাৎ পাওয়া গেল

সেই সব গয়নার ভেতর থেকে। আমি তো ভাই স্তম্ভিত। কতকাল আগের সে ঘটনা। ওই আংটিটার জন্যে মা-র কাছে আমাকে কত গঞ্জনা শুনতে হয়েছে। এতদিন পরে কিনা আমার ছেলের শাশুড়ির গয়নার বাক্সের মধ্যে থেকে সেটা পাওয়া গেল!

আমিও অবাক। বললাম, সেই একই আংটি?

জহর বললে, হ্যাঁ, সেই একই আংটি। অন্য কোনও মহিলা হলে হয়তো সেটা ভেঙে স্যাকরাকে দিয়ে অন্য-ডিজাইনের গয়না গড়িয়ে নিতো। কিন্তু ওই যে, সব জিনিস জমানো স্বভাব, সেইজন্যে সেটাও জমিয়ে রেখেছিল।

আমি বললাম, কিন্তু তোমার বেয়াইয়ের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়েছিল কী করে?

জহর বললে, তা জানি না ভাই। হয়তো আমার মত তাকেও ব্ল্যাকমেল করে বিয়ে করে জড়িয়ে ফেলেছিল। আসলে কী যে হয়েছিল, তা-তো জানবার আর কোনও উপায় নেই এখন। যার জন্যে হয়তো শরিকরাও তাদের একঘরে করে দিয়েছিল।

বললাম, তারপর কী করলে আংটিটা নিয়ে?

জহর বললে, কী আর করব বলো। মাকেও আর বলতে পারি না যে, মা যে-আংটিটার জন্যে তুমি অত বকাবকি করেছিলে, আমাকে সেই আংটিটা এখন পেয়ে গেছি—এই দেখ—কারণ মা ততদিনে মারা গেছে।

আমি বললাম, তোমার ছেলে আর বউমাকে কী বললে?

জহর বললে, তারা তো কেউ জানে না ভাই এ ঘটনা। আমি যে একটা মিনে করা আংটি পেয়েছি, সেটা আমি কাউকে বলিনি। লিস্টের মধ্যেও ওটা নেই। আমি জানি না ওটা নিয়ে আমি এখন কী করবো। তুমি যখন কালকে আমাকে বললে যে পূজো সংখ্যায় লেখার জন্যে তুমি প্লট খুঁজে বার করতে পারছ না, তখন আমি বলেছিলুম যে আমি তোমাকে প্লট দেব। কিন্তু তখন জানতুম না যে, আমার নিজের বাড়িতেই এমন একটা প্লট জমানো রয়েছে।

তারপর জহর তার পকেট থেকে একটা আংটি বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিলে। বললে, এই দেখ ভাই সেই আংটিটা।

আমি আংটিটা দেখলুম। জহর হয়তো ভাবলে আমি আংটিটার দিকেই চেয়ে দেখছি। কিন্তু আসলে আমি সেই আংটিটার মধ্যেই তখন যেন বিশ্বরূপ দর্শন করছি।

— ——

স্বামী-স্ত্রী সংবাদ-৪

আমার এক ডাক্তার বন্ধু আমাকে এই উপন্যাসের কাহিনীটা বলেছিল।

গল্পের জন্যে লোক কাঁহা-কাঁহা মুল্লুকে ঘুরে বেড়ায়, আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে মরে, সে সব আমার জানা আছে। চার্লস্ ডিকেন্স থেকে আরম্ভ করে আমেরিকার ও' হেনরি পর্যন্ত সকলের জীবনী পড়ে দেখেছি, বড় কষ্ট হতো তাঁদের। গভীর রাত্রে গল্পের প্লটের জন্যে ফুটপাথে-ফুটপাথে তাঁদের ঘুরতে হয়েছে, কখনও বা নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে মাতালদের মদ খাওয়াতে হয়েছে গল্প পাওয়ার জন্যে।

আমার স্বাস্থ্য ছোটবেলা থেকেই খারাপ। একটু খাটা-খাটুনি করলে মাথা টিপ্-টিপ্ করে। এক ফোঁটা মদ পেটে পড়লে গলা থেকে পেট পর্যন্ত জ্বলে ওঠে।

শুধু গল্প লিখতে হয় আমাকে। গল্প না লিখে থাকতে পারি না বলেই লিখতে হয়! নইলে আমাকে কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি লেখার জন্যে। আমার গল্প পড়বার জন্যে কারো-কারো মাথাব্যথাও নেই। কিন্তু গরজটা আমার নিজেরই। এক কথায় আমিই আমার প্রভু, আবার আমিই আমার ভৃত্য। তাই যখন ডাক্তার বন্ধু আমার বাড়িতে এল, তখন সে জিজ্ঞেস করলে—কী হে, কী ব্যাপার? অত গোমড়া হয়ে বসে আছো কেন?

বললাম, আমার মনিব বড় বকেছে হে।

ডাক্তার বন্ধু তো অবাক। বললে, মনিব? তোমার আবার মনিব কে?

নিজেকে দেখিয়ে বললাম, আমি। আমিই আমার মনিব। আমার আবার দ্বিতীয় মনিব কে থাকবে? আসলে আমিই আমাকে খুব বকেছি। সারাজীবন কাজ-কর্ম কিছু করবি না, কেবল বসে-বসে খাবি, তোর লজ্জা করে না।

ডাক্তার বন্ধু শুনে হাসতে লাগল। জিজ্ঞেস করল, তারপর? মনিবের বকুনি খেয়ে ভৃত্য কী বললে?

বললাম, আমি আর কী বলব? বলবার তো মুখ নেই আমার। তখন থেকেই মন-মরা হয়ে বসে আছি আর ভাবছি।

ডাক্তার বন্ধু বললে, তা'হলে আমি যদি একটা গল্প বলি তো তোমার মন ভাল হবে?

বললাম, তোমার পড়া গল্প না বানানো গল্প ?

ডাক্তার বন্ধু বললে, একেবারে চোখে দেখা গল্প। এতটুকুও বানাতে হবে না। আমি যেমন-যেমন দেখেছি-শুনেছি, তেমনি-তেমনি তুমি লিখে যেতে পার। তোমাকে আর ভাবতেই হবে না।

আমি একটু উৎসাহ পেয়ে চেয়ারে উঁচু হয়ে পিঠ সোজা করে বসলাম। বললাম, বল।

ডাক্তার বন্ধু বলতে লাগল, তুমি তো জানো আমার নার্সিংহোম আছে। আমার নার্সিংহোমের রেট খুব হাই। তাই বড়-বড় লোক ছাড়া সেই নার্সিংহোমে কেউ আসে না। তা এখন আমার নার্সিংহোমে একটা পেশেণ্ট আছে, তার নাম তুমি জানলেও জানতে পার। তিনি হচ্ছেন, 'গ্রীয়ারসন বিজ্‌নেস কম্‌প্লেক্স'-এর মালিক মিস্টার পি, সেন। বহুদিনের পুরনো ফার্ম। দিল্লী-বোম্বাই-মাদ্রাজে এদের ব্রাঞ্চ আছে। হেড-অফিস এই কলকাতাতে। সেই মিস্টার সেনই এখন আমার পেশেণ্ট। আমার ওখানে এখন একটা কেবিনে আছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে তাঁর ?

ডাক্তার বন্ধু বললে, বার্নিং কেস, পুড়ে গেছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, খুব ফেট্যাল কেস ? বাঁচার মত কেস ? না, মারা যাবেন ?

ডাক্তার বন্ধু বললে, দেখ, 'গ্রীয়ারসন বিজনেস্ কম্‌প্লেক্স'-এর ম কোম্পানী যে কী করে এত বড় হলো, তা ভাই আগে জানতুম না। মিস্টা সেনের কাছেই আমি প্রথম শুনলুম। বড় প্যাথেটিক সে গল্প। সে কোম্পানীর মালিক যে এতবড় দুঃখী মানুষ, তা ভাই আমি আ জানতুম না। গল্পটা শোনার পর থেকে আমার মনে হচ্ছে কার জন্যে আম টাকা উপায় করি ? কীসের জন্যে ?

মিস্টার সেনের নাম সাধারণতঃ কেউ জানে না! আসল নাম হ পলটু। পলটু সেন। সবাই অবশ্য পি, সেন বলেই জানে। প্রবী সেনের ডাক নাম হল পলটু সেন। ভাবতে পার সেই পলটু সেন তা জীবনের সব গল্প আমাকে বলে গেল ? আমি তো ভাই তার কাছে কিছু না। আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম তাঁকে যে, এত ভাবছেন কেন আপনি আপনি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবেন। আপনার তো শরীর ভালোর দি যাচ্ছে ক্রমে-ক্রমে।

কিন্তু পলটু সেন শুনতে চান না। কাঁদতে-কাঁদতে বলেন, ডাক্তা আমার আর বেঁচে না থাকাই ভাল, আমি আর বাঁচতে চাই না, আমার বেঁ

থাকার আর কোন দরকার নেই আর।

ডাক্তার বন্ধুর কথা শুনতে-শুনতে আমারও কেমন একটা গল্প শোনার আগ্রহ হল। যেখানেই যাই, যার সঙ্গেই মিশি, ভাল গল্প শুনতে পেলে আমার সব পরিশ্রম যেন সার্থক হয়ে যায়। বললাম, তুমি ভাল করে আরাম করে বোস। ভাল করে জমিয়ে গল্পটা বল।

ডাক্তার বন্ধু বললে, জমিয়ে বলবার জন্যেই তো আমি সব কাজ ফেলে তোমার কাছে আসছি। আমি ভাই নিজে লিখতেও পারি না, আর গল্পের বই পড়বার সময়ও পাই না। তাই তোমার কাছে এলাম—তুমি যদি পার তো এটা লিখো ভাই, লোকের ভাল লাগবে।

বললাম, বল।

* * *

পলটু সেনকে আজ সবাই বড়লোক বলে জানে। গ্রীয়ারসন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বলেই জানে। তাঁর সামনে লোক কথা বলতে ভয় পায়। আর এক সময়ে একদিন পলটু সেন ছিল সামান্য একশো কুড়ি টাকার টালিক্লার্ক। কলকাতার ডকে গ্রীয়ারসন কোম্পানীর যে গোডাউন, ওইখানে টালিক্লার্ক হয়ে কাজ করেছে।

পলটু সেনও সেই কথা বললে ডাক্তারকে। বললেন, সবাই জানে ডাক্তার, যে আমি বুঝি নিজের বুদ্ধিতেই অত বড় কোম্পানীর মালিক হয়েছি। কিন্তু ভুল ডাক্তার। সব ভুল। বুদ্ধি দিয়ে কিছুই হয় না।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে, বুদ্ধি দিয়ে না হলে কীসে হয়?

পলটু সেন বললেন, সবই ওপরওয়ালার মর্জি ডাক্তার, সবই ওপর-ওয়ালার মর্জি। আমি সামান্য লোক ডাক্তার, অতি সামান্য লোক। কিন্তু সেই অতি সামান্য লোক থেকে আজ যে এত বড় হয়েছি, তাতে আমার কোনও বাহাদুরি নেই। আর এই যে আজ তোমার নার্সিংহোমে রোগ-শয্যায় শুয়ে-শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি, এও সেই ওপরওয়ালার মর্জি।

ডাক্তার তো পলটু সেনের কথা শুনে অবাক। জিজ্ঞেস করলে, আপনি একশো কুড়ি টাকা মাইনের টালিক্লার্ক ছিলেন?

পলটু সেন বললেন, হ্যাঁ ডাক্তার তখন আমার এমন অবস্থা ছিল যে, একটা জামা আমি সাতদিন পরেছি। আমি এত গরীব ছিলুম, যে দু'টোর বেশি জামা কেনবার পয়সা আমার ছিল না।

বলে তিনি নিজের কাহিনী বলতে লাগলেন।

পলটু সেনের মত হতভাগ্য লোক খুব কমই আছে, সত্যি। এক কালে খেতে পেতেন না তিনি। একটা মাথা গোঁজবার মত ঘরও ছিল না তাঁর।

কোনও বড় বাড়ির গাড়ি-বারান্দার নীচে রাত কাটাতে গিয়ে কতবার দারোয়ান তাঁকে তাড়া দিয়েছে। পুরনো খবরের কাগজের পাতা ছিল তাঁর বিছানা। শেষকালে একদিন গ্রীয়ারসন কোম্পানীর অফিসে একটা চাকরি পেল। কী চাকরি ? না টালি-ক্লার্কের চাকরি।

কত টাকা মাইনে ? না মাসে একশো কুড়ি টাকা।

তখনকার দিনে অবশ্য একশো কুড়ি টাকা কম নয়। মোটামুটি চলে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। খিদিরপুরে পোর্ট-কমিশনার্সের ডকের ওপর গ্রীয়ারসন কোম্পানীর শেড। সারাদিনটা হৈ-চৈ করে এক রকম কেটে যেত। কিন্তু মুশকিলটা হত রাত্রে। রাত্রেই যত গুণ্ডা-মস্তানদের আড্ডা ছিল জায়গাটা। কতবার খুন হয়ে যেতে-যেতে বেঁচে গিয়েছিল পলটু সেন।

বড় সুনাম ছিল পলটু সেনের হেড-অফিসের বাবুদের কাছে। তারা বলত, পলটু যখন আছে আমাদের আর ভাবনা কী ?

সত্যি ভাবনা করার কী আছে। পলটু সেন প্রাণ দিয়ে কোম্পানীর সম্পত্তি রক্ষা করবে। অফিসের বাবুদের এ-সব কথা জানা ছিল। কিন্তু সাহেবদের কাছে এ-সব খবর পৌঁছত না। তারা সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ব্যবসা করতে এসেছিল ইণ্ডিয়াতে টাকা উপায় করবার জন্যে। তখন ইংরেজ রাজত্ব। যত টাকা শুষে নিতে পারে নিয়ে যায়। ইণ্ডিয়া তাদের কামধেনু। তারা একে-দুয়ে নিতে এসেছে এখানে। কিন্তু যেদিন থেকে চুরি-চামারি শুরু হল, সেইদিন থেকে সাহেবদের টনক নড়ল।

একদিন গ্রীয়ারসন সাহেব রাত্তিরবেলা গুদামে এসে হাজির। কাউকে জানায়নি আগে। জানলে পলটুও একটু সাবধান হয়ে যেত।

গুদামের বাইরে একটা খাটিয়া পেতে পলটু সেন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। প্রায় মাঝরাত তখন। গরম কাল। একটা হৈ-চৈয়ের শব্দ শুনে হঠাৎ পলটু সেনের ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখে কয়েকজন গুণ্ডার সঙ্গে কার ধস্তাধস্তি হচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে পলটু সেন লুঙ্গি পরা অবস্থাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। তারপর কী যে হল, গুণ্ডাগুলো তাই দেখে যে যেদিকে পারলে পালিয়ে গেল।

মাথায় সামান্য একটু চোট লেগেছিল। সেই অবস্থাতেই চোখ মেলে অফিসার খোদ বড়সাহেব নিজে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

সাহেবকে দেখে পলটু সেনের বুকটা দুর-দুর করে কেঁপে উঠল।

সেলাম করে বললে, গুড মর্নিং স্যার।

সাহেব হেসে ফেললে। বললে, এখন তো মর্নিং নয়, এখন তো নাইট, তুমি আমাকে এখনই গুড মর্নিং করলে ?

তারপরে সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি?

পলটু সেন বললে, পলটু সেন স্যার।

গ্রীয়ারসন সাহেব খুব রাশভারী লোক! বহুদিন থেকেই কোম্পানীর গুদামে চুরির অভিযোগ শুনে আসছিলেন তিনি। আরো শুনে আসছিলেন যে, গুদাম কেউ দেখা-শোনা করে না। রাত্রে গুদামের ভেতরে মদ খাওয়ার আড্ডা হয়, জুয়া খেলাও নাকি হয় সেখানে।

সাহেব জিজ্ঞেস করলে, কত মাইনে পাও তুমি?

পলটু সেন বললে, আজ্ঞে হুজুর, একশো কুড়ি টাকা।

একশো কুড়ি টাকা! শুনে তো সাহেব অবাক। একশো কুড়ি টাকার ক্লার্ক এত পরিশ্রমী। বললে—তুমি কতক্ষণ ডিউটি করো?

আজ্ঞে হুজুর, সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।

সাহেব জিজ্ঞেস করলে, তুমি থাকো কোথায়?

পলটু বললে, আজ্ঞে হুজুর আমি এখানেই থাকি, আমার কোনও বাড়ি নেই। আমি এই গুদাম-ঘরেই থাকি, গুদামঘরের ভেতরেই খাই আর রাত্তিরে এই খাটিয়াতেই শুয়ে থাকি। আমার বাড়ি-ভাড়া দেবার পয়সা নেই।

এ সেই যুদ্ধের সময়কার কথা। গ্রীয়ারসন সাহেব বহুদিন থেকে কমপ্লেন পাচ্ছিল, যে গুদাম থেকে মাল পাচার হচ্ছে। সন্দেহ হয়েছিল বোধহয় তার স্টাফ্‌ই চুরি করে। কিন্তু এখানে সশরীরে সন্ধান করতে এসে পলটু সেনকে দেখে অবাক হয়ে গেল। পলটু সেন না থাকলে তো গুণ্ডারা সাহেবকে খুনই করে ফেলত।

খানিকক্ষণ পলটু সেনের দিকে দেখে নিয়ে বললে, তুমি কাল আমার সঙ্গে হেড-অফিসে গিয়ে একবার দেখা করবে। বুঝেছ?

পলটু সেন বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, নিশ্চয়ই যাব।

সাহেব তো কথাটা বলে গাড়ি চলে গেল। পলটু সেন খানিকক্ষণ সেখানেই হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেই অন্ধকারের ভেতরে চারিদিকের নিঃঝুম-নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে ভগবানের দিকে হাতজোড় করে পলটু সেন নমস্কার করলে। বললে, ভগবান, এতদিন পরে তুমি আমার দিকে মুখ তুলে চাইলে।

যাহোক, ভগবান যদি কারোর দিকে মুখ তুলে চায়, তো সে বোধহয় এমনি করেই চায়। এইরকম এই পলটু সেনের মতই সে ভগবানের আশীর্বাদ পায়। পরের দিন রতনবাবুকে বলে পলটু সেন দেখা করলে গ্রীয়ারসন সাহেবের সঙ্গে। সাহেব বললে, তুমি বোস।

পলটু সেন বসল। সাহেব তাকে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে। জিজ্ঞেস করলে, সারাদিন যে ওখানে থাকো, তা চান-টান কোথায় করো ?

পলটু সেন বললে, ওইখানে বাথরুম আছে, তাতেই চান করি—

আর খাওয়া ? খাও কোথায় ? হোটেলে ?

পলটু সেন বললে, হোটেলে খেলে স্যার অনেক পয়সা খরচ হয়, অত টাকা আমার কোথায় ? তাই আমি অন্য ব্যবস্থা করেছি। গোডাউনের পাশে একজন গরীব মেয়েছেলে থাকে। সে-ই আমাকে সকালে রাত্তিরে রান্না করে খাওয়ায়। তাকে আমি মাসে-মাসে একশো টাকা দিই—

সাহেব কথাগুলো শুনে একবার ভাবলে। তারপর জিজ্ঞেস করলে, তুমি লেখাপড়া কদ্দুর করেছ ?

পলটু সেন বললে, আমি হুজুর টাকার অভাবে বেশি লেখাপড়া করতে পারি নি। ছাত্র পড়িয়ে-পড়িয়ে আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে কোন রকমে বি. এ.-টা পাশ করেছি।

শুনে সাহেব খুব খুশী। সঙ্গে-সঙ্গে অর্ডার হয়ে গেল—সেইদিন থেকে গ্রীয়ারসন সাহেবের খোদ পার্সোনাল ক্লার্ক হবে পলটু সেন। মাইনে চারশো টাকা।

শুনে পলটু সেন কেঁদে ফেললে। চারশো টাকা মাইনে। একেবারে হাউ হাউ করে কান্না। সেই অবস্থাতেই মাথা নীচু করে টেবিলের তলায় ঢুকে সাহেবের পা ছুঁয়ে মাথায় ছোঁয়ালে।

সাহেব বললে, অ্যাট্স অল্ রাইট সেন, স্টপ্ ক্রাইং, স্টপ্—

* * *

এ-সব ঘটনা সেই যুদ্ধের সময়কার। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে তারপর ?

পলটু সেন বললেন, ডাক্তার আজকে আমার কোম্পানীতে দশটা অফিসার পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পায়। আমি তাদের বস্। পাঁচ হাজারের নীচের কুড়িজন অফিসার আছে যারা মাসে পায় সাড়ে তিন হাজার টাকা। প্লাস গাড়ি, ফ্ল্যাট, সারভেন্ট, সমস্ত কিছু।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে, এ কী করে হল ?

পলটু সেন বললেন, হলো। ভগবানের ইচ্ছে ছিল তাই হলো। নইলে আমি কে, ডাক্তার ? আমি তো কোন রকমে পাশ করা একটা অর্ডিনারি বি-এ। আমি ইনজিনীয়ারিংয়ের কিছ্ছু জানি না, আমি ব্যবসার কিছ্ছু জানি না। শুধু ইংরিজী এক লাইনও লিখতে পারি না। কিন্তু সেই আমি আমার লেডী স্টেনোগ্রাফারকে গড়-গড় করে ইংরিজী চিঠির ডিক্টেশান দিই। আমার পার্সোনাল স্টেনোগ্রাফার একজন পাক্কা মেমসাহেব।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে, তারপর স্যার, তারপর ?

পলটু সেন বললেন, আজ তোমাকে আমার সব কথা বলছি ডাক্তার, এমন করে আমি আর কাউকে কখনও নিজের কথা বলিনি। কিন্তু শুনলে তো আমি কী করে বড়লোক হয়েছি, কত টাকার মালিক হয়েছি। কত টাকার ফরেন-এক্সচেঞ্জ আমি ইনকাম্ করি, আমার জন্যে ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট কত টাকা ফরেন মানি উপায় করে। কিন্তু বিশ্বাস কর ডাক্তার, আমি হচ্ছি একজন মোস্ট আনহ্যাপি ম্যান, আমার মনে হয় আমার মত দুঃখী লোক আর একজনও নেই। আজ আমার মনে হয় যেদিন আমি সেই রাস্তায়-রাস্তায় বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াতুম, যেদিন গাড়ি-বারান্দার তলায় খবরের কাগজের পাতা পেতে ঘুমিয়েছি, আর পুলিস এসে আমায় লাঠি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, সেই দিনগুলোই আমার যেন ভাল ছিল। এখন মনে হয়, গ্রীয়ারসন অফিসের যে লোকটি এখন ডকের গোডাউনের টালি-ক্লার্ক, সে-ও বোধহয় আমার চেয়ে সুখী। আমি যদি এখন আবার সেই চাকরি করি তো বোধহয় আমি এখনের চেয়ে বেশী সুখে থাকব—আর নয়তো আমার এখন যদি তোমার নার্সিংহোমে মৃত্যু হয়, তা'হলে হয়তো বেঁচে যাব।

ডাক্তার বললে, কেন ও-সব কথা বলছেন ? আপনার ভয় কী ? আমি আপনাকে বাঁচিয়ে তুলব। আপনি নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবেন।

পলটু সেন বললেন, না ডাক্তার, আমি আর বাড়িতে যেতে চাই না। আমি তোমার এখানেই মরতে চাই। আমাকে যেন আর সুস্থ হয়ে বাড়িতে যেতে না হয়, বাড়ি এখন আমার কাছে মরুভূমি।

ডাক্তার সান্ত্বনা দিয়ে বললে, আপনি চুপ করুন স্যার, চুপ করুন।

পলটু সেন কিছুটা শান্ত হলেন। তারপর বলতে লাগলেন, দেখো ডাক্তার, যখন আমার টাকা ছিল না, তখন ভাবতুম টাকা পেলেই বুঝি আমার সব দুঃখ ঘুচবে। কিন্তু দেখ, ভাগ্যের কী পরিহাস ! আজকে এত টাকার মালিক হয়েও, আজকে তোমার নার্সিংহোমে শুয়ে-শুয়ে তোমার সামনে কাঁদছি। এর চেয়ে বড় হয়রানি, এর চেয়ে বড় পরিহাস আর কী হতে পারে ?

ডাক্তার বললে, আপনি চুপ করুন মিস্টার সেন। আপনি ভালো হয়ে যাবেন, ভালো হয়ে আবার বাড়ি চলে যাবেন, আপনার কোনও ভয় নেই।

পলটু সেন বললেন, না ডাক্তার তুমি আর ও প্রার্থনা করো না। তুমি কামনা করো যেন আমাকে আর ও-বাড়িতে না যেতে হয়। আমি যেন এখানে তোমার এই নার্সিংহোমেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে পারি।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু আমি তো আপনার শরীরের সব কিছু

পরীক্ষা করেছি, আমি তো কোথাও কিছুতে দোষ পাইনি। আপনার ইউরিন ঠিক আছে, আপনার প্রেশার নরম্যাল, আপনার ব্লাডেও কোন দোষ নেই। আপনার কীসের ভয়?

—ভয়?

পলটু সেন বলতে লাগলেন, ভয় কেন জানো ডাক্তার? ভয় আমার পাপের। আমি পাপ করেছি। তুমি না হয় আমার শরীর ঠিক করে দিলে, কিন্তু আমার মন? আমার মনটাকে তুমি ঠিক করে দিতে পারবে? মন ঠিক করবার ওষুধ তোমাদের ডাক্তারী বইতে আছে? তোমরা তো কেবল বড়ি খাইয়ে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে দাও, কিন্তু যার মনে কোনও সুখ নেই, তার মুখে হাসি ফোটাবার বড়ি আছে তোমাদের শাস্ত্রে? তা যদি থাকে তো বলব তুমি বাহাদুর।

তা রোজই এই রকম কথা হয় ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তারেরও অনেক কাজ। আর শুধু মিস্টার সেনকে নিয়ে থাকলেই তো ডাক্তারের চলবে না। আরও অনেক রোগী আছে নার্সিংহোমে।

কিন্তু যখনই একটু সময় পায় ডাক্তার তখনই পলটু সেনের রুমে এসে বসে। এসেই প্রথম কথা জিজ্ঞেস করে—আজ কেমন আছেন মিস্টার সেন?

বিকেল চারটে থেকেই আত্মীয়-স্বজন দেখা করতে আসে নার্সিংহোমের রোগীদের সঙ্গে! পলটু সেনকে কে বা কারা দেখতে আসে, তা ডাক্তার কোনোদিন জানবার চেষ্টা করেনি।

আর জেনেই বা কী হবে! সব মানুষেরই দুঃখ আছে। কারোর বেশি, কারোর কম। ডাক্তারেরও তো নিজের হাজার রকম সমস্যা আছে। মানুষ মাত্রেরই দুঃখ-কষ্ট-সমস্যা আছে। মানুষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে ততক্ষণই তার সমস্যা, মরে গেলে কোনও সমস্যা থাকে না আর। ওই নার্সিংহোমেই কত লোক রোগী হয়ে আসে, আবার কত লোক রোগ সারিয়ে চলে যায়। কিন্তু যারা মারা যায়? যারা নার্সিংহোম থেকে আর বাড়ি ফিরতে পারে না?

তাও দেখে-দেখে ডাক্তারের চোখ পচে গেছে। জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে আর কোনও কৌতুহল নেই। ডাক্তার যেন এখন পাথর হয়ে গেছে।

কিন্তু সেই ডাক্তারও পলটু সেনের কাছে এসে জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। হাজার-হাজার লোকের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা যে লোকটা, সেই লোকটাকে এত অসহায় দেখে তার কেমন মায়া হয় মনে-মনে। সেই লোকটাই যেন তার কৃপাপ্রার্থী। ডাক্তার যেন ইচ্ছে করলে তাকে মারতেও পারে, আবার রাখতেও পারে। ডাক্তারের মনে হয় যেন মিস্টার সেনের এই অসুখের পেছনে কোনও রহস্য আছে।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিল ডাক্তার—আচ্ছা মিস্টার সেন, আপনি যখন প্রথম কোম্পানীর মালিক হলেন, তখন আপনার কী রকম লাগল ?

পলটু সেন বললেন, দেখ, সে এক ঘটনা। যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেল, আমাকে তখন গ্রীয়ারসন সাহেব ডাকলে। আমি গেলুম সাহেবের ঘরে।

সাহেব বললে, বোস সেন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে—বলে একটু থেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলে সাহেব। তারপর বললে—আমি ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি সেন।

পলটু সেন বললেন - কেন স্যার ?

গ্রীয়ারসন সাহেব বললে, দেখ ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট আমাদের কোম্পানীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে না। অনেক রকম আইন-কানুন করেছে, যেটা আমাদের পক্ষে খারাপ। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে আমরা ইণ্ডিয়াতে এসেছি টাকা উপায় করবার জন্যে। কিন্তু নানারকম ট্যাক্স বসাচ্ছে তোমাদের গভর্মেণ্ট। তাই আমরা আর এখানে থাকতে চাই না। তা সে-সব কথা থাক। আসল কথা হল, আমি কোম্পানীর এ্যাসেট, মানে লাভ-লোকসানের দায়িত্ব তোমাকে দিয়ে যেতে চাই! তুমি নেবে ?

মাথায় বজ্রঘাতের ফলে অনেক মানুষের মৃত্যু হবার ঘটনা শুনেছি। লটারীতে মোটা টাকা পাওয়ার পর অনেকের হার্টফেল হওয়ার ঘটনার কথা জানা আছে। কিন্তু আমার হার্টফেল হল না। সেই এয়ার কণ্ডিশন ঘরে বসে আমি দর-দর করে ঘামতে লাগলাম। মনে হল, আমার যেন দম আটকে আসছে।

পলটু সেন সাহেবকে বললেন, স্যার, আমি আপনাকে কালকে আপনার কথার জবাব দেব—এখন আমার খুব মাথা ঘুরছে।

বলে তিনি সে দিনকার মত বাড়ি চলে গেলেন। তারপর সাতদিন ধরে বেহুঁশ জ্বরে। কোথা দিয়ে যে সাত দিন সাত রাত কাটল, তা তিনি টের পেলেন না! সেই সাত দিন ভূতির মা না থাকলে তিনি হয়তো মারাই যেতেন।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে, ভূতির মা কে ?

পলটু সেন বললেন, আমি যখন ডকে টালি-ক্লার্ক ছিলুম, তখন ভূতির মা-ই আমাকে খাওয়াত, আমি তাকে মাসে-মাসে একশো টাকা দিতুম। আর আমার কাপড় কাচা, আমার ভাত রান্না করা থেকে আরম্ভ করে সমস্তই করত ভূতির মা। আমার সেই দারিদ্র্যের দিনে বলতে গেলে ভূতির মা-ই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। ভূতির মা ছিল বড় গরীব লোক। ওই গ্রীয়ারসন কোম্পানির গোডাউনের পেছনে একটা ঝুপড়িতে

থাকত ভূতির মা ও তার মেয়ে।

আমি কিন্তু ভূতিকে ভূতি বলে ডাকতুম না? ডাকতুম নির্মলা বলে। ভূতির মা'র মেয়ের নাম ছিল নির্মলা। নির্মলা মেয়েটা ভাল ডাক্তার। সংসারে সব মেয়ে কিন্তু ভাল হয় না, তা জানো তুমি ডাক্তার?

তারপর হঠাৎ গল্প থামিয়ে পলটু সেন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কখনও কোনও মেয়েকে ভালবেসেছ ডাক্তার?

ডাক্তার তো অবাক বললে, ও কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন স্যার?

পলটু বললেন, জিজ্ঞেস করবার কারণ আছে ডাক্তার। কারণটা হল যে জীবনের প্রথম প্রেমে ভগবানের অভিশাপ আছে। একথা আমার নয় ডাক্তার, আমাদের সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের কথা। তিনিই ওই কথা বলে গিয়েছিলেন তাঁর 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে। আমার বিয়ে হয়েছে, আমার যে স্ত্রী আছে সে-ও আমাকে কম ভালবাসে না ডাক্তার, কিন্তু সেই যে আমার সেই প্রথম প্রেম, যার কথা আমি বলছি, তার অভিশাপেই আজকে আমার এই কষ্ট।

ডাক্তার বললে, ও সব কথা এখন ভাববেন না আপনি, আপনি চুপ করে ঘুমোবার চেষ্টা করুন, আমি চলে যাচ্ছি।

পলটু সেন কিছুতেই ছাড়বেন না। বললেন, না-না, তুমি বোস ডাক্তার। তুমি তো সারাদিনই আমাকে পিল্ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখো, আমি আর জেগে থাকি কখন? এখন একটু না হয় জেগে থাকি, জেগে-জেগে তোমার সঙ্গে গল্প করি। তোমার সময় একটু নষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু হোক নষ্ট, আমি অন্ততঃ একটু শান্তি পাব। আমাকে শান্তি দেওয়াও তো তোমার কাজ।

ডাক্তারের সময় নষ্ট হলেও পলটু সেনের গল্প শুনতে ভাল লাগে।

পলটু সেন বললেন, জানো ডাক্তার, প্রথমে আমি অত বুঝতে পারি নি। একশো কুড়ি টাকা মাইনে পাই তখন হাতে, আর একশো টাকা দিই নির্মলার মাকে। সেই একশো টাকাতে নির্মলার মা আমাকে চার বেলা খাওয়াত। সকালবেলা চা-জলখাবার, দুপুরবেলা ভাত-ডাল-তরকারি, টিফিনের সময় চা আর রাত্তিরে রুটি-তরকারি। নির্মলার মা নিজের ঝুপড়িতে বসে রান্না করত, আর নির্মলা অফিসে-অফিসে বাবুদের চা সাপ্লাই করত।

নির্মলার মাকে একদিন বললাম, ভূতির মা, তোমার মেয়ে তো বড় হচ্ছে, এখন আর অফিসে-অফিসে কেন ওকে পাঠাও? জিনিসটা কি ভাল?

নির্মলার মা বলত—কী করব বাবু, আমার কি একটা ছেলে আছে, যে তাকে পাঠাব। পাকিস্তানে আমার বাড়ি-ঘর ছিল, সোয়ামী ছিল। কিন্তু কোথায় গেল সব বলুন তো বাবু? তা কপাল যখন পুড়ে যায়, তখন

ভগবানও মুখ ফিরিয়ে নেয় বাবা। এখন আমার কপাল খারাপ, ওই মেয়েকেই আমার ছেলে বলে মনে করি।

এর পরে আর কিছু বলিনি নির্মলার মাকে। তারপর থেকে রাত্তিরে আর নির্মলাকে আমাদের অফিসে খাবার আনতে দিতুম না। অত রাত্রে অন্ধকারে নির্মলার আসাটা আমি পছন্দ করতুম না। আমি নিজেই নির্মলার মা'র ঝুপড়িতে গিয়ে খেয়ে আসতুম।

কিন্তু গ্রীয়ারসন কোম্পানীর অফিসে আমার মাইনে বাড়ল, তখন আমি আলাদা বাড়ি ভাড়া করলুম। তখন কাজের চাপে নির্মলার মা-র কথা ভুলেই গেলুম। তখন আমি গ্রীয়ারসন সাহেবের খাস সেক্রেটারি। আমার তখন নিজের ফ্ল্যাট, নিজের চাকর-বাকর সব আছে। সকাল আটটার আগেই অফিসে চলে যাই আর ফিরতে-ফিরতে রাত ন'টা দশটা বেজে যায়। তা অনেক দিন পরে অসুখ থেকে উঠে যখন অফিসে গেলাম তখন গ্রীয়ারসন সাহেব আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলে, কী হল সেন! তুমি কী ঠিক করলে?

আমি কী জবাব দেব?

শুধু বললাম, স্যার, আমি বুঝতে পারছি না কী জবাব দেব।

সাহেব বললে, এতে এত ভাববার কী আছে সেন? তুমি যে আমার লাইফ্ বাঁচিয়েছ, তা তোমার মনে থাকতে না পারে, কিন্তু আমার মনে আছে। আমার মেমসাহেব আমাকে এই কথাই বলেছে। সে আমার কাছ থেকে সব শুনেছে। সে আমাকে বলেছে এই কোম্পানী তোমাকে দান করে দিতে। আমরা অনেক দিন থেকে এই ইণ্ডিয়ায় কারবার করছি। ইণ্ডিয়া থেকে আমরা কোটি-কোটি ডলার দেশে নিয়ে গিয়েছি। এত ডলার নিয়ে গিয়েছি, যে তার আর শেষ নেই। আমার গ্র্যাণ্ডফাদারের প্রতিষ্ঠা করা এই কোম্পানী, এতদিন ধরে ভোগ করছি। নাউ, আই মাস্ট রিটায়ার। আর তুমি তো জানো সেন, আমার কোনও ছেলে-মেয়ে নেই। আমি কার জন্যে এই বিদেশে পড়ে থাকব, বল? আমার কোম্পানীর বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের মিটিংয়েও আমি এই রেজোলিউশান পাস করিয়ে নিয়েছি। তুমি এই কোম্পানীটা নিয়ে নাও। তার জন্যে তোমার একটা পয়সাও খরচ করতে হবে না। আই গিভ্ ইট্ ইউ ফ্রি।

আমি তখন থর-থর করে কাঁপছি ভেতরে-ভেতরে। আমার মনে হল, আবার বোধহয় আমার জ্বর আসবে।

সাহেব আবার বলতে লাগলেন, আমি জানি তুমি ভয় পাচ্ছ, এই দায়িত্ব নিতে। কিন্তু আমার কাছে একটা জিনিস জেনে রাখো, জীবনে ভয় পাবার মত কিছুই নেই। ভয়কে যে ভয় করে, মানুষ তাকেই বলে ভীরু,

কাওয়ার্ড। আমি বিশ্বাস করি, তোমার হাতেই এই কোম্পানি নিরাপদে থাকবে। যদি পারো তুমি এই কোম্পানীকে আরো এক্সট্যাণ্ড করো, আরো বাড়িয়ো। আর 'গ্রীয়ারসন' নামটা বদলে দিও না। ওই নামটার ওপর একটা দুর্বলতা আছে, তার কারণটা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। আই ব্লেস্ ইউ সেন। আমি আশীর্বাদ করছি, এ কাজে তুমি সাকসেস্‌ফুল হবেই।

*　　*　　*

ডাক্তার, তুমি কখনও এই অবস্থায় পড়েছ কিনা জানি না। পৃথিবীর কোনও মানুষই আমার মতন অবস্থায় পড়েছে কিনা জানি না। কিন্তু তুমি এই নার্সিংহোমে অনেক রকম পেসেণ্ট তো দেখেছ, তোমারও অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই তোমাকেই বলছি তুমি আমার মানসিক অবস্থাটা কল্পনা করে নাও, তুমি যদি আমার মত অবস্থায় পড়তে তো কী করতে ?

সত্যিই বলছি ডাক্তার, আমার সেদিন আনন্দ করবার মত মনের অবস্থা হয় নি। যদি কোনও দিন কেউ রাস্তার ভিখিরিকে কোটি টাকার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়, তখন কি তুমি ভাবছ তার আনন্দ হয় ? আমার তো মনে হয় —হয় না।

আর তার পরদিন থেকে শুরু হল আমার যুদ্ধ। ভাগ্য নিয়ে যুদ্ধ, টাকা নিয়ে, যুদ্ধ, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে যুদ্ধ। সে আর আমি কি করে তোমাকে বোঝাব। কেউ যদি কাউকে হঠাৎ ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেণ্ট করে বসিয়ে দেয় বা প্রাইম মিনিস্টার করে দেয়, তাও বোধহয় এত শক্ত কাজ নয়, যত শক্ত কাজ সেই অতবড় কোম্পানী চালানো।

তা হল কী, সাহেব তো একদিন তল্‌পি-তল্‌পা গুটিয়ে হাওয়া থেকে চলে গেল। আমি রইলুম কোম্পানী নিয়ে। কোথা দিয়ে দিন-রাত কেটে যেত, তা টেরই পেতাম না। লোকে ভাবতো আমি হঠাৎ বড়লোক হয়ে গিয়েছি, আমার বোধহয় অহঙ্কারে আর মাটিতে পা পড়ে না। ভাবুক, আমার কিন্তু তখন কিছু ভাবার সময় ছিল না।

— জানো ডাক্তার, দুঃখের দিনে মানুষ মানুষের থেকে দূরে সরে যায়, সেইটেই সকলে জানে। কিন্তু সুখের দিনে মানুষ যত মানুষের থেকে দূরে সরে যায়, ততো বোধহয় দুঃখের দিনেও যায় না।

তারপর একটু থেমে বললেন, আচ্ছা ডাক্তার, তোমার জানাশোনা কোনও লেখক আছে ?

ডাক্তার বললে, লেখক ? লেখক মানে ?

পলটু সেন বললেন, হ্যাঁ লেখক, মানে এই যারা গল্প, উপন্যাস-টুপন্যাস লেখে আর কি।

ডাক্তার বললে, হ্যাঁ, আমার এক বন্ধু আছে সে উপন্যাস লিখে সম্প্রতি খুব নাম করেছে।

পলটু সেন বললেন, তাঁকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসতে পারো?

ডাক্তার বললে, হ্যাঁ তা পারি। কিন্তু কেন?

পলটু সেন বললেন, তা'হলে তাঁকে আমি আমার জীবনের সমস্ত কথা বলতাম। যদি সম্ভব হয় তো তিনি লিখতেন। অন্ততঃ ছাপার অক্ষরে তা চিরস্থায়ী হয়ে থাকত।

ডাক্তার বললে, আপনি স্যার তাকে আপনার কাছে একদিন নিয়ে আসব। আগে আপনি একটু সেরে উঠুন, সুস্থ হয়ে উঠুন, তখন তাকে আনবো আপনার কাছে।

পলটু সেন বললেন, কিন্তু ডাক্তার আমি তো অতদিন বাঁচব না।

ডাক্তার বললে, বাঁচবেন, আপনি নিশ্চয়ই বাঁচবেন; তা না হলে আমি আছি কী করতে? আপনাকে না সারিয়ে ছাড়বই না।

পলটু সেন বললেন, কিন্তু ডাক্তার আমি যে আর বাঁচতে চাই না। আমার তো আর বাঁচার ইচ্ছে করে না। আমি বাঁচতে চাই না যে।

ডাক্তার বললে, কেন, আপনার কী হয়েছে?

পলটু সেন বললেন, তবে শোন ডাক্তার, তোমাকে সব কথা বলি। যে-কথা কেউ জানে না, আমার স্ত্রীও যা জানে না, আমি তা-ই তোমাকে বলব।

ডাক্তার বললে, বলুন না, আমি তো শুনতেই চাই।

—কিন্তু তোমার কাজের ক্ষতি হবে যে তাতে। আমি তোমার কাজের ক্ষতি করতে চাই না। আমি ছাড়া তোমার এখানে তো আরো অনেক রোগী আছে।

ডাক্তার বললে, তা থাকুক, তাদের দেখা-শোনা করার জন্যে অন্য অনেক ডাক্তার আছে আমার। আমি আর কাউকে দেখতে যাই না। আমি এমন করে আর কারোর কেবিনে বসে গল্পও করি না।

তা ঠিক হল, প্রতিদিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে ডাক্তার আসবে পলটু সেনের ঘরে। তখন থেকে লাঞ্চ-টাইম পর্যন্ত পলটু সেন তাঁর জীবনী বলবেন।

* * *

ডাক্তার বন্ধু বলছিল, আর আমি শুনছিলাম। এবার বললাম— তারপর?

পলটু সেন এমনিই এক ব্যক্তি, যাঁকে বলা যায় তিনি দেশের একটা সেকশান্ বা একটা অংশের প্রতীক, যারা টাকা হাতে এলেই সব সময় বিলাসিতার একটা চূড়োয় গিয়ে ওঠে। তারা যদি সিগারেট খায় তো সাধারণ মানুষ সে সিগারেট খেলে তাদের চলে না। তারা যে সিগারেট

খায় যা বাজারে সবচেয়ে দামী, যা সবচেয়ে নামী। টাকাই সাধার মানুষকে অসাধারণ মানুষ করে তোলে ঘটনাচক্রে। তারপর আছে পার্টি।

এই পার্টিই এ-যুগের সিঁড়ি। ওই সিঁড়িতে পা দিয়েই মানুষ নিজের সমাজের স্তর ছাড়িয়ে সমাজের আরো উঁচু স্তরে গিয়ে ওঠে।

পলটু সেনের তখন তাই হল। লণ্ডন থেকে বা আমেরিকা থেকে যদি কোনও ফরেন বিজনেস ম্যাগনেট্ আসে তো তাকে পার্টি দিয়ে খাতির করতে হয়। এইটেই রীতি। আর সেই বিশিষ্ট অতিথি তো একলা খাবেন না একলা পানও করবেন না। তাঁর খানাপিনার সময় নারী-পুরুষ সঙ্গী চাই হোস্টেস না থাকলে ঠিক পুরোপুরি পার্টি হয় না। তাই হোস্টেসও জোগাড় করতে হল মিস্টার সেনকে।

—তার মানে আপনি বিয়ে করলেন?

পলটু সেন বললেন, হ্যাঁ ডাক্তার। ঠিক আমি বিয়ে করলুম না, বরং বলা যেতে পারে বিয়ে আমার হল। বিয়েটা যে আমার কী ভাবে হল তার ব্যাখ্যা করা দরকার। কারণ ওই বিয়েটা যদি আমি না করতুম, তে বোধহয় আজকে আমাকে এইভাবে তোমার নার্সিংহোমে আসতে হত না।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে, মিসেস সেন কি আপনাকে দেখতে এখানে আসেন?

পলটু সেন বললেন, সে আসবে কী করে? সে তো মারা গেল?

—মারা গেছেন?

পলটু সেন বললেন, হ্যাঁ মারা গেছে। কিন্তু বড় দেরীতে মারা গেছে অনেক আগে মারা গেলেই আমি একটু শান্তি পেতুম। ভুল তো অনেক মানুষই করে, কিন্তু আমি যা ভুল করেছিলাম, তেমন ভুল পৃথিবীতে আর কেউ করেনি ডাক্তার। এখন আমি সেই ভুলেরই খেসারৎ দিচ্ছি।

কবেকার এক রিটায়ার্ড কর্নেল চ্যাটার্জী, তিনি ছিলেন সেনট্রাল ক্লাবের মেম্বার। সেনট্রাল ক্লাবে তুমি কখনও গেছ ডাক্তার? যাও নি। তুমি ক্লাবে যাওয়ার সময় কখন পাবে? কিন্তু আমারও কি সময় ছিল খুব? কিন্তু তবু আমাকে ক্লাবে যেতে হত। কলকাতার সব ক্লাবগুলোর মেম্বার হতে হত; তাতে রেফারেন্স বাড়ে। কত বড়-বড় সোসাইটি-কিংদের সঙ্গে পরিচয় হয়। ব্যবসাদারদের ওটা করা দরকার।

অথচ ভাবো যে, আমি খাবার সময় কী করে কাঁটা-চামচ ধরতে হয় তা জানতুম না, সেই আমি সেই ডকের একশো কুড়ি টাকা মাইনে পাওয়া টালি-ক্লার্ক, হয়ে গেলাম একেবারে বিগ্ বস্। আমাকে পার্টি দিয়ে খাতির করতে এগিয়ে আসতে লাগল ইণ্ডিয়ার সমস্ত কোম্পানীর বিজনে

একজিকিউটিভরা। আমাকে তখন কে পায় ডাক্তার। আমি তো তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করছি। ভাবছি, আমার পুরুষকারের জন্যেই আমি এত বড় হয়েছি। আমি যে একদিন একশো কুড়ি টাকা মাইনের টালি-ক্লার্ক ছিলুম, সে কথাটা আমি তখন ভুলে গিয়েছি। আমার মনে হয়েছে, আমি বেঙ্গলের কিং। আমার মুখের এক ইঞ্চি হাসি দেখলে সব লোক তখন কৃতার্থ হয়ে যেত। মিনিস্টাররা তো সবাই আমার কেনা। আসলে আমিই তখন কিং এবং কিং-মেকার, দুই-ই।

ডাক্তার, তোমাকে আমি আজ বলে যাচ্ছি, কখনও অহঙ্কার করো না! অহংঙ্কারের মতন ছ্যাঁচড়া জিনিস আর দুটো নেই মানুষের জীবনে। আজ যে আমি তোমার নার্সিংহোমের বিছানায় শুয়ে পড়ে আছি, তা শুধু আমার অহঙ্কারের জন্যে। তুমি জানো, আজকে আমার অফিস থেকে টেলিফোন করে আমার খবর জানবার লোকের অভাব নেই। নেহাৎ তোমাকে বারণ করে দিয়েছি তাই কেউ আর টেলিফোন করছে না। কিন্তু আমি তো বুঝতে পারি, অফিসে আমি নেই বলে প্রতিদিনে কত লাখ টাকা লোকসান হয়ে যাচ্ছে।

তা একদিন সেই রিটায়ার্ড কর্নেল চ্যাটার্জীর সঙ্গে এক টেবিলে বসে ড্রিঙ্ক করছি। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বিয়ে করেছেন মিস্টার সেন?

আমি তাচ্ছিল্যভরে বলেছিলাম, আমি বিয়েতে বিশ্বাস করি না।

—হোয়াই? কেন?

আমি বলেছিলাম, বিয়ে করবার সময় পাইনি।

কর্নেল চ্যাটার্জী বলেছিলেন, কিন্তু এখন তো সময় আছে। এখন তো আপনি সেটেল্‌ড, এখন তো বিয়ে করতে পারেন।

হাসতে-হাসতে বলেছিলাম, কিন্তু তেমন মেয়ে কোথায় কর্নেল?

কর্নেল চ্যাটার্জী বলেছিলেন, এই তো এখানেই তেমন মেয়ে আছে।

বলে অন্য টেবিল থেকে তাঁর মেয়েকে ডাকলেন···রিটা, কাম হিয়ার বেবি।

অদ্ভুত মেয়ে ডাক্তার ওই রিটা। বড় ভাল লাগল ওই রিটাকে দেখে। তখন কি জানি, ওই রিটাই আমার জীবনের শনি হয়ে আসবে।

কিংবা হয়তো নেশার চোখে আমার তখন খুব ভাল লেগে গিয়েছিল তাকে। নেশা, বিশেষ করে হুইস্কির নেশা মানুষকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে অন্য মানুষ করে দেয়। যে সাধু, সে ভণ্ড হয়ে যায়, যে লোকটা কৃপণ সে ওই নেশার ঘোরে উদার হয়ে ওঠে, যে লোকটা ক্রিমিন্যাল, সে

অনেক সময় হঠাৎ সাধুপুরুষ বনে যায়।

আমারও বোধহয় তাই হয়ে গিয়েছিল। আমি সেই কর্নেলের মেয়েকে নিয়ে ক্লাবের বাগানের মধ্যে খানিকক্ষণ একসঙ্গে বেড়ালুম।

আধঘণ্টা পরে কর্নেল চ্যাটার্জীর টেবিলে গিয়ে হাজির হলুম।

বললুম, আই এগরি—

কর্নেল চ্যাটার্জীর ওই এক মেয়ে। অগাধ টাকার মালিক কর্নেল চ্যাটার্জী, বাপের সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক হবে ওই রিটা। তখন অত নেশার ঘোরেও বোধহয় সে-কথাটা মনে পড়েছিল। নইলে আমি অমন ভুল করব কেন?

হুইস্কির ওপর দোষটা চাপিয়ে দিলে অবশ্য অন্যায় হবে। আমাকে বোধহয় তখন টাকায় পেয়ে বসেছিল। টাকা জিনিসটার গুণ অনেক, কিন্তু টাকার দোষ যে কত, তা বোধহয় বলে শেষ করা যায় না। আমি তখন অগাধ টাকার মালিক। কিন্তু তখনও বোধহয় টাকার লোভ আমার যায় নি।

অবশ্য রিটাকে দেখতে যাকে সুন্দরী বলে তা ই।

তা সুন্দরী মেয়ের তো অভাব নেই কলকাতা শহরে। অভাব আছে ভালোবাসার। আর বলতে কী ডাক্তার, পৃথিবীতে যেদিন থেকে টাকার খাতির বেড়েছে, ভালবাসার খাতির সেইদিন থেকেই কমেছে।

তখন কিন্তু আমার এ-সব জ্ঞান ছিল না। আমি ছোটবেলা থেকে টাকার অভাবটাকেই একমাত্র অভাব বলে জেনে এসেছিলাম। তাই অগাধ টাকা যখন পেলুম, মনে হলো তখন আমি হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলুম। মনে হলো আমার সব পাওয়া সম্পূর্ণ হল; আর কিছু পাওয়ার বাকি নেই।

কিন্তু তখন কি জানি, যে সেই পাওয়াতেই মানুষের সবচেয়ে বড় আনন্দ যে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়া জড়িত থাকে। পরে রবি ঠাকুরের একটা প্রবন্ধ পড়ে আমার ধারণা যে ভুল তা বুঝতে পারলুম, কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। তখন আর আমার শোধরাবার বয়েস নেই। তাই যখন আমার চোখ খুলল, দেখি আমার কোটি-কোটি টাকা, অজস্র প্রপার্টি, সব কিছু মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। আপনাকে আমার স্ত্রীর নামটা বলেছি?

ডাক্তার বললে, হ্যাঁ বলেছেন। রিটা।

তুমি ক'টা স্ত্রীলোক জীবনে দেখেছ, তা জানি না ডাক্তার। আমার স্ত্রীর মত স্ত্রীলোক তুমি দেখনি এ আমি হলফ্ করে বলতে পারি। কর্নেল চ্যাটার্জীর মেয়ে রিটা, সে যেভাবে মানুষ, যে-কালচারের মধ্যে বড় হয়েছে, তার নমুনা আমি আগে দেখিনি।

তবু আমার যখন টাকা আছে, তখন আমার ভয় কী? টাকা ওড়াবে ওড়াও! ড্রিঙ্ক করবে? করো। হাত খরচের জন্যে কত টাকা দরকার? নাও! টাকার অভাব আমি কখনও রাখতুম না রিটার। বুঝলে ডাক্তার? আমার অত টাকা খাবে কে? মানুষ তো সোনা খেতে পারে না। থাক, রিটাই সমস্ত টাকা খাক। তাকে নিয়ে প্রতিদিন ক্লাবে-ক্লাবে ঘুরতুম। সেখানে গিয়ে সে দু'হাতে টাকা ওড়াত। সে জানত যে আমার পড়ে পাওয়া টাকা, তাই সে-টাকার ওপর আমারও যেমন মায়া ছিল না, তেমনি তারও মায়া ছিল না।

কিন্তু তার জন্যে আমার দুঃখ ছিল না। দু'টো মানুষের সংসার চালাতে কত খরচ আর লাগে? দু' লাখ, পাঁচ লাখ, মাসে। কিন্তু তাতেও তখন আমার আপত্তি নেই। সংসারে তো মাত্র আমরা দু'জন প্রাণী। আর দশ-বারো জন চাকর খানসামা-চাপরাশী-আয়া। দু'জন আয়া ভাগাভাগি করে সর্বক্ষণ ডিউটি করত রিটার পেছনে। একজন দিনের বেলা, আর একজন রাত্তিরে। ঘুম আসবার আগে একজন রিটার পা টিপে দেবে, চান করবার আগে একজন পোশাক খুলে দেবে। ড্রেস করবার পর সারা গায়ে পাউডার মাখিয়ে দেবে। তারপর বাথরুমের জন্যে একজন মালি ছিল, সে সারা মাসে বাথরুমের জন্য ফুল সাপ্লাই করবে। তুমি কখনও বাথরুমে ফুলের ভাস দেখেছ ডাক্তার? তা হলে আমার বাড়ির বাথরুমে যেও, দেখবে প্রতিদিন চল্লিশ টাকা দামের ফুলের তোড়া দিয়ে সেই বাথরুম সাজানো থাকে। বাথরুমের ফুল সাপ্লাইয়ের জন্যে মাসে কত টাকার বিল হয় জানো? তুমি হয়তো ভাবছ, আমি এত খরচের জন্যেই আমার স্ত্রীর নিন্দে করছি, কিন্তু তা নয় ডাক্তার। টাকা পেয়ে যদি কেউ খুশি হয় তো তার চেয়ে বোকা আর কেউ নেই। সেই টাকা দিয়ে যদি কাউকে বশ করা যায়, তো তার চেয়ে সহজ কাজ আর কিছু নেই।

কিন্তু তা নয়। রিটা ক্লাবে ড্রিঙ্ক করবে, তার জন্যে টাকার সমস্যাই নেই। ছেলে-মেয়ে থাকলে তাদের জন্যেও তো টাকাখরচ করতে হতো।

তা একদিন হল কি ডাক্তার, ক্লাবে ড্রিঙ্ক করছি, রিটাও আছে। হঠাৎ রিটা কী করলে, সে আমার মাথা লক্ষ্য করে মদের গেলাসটা ছুঁড়ে মারলে। আমি তো অবাক। আমি রুমালটা দিয়ে আমার কপালটা চেপে ধরলুম। কিন্তু ভাগ্যিস বেশি লাগে নি। অল্পের জন্যে আমি বেঁচে গেলুম। তবে আমার কী রকম অবাক লাগল। আমি তাড়াতাড়ি রিটাকে ধরে গাড়িতে পুরলুম।

বাড়িতে এসে সোজা নিজের বেডরুমে ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কী

হল তোমার রিটা? আমাকে গেলাস ছুঁড়ে মারলে কেন অমন করে? আমি কী করেছিলুম?

রিটা কাঁদতে লাগল। বললে, তুমি কিছু মনে করো না, আমার খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল।

বলে রিটা ক্ষমা চাইলে। আমিও জিনিসটা কিছুদিন পরে ভুলে গেলুম। তার ঠিক দু'চার দিন পরেই আবার ওই রকম। ক্লাবে গিয়ে গেলাস-টেলাস ভেঙে একেবারে একসা করে দিলে। আমার খুব লজ্জা করতে লাগল সেদিন। ক্লাবের যা লোকসান হল, সব আমি খেসারৎ দিয়ে দিলাম। তার পরের দিন অন্য ক্লাবে গেলাম। দিনকতক পরে সেখানেও ওই। আমার লজ্জার একশেষ। টাকা তো নষ্ট হলই, তাব জন্যে কিছু নয়। কিন্তু আমার মনে হতে লাগল, আমি সমাজে মুখ দেখাব কী করে?

তারপর আর কোনও দিন কোথাও যেতুম না। রিটা বাড়িতে বসে ড্রিঙ্ক করতে লাগল সন্ধ্যেবেলাটা। তারপর পাঁচ-ছ'পেগ যখন তার পেটে পড়ত, তখন অবশ হয়ে আপনিই ঘুমিয়ে পড়ত। রিটার আয়া তখন তার পা টিপতে বসত, আর আমি চলে যেতাম আমার নিজের ঘরে।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করছি দু'জনে। কোনও তর্ক নেই বিতর্ক নেই, হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। রিটা ডিমের ডিশটা একেবারে সোজা আমার মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলে। আমি কিছু বললুম না। বাথরুমে গিয়ে মুখ-চোখ ধুয়ে নিলাম।

কিন্তু চাকর-খানসামারা জিনিসটা লক্ষ্য করছিল। পাছে তাদের মধ্যে এই নিয়ে কোনও আলোচনা হয়, তাই আব রিটাকে কোনও কথা বললাম না। চুপি-চুপি, যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে অফিসে যাবার জন্যে গাড়িতে গিয়ে উঠলুম।

অফিসে গিয়ে কিন্তু আমার কিছুই মনে রইল না। অফিসটা এমনই একটা জায়গা যেখানে গিয়ে আমার 'আমি'টা তৃপ্তি পেত। গেট থেকে সেই যে আমার সেলাম শুরু হত, আর থামতে চাইত না যতক্ষণ না আমি আমার ঘরে চেয়ারে গিয়ে বসতুম।

সেখানে গিয়েও সারাদিন কেবল সেলাম আর সেলাম। 'স্যার' ছাড়া আর কেউ অন্য নামে ডাকত না। আমি সকলের 'স্যার', আমিই সকলের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। আমিই সকলের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। ওরও একটা নেশা আছে ডাক্তার। ওটাও আর একটা বিষ, জান? যেদিকেই চাই সমস্তই আমার সাম্রাজ্য, আর আমিই সেই সাম্রাজ্যের একমাত্র অধিকারী, এই ভাবটা মানুষের পক্ষে যে কত ক্ষতিকর, তা টের পেলাম। আসলে কিন্তু ওটা

আমার ভালও লাগত। মদ কি সিগারেট খাওয়া যে বিষ খাওয়া জেনেও যেমন মদ কি সিগারেট খায় লোকে, তেমনি 'স্যার' ডাকটা খারাপ জেনেও লোকের ওটা ভাল লাগে। আমার তেমনি ভাল লাগত। কিন্তু বুঝতাম যে ওটা আমার দুর্বলতা।

কিন্তু সংসারী মানুষ যখন হয়েছি, তখন তো ও-সব দুর্বলতা আমার থাকবেই। তাতে আমি আক্ষেপ করব কেন? সেটা আমার সংসারের চাহিদা। আমি টাকা করেছি, তোমরা আমাকে আলবৎ সম্মান দেবে।

লোকে তাই দেয়ও। আমার অফিস তাই সম্মান দেয়, আমার ক্লাব তাই আমাকে সম্মান দেয়, আমার বাঙালী-সমাজও তাই আমাকে সম্মান দেয়।

কিন্তু তোমাকে বলি ডাক্তার, সেইটুকুই তো সব নয়। আমার এই বাইরেটার ভেতরে তো আর একটা মানুষ আছে, যে-মানুষটা এই সেলাম ছাড়া আরও কিছু চায়?

—সেই 'আরো কিছু'টা হল মনের খোরাক। তোমাকে আমি বলছি সেই মনের খোরাকের দিক থেকে আমি ভিখারিরও অধম। সেখানে আমি একটা কাঙাল ছাড়া আর কিছু নয়।

তা যাকগে সে-সব কথা। আসল কথা বলি। একদিন একজন ডাক্তারের কাছে গেলাম। তাকে সব বললাম বুঝিয়ে। তিনি এসে রিটাকে একলা ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলেন। আমি বাইরে ছিলাম। ডাক্তার বেরিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি বিয়ে করেছেন কত দিন আগে?

বললাম, পাঁচ বছর আগে?

ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, ছেলে-মেয়ে সন্তান কিছু হয়েছে?

আমি বললাম, না।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, মেডিকেল পরীক্ষা করিয়েছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ, কোনও ডিফেক্ট নেই।

বলে তাকে মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখালাম। ডাক্তার দেখে-শুনে সেটা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর আমাকে প্রশ্ন'র পর প্রশ্ন করতে লাগলেন।

বললেন, আপনি দিনের কতখানি সময় দেন আপনার স্ত্রীর জন্যে?

বললাম, অফিসের কাজে খুব ব্যস্ত থাকি, বেশি সময় পাই না, কিন্তু শনিবার-রবিবারগুলোতে স্ত্রীকে ক্লাবে নিয়ে যাই। একদিন হঠাৎ আমার স্ত্রী আমাকে মদের গেলাস ছুঁড়ে মারলে, তারপর থেকে প্রায়ই সেই ঘটনা ঘটতে লাগল। একদিন ব্রেকফাস্টের টেবিলে ডিম শুদ্ধ একটা ডিশ আমার

মুখে ছুঁড়ে মারলে। তখনই আমার ভয় হল। তখনই আপনার কাছে ছুটে গেলাম।

তারপর জিজ্ঞেস করলাম, আমার স্ত্রীর মাথাটা কি খারাপ হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত ?

ডাক্তার বলল, খারাপ হয়ে যেত, কিন্তু এখন থেকে চিকিৎসা করলে তা হয়তো আর হবে না।

তিনি ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে দিলেন। আর বললেন, ওষুধ তো দিলাম, কিন্তু এ-রোগের চিকিৎসার জন্যে আপনাকেও একটু সময় খরচ করতে হবে।

বললাম, কী করতে হবে, বলুন।

ডাক্তার বললে, আপনি স্ত্রীকে নিয়ে কখনও বেড়াতে গেছেন ? কলকাতার বাইরে বা ইণ্ডিয়ার বাইরে।

আমি বললাম, না।

ডাক্তার বললেন, কেন যান নি আপনি। আপনার কি টাকার অভাব।

বললাম, না।

—তা'হলে ?

বললাম, আমার সময়ের অভাব।

ডাক্তার বললেন, আপনার সময়ের দাম বড় না আপনার মনের শান্তির দাম বড় ? স্ত্রীর পেছনে যদি সময়ই না দিতে পারবেন, তা'হলে তাঁকে বিয়ে করেছিলেনই বা কেন ? আসলে আপনার স্ত্রীর অসুখের জন্যে আপনিই দায়ী।

আমি আর এর জবাব দিতে পারলাম না।

ডাক্তার বললেন, আপনার শ্বশুর-শাশুড়ি বা শালী আছে ?

আমি বললাম, না।

ডাক্তার বললেন, তা'হলে তো আরো বিপদ আপনার। আপনার ওপর আরো বেশি দায়িত্ব পড়ে গেল। আপনি যদি চান যে, আপনার স্ত্রী ভাল হয়ে উঠুক, তা'হলে আজ থেকে আপনি অফিসে যাওয়া বন্ধ করে দিন। টাকা তো অনেক উপায় করলেন। অত টাকা নিয়ে আপনার হবেই বা কি ? আর, আর একটা কাজ করুন, আপনি কোথাও না কোথাও স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে যান। এই ধরুন, সকাল বেলা গাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে বেরোলেন। যশোর রোড ধরে যতদূর চোখ যায় চলে গেলেন। সেখানে মাঠের ওপর চিৎপাত হয়ে আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে রইলেন। তারপর যখন ক্ষিধে পাবে কাছাকাছি কোনও ভাতের হোটেলে গিয়ে ভাত খেয়ে

নেবেন। কিংবা যদি তা না করতে পারেন তো টিফিন কেরিয়ারে ভাত আর ফ্লাস্কে করে জল নিয়ে গেলেন। কোনও মাঠের ওপর বসে খেয়ে নিলেন। জীবনটা নেচারের সঙ্গে মিশিয়ে দিন। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই মানুষের এত রকমের রোগের সৃষ্টি হয়েছে। যখন এই সভ্যতা আসেনি, তখন মানুষের এ-সব রোগ ছিল না। যত আমরা নেচার থেকে, প্রকৃতি থেকে সরে আসছি, এয়ার-কণ্ডিশন করা ঘরের ভেতরে আকাশের নীল আর বাইরের হাওয়া থেকে নিজেদের আড়ালে রাখছি, ততই প্রকৃতি আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। আমরা নানারকম রোগে ভুগছি।

ডাক্তার আমাকে লম্বা বক্তৃতা দিতে লাগলেন। যেন আমি শিশু। অথচ আমি তো সব বুঝি। ডাক্তার আমাকে যে-কথাগুলো বলছিলেন সব তো আমার জানা। তবে কেন আমি প্রতিবাদ করলাম না তাঁর কথার? প্রতিবাদ করলাম না এই কারণে যে আমার মনে হলো আমারও কিছু আঘাত পাওয়া দরকার ছিল তখন। টাকাই আমার সর্বনাশ করেছিল ডাক্তার, শুধু টাকা। আমি হঠাৎ অনেক টাকার মালিক হয়ে গিয়ে প্রকৃতিকে পর্যন্ত অস্বীকার করতে শুরু করেছিলাম। সেইটেই ছিল আমার পাপ, সেইটেই ছিল আমার অপরাধ। তা ডাক্তার তো সব বলে কয়ে ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন একমাস পরে তাঁকে রিপোর্ট দিতে।

সেইদিন থেকেই আমি চিকিৎসা শুরু করে দিলুম। রিটাকে নিয়ে আমি যশোর রোড ধরে চলতে শুরু করতাম ভোরবেলা। গাড়ি চলত ঘণ্টায় আশী-নব্বই মাইল স্পীডে। ড্রাইভারকে বলে দিতাম যেখানে ইচ্ছে যতদূর গাড়ি যেতে পারে চালাও। আমার ব্যাগে টাকা, সঙ্গে সব রকমের খাবার। তখন মনে হত না রোদ লাগবে, মনে হত না ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবে. তখন মনে হত না যে আমি মিলিওনীয়ার। তখন আমি প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছি। তখন শুধু মনে হত আমি গ্রীয়ারসন অ্যাণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর নই, আমি অর্ডিনারি একজন মানুষ শুধু। তখন একবারও ভাবতুম না যে আমার কোম্পানীর অডিট হওয়ার টাইম আসছে। আমার কোম্পানীর বাজেট তৈরির কাজ বাকি রয়েছে। কিংবা ইণ্ডিয়া গভর্মেন্ট আর শেয়ার হোল্ডারের কাছে আমার ব্যালেন্স সীট সাবমিট করতে হবে। কিংবা বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের মীটিং ডাকা হল না এখনও। এ-সব চিন্তাও আমার মনে আসত না। শুধু একটা কথাই আমার মনে আসত, সেটা হচ্ছে এই যে, আমি রিটার স্বামী আর রিটা আমার স্ত্রী।

এই রকম করে একটা মাস চালাবার পর ডাক্তারকে আবার বাড়িতে

কল দিলুম। ডাক্তার এলেন। আবার আমার স্ত্রীকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। শেষকালে বললে, এখন মিসেস সেনের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়েছে, এখন এইরকম করে আরো কয়েকমাস চালিয়ে যান। তবে যদি একটা সন্তান হত আপনাদের তো আরো শিগগির উন্নতি হত।

ডাক্তার তো চলে গেলেন। কিন্তু তখন থেকে শুরু হল আমাদের জীবনে আর এক বিপদ।

বুঝলে ডাক্তার, কার্লমার্কস্‌কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল -হোয়াট ইজ্ হ্যাপিনেস? তিনি জবাব দিয়েছিলেন—স্ট্রাগল্! অর্থাৎ সংগ্রাম। তার মানে যে-মানুষ সুখ খুঁজতে চাইবে তার মত বোকা আর দুনিয়ায় দু'টো নেই। সংগ্রামই হচ্ছে একমাত্র সুখ। সুখ যদি টাকাতে থাকত তো আমি তো সুখীই হতুম। বাড়ি-গাড়ি, লোক-লস্কর থাকলে যদি সুখী হওয়া যেত, তা'হলে তো আমিই সকলের আগে সুখী হতাম।

কিন্তু আমার জীবন দিয়ে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি তাই দিয়েই আমি তোমাকে বলছি, কাজের মধ্যেই সুখ খুঁজো তুমি, এই রোগীদের সেবার মধ্যে দিয়েই সুখ খুঁজতে চেষ্টা কর।

তা'হলে এবার বলি কী বিপদটা হল তারপর। সেদিনও বাড়ি থেকে বেরিয়েছি গাড়িতে রিটাকে নিয়ে। একটা জায়গায় গিয়ে দেখি রাস্তার বাঁ পাশে একটা গাঁয়ের পরিবেশের মধ্যে চায়ের দোকান।

রিটা বললে, চলো ওই চায়ের দোকানে একটু চা খাব।

সঙ্গে ফ্লাস্কের ভেতরে আমার অনেক চা ছিল।

বললাম, চা তো ফ্লাস্কে রয়েছে, খাবে, তো খাও না।

রিটা বললে, ও চা নয়, ও চা তো রোজই খাই, দোকানের সস্তা চা খাব। মাটির ভাঁড়ে করে ওরা সবাই যে চা খাচ্ছে, সেই চা।

প্রাচুর্যের এই একটা দোষ। প্রাচুর্যের একটা অভিশাপ আছে। দরকারের বেশি কোনও জিনিসই ভাল নয়। বেশি মেয়েমানুষ, বেশি বিলাসিতা বা বেশি টাকা যেমন ভাল নয়, তেমনি বেশি আরাম বেশি অবসরও ভাল নয়। কোনও কিছুই বেশি ভাল নয়। তাতে জীবন তেতো হয়ে যায়, তাতে বাঁচার মধ্যে কোনও মাধুর্য থাকে না।

দোকানদার তো অবাক হয়ে গেল আমাদের দেখে।

দোকানটাকে একটা ঝুপড়ি বললেই যেন ভাল হয়।

একটা বাঁশের মাচা। তার ওপরে দু'একজন বেকার লোক বসে ছিল। তাদের খালি গা, খালি পা, ময়লা কাপড় তাদের পরনে।

আমরা যেতেই তারা সরে দাঁড়াল। আমাদের মত বড়লোক এত

বড় গাড়ি থেকে নেমে তাদের দোকানে বসে মাটির ভাঁড়ে চা খাবে, এ ঘটনা তাদের কাছে অবাক হওয়ার মত।

তাদের যতদূর সাধ্য তেমনি ভক্তিভরে আমাদের তিনজনের জন্যে চা করে দিলে। কাঁচের গেলাস গরম জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে চা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু রিটা বললে, না, ওই মাটির ভাঁড়ে করে চা দাও।

দোকানী তো অবাক। এমন ঘটনা সে আগে কখনও দেখেনি।

বললে, আপনারা কেন কষ্ট করে নোংরা জায়গায় নামবেন হুজুর! আপনারা গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসুন, আমি গাড়ির ভেতরেই চা দিয়ে আসব আনারা বসে আরাম করে চা খাবেন, এখানে বড্ড কাদা।

আমিও রিটাকে বললাম, হ্যাঁ, কেন মিছিমিছি নামবে তুমি, এখানে বড় কাদা।

রিটা বললে, না, আমি মাটিতেই নামব—হোক কাদা।

বেশি চাপাচাপি করলে পাছে রিটার অসুখ আবার বেড়ে যায়, তাই আর প্রতিবাদ করলাম না। রিটার হাতটা ধরলাম, ধরে নামিয়ে সেই দোকানের ওপরে বসলাম। দেখলাম, রিটার চেহারা যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। সে তখন মাটির ভাঁড়ে করে চা খাচ্ছে আর চারিদিকে চেয়ে দেখছে।

দোকানী তটস্থ। বললে, চিনি ঠিক হয়েছে তো, আর চিনি দেব!

রিটা বললে, না, খুব ভাল চা হয়েছে।

অথচ আমার জিভে তখন চা তেতো লাগছে। যে চা আমার খারাপ লাগছে, সেই চা-ই আবার রিটার কেন ভাল লাগছে বুঝতে পারলাম না।

দোকানী বললে, বিস্কুট দেব হুজুর?

আমি বললাম, না, ও-সব বিস্কুট চলবে না।

রিটা বললে, না-না, ওই বিস্কুটই দাও আমাদের।

যে বিস্কুট আমাদের বাড়িতে কুকুর-বেড়ালেও খায় না, সেই বিস্কুটই খুব আরাম করে খেতে লেগেছে রিটা। যাক্ যাতে রিটা সুখ পায়, তাই-ই করা উচিত। আমি তার কথা মতই চলব। ডাক্তার আমাকে তাই-ই বলে দিয়েছিল।

আমি দেখলাম, কিছুদিনের মধ্যেই যেন রিটার চেহারা বদলে গেল। আর সে-রকম মেজাজ নেই। বড় মিষ্টি ব্যবহার করছে সকলের সঙ্গে।

ডাক্তার তাই বলেছিলেন। ডাক্তার জিজ্ঞেস করতেন, কেমন আছেন এখন মিসেস সেন?

আমি বলতাম, আগের চেয়ে এখন অনেক ভাল।

—আর সে-রকম চায়ের কাপ-ডিশ ভাঙেন না তো?

বলতাম, না, এখন অনেক নরম্যাল।

ডাক্তার বলতেন, তাহ'লে ওই ওষুধই চালিয়ে যান, আর মিসেসকে নিয়ে যেমন বেড়াচ্ছেন তেমনি বেড়াবেন। আপনার অফিস-টফিসের কথা এখন একেবারে ভুলে যান।

কিন্তু ওই যে বললুম ডাক্তার, জীবনটা একটা ধাঁধা আমরাও হল তাই। যে স্ত্রীর জন্যে আমি অফিস ছাড়লুম, সব কিছু ছাড়লুম, সেই স্ত্রীই শেষ পর্যন্ত আমার চরম শত্রু হয়ে উঠল। সেই গল্পই আজ তোমাকে বলি শোন।

একদিন হল কি রিটাকে নিয়ে একটা গ্রামে গিয়েছি, সেখানে একটা কাণ্ড হল। আমরা একটা মাঠে গিয়ে বসে আছি। দূরে মাঠের অন্যদিকে কতগুলো ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছিল।

রিটা বললে, ও দেখ-দেখ, ওই ছেলেটা কী সুন্দর দেখছ—

আমি চেয়ে দেখলাম। সত্যিই ছেলেটা সুন্দর দেখতে।

রিটা বললে, ও ছেলেটাকে আমাদের দেবে না ?

আমি বললাম, কী যে বল তুমি ওদের ছেলে আমাদের দেবে কেন ?

রিটা বললে, কেন দেবে না ? আমরা তো টাকা দেব ওদের !

আমি বুঝিয়ে বললাম, দেখ, সকলে তো টাকার ভক্ত নয়, টাকা দিলেই যে ওরা ছেলে দেবে তার কী মানে আছে ?

রিটা বললে, না, টাকা দিলে সব কেনা যায়। ওই ছেলেটাকে ডাকো না একবার, ডাকো না তুমি।

আমি ভীষণ বিরক্ত হলাম। কিন্তু উপায়ও নেই। আবার শুনতেই হবে।

আমি গিয়ে ছেলেটাকে ডেকে নিয়ে এলাম। ছেলেটা কাছে আসতেই রিটার মুখটা কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রিটা ছেলেটার হাতটা ধরে নিজের কাছে টানলে। বললে, তোমার নাম কী খোকা ?

ছেলেটা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল আমাদের দেখে। তাকে ডাকবার সঙ্গে-সঙ্গে আরো অনেকগুলো ছেলেমেয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।

তাদের মধ্যে একজন ছেলে বললে, ওর নাম বিশু।

রিটা বললে, তোমার বাড়ি কোথায় ?

বিশু দূরে গ্রামের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ওইখানে।

রিটা জিজ্ঞেস করলে, তোমরা ভাই-বোন ক'জন ?

বিশু বললে, আমরা তিন ভাই, আমাদের এক বোন।

একজন ছেলে পাশ থেকে বলে উঠল, আমি ওর ছোট ভাই, আমার নাম শিশু।

রিটা বললে, বেশ নাম তো তোমাদের, বিশু আর শিশু। বাড়িতে তোমাদের কে আছে?

একজন বললে, ওর বাবা আছে, মা আছে, আর একজন পিসীমা আছে।

—তোমরা আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?

লজ্জায় পড়ল বিশু। বললে, তুমি কী করে যাবে বাড়িতে?

রিটা বললে, কেন, আমি হেঁটে-হেঁটে যাব।

বিশু বললে, না, তুমি যেতে পারবে না, সেখানে রাস্তায় খুব কাদা, তোমার ফরসা কাপড়ে কাদা লেগে যাবে।

রিটা উঠে দাঁড়াল। বললে, লাগুক গে কাদা, আমি তবু যাব, আমাকে নিয়ে চল।

সত্যি ডাক্তার, সে এক দৃশ্য বটে! ভেবে দেখ, সেই অতগুলো ছেলে-মেয়ে হৈ-হৈ করে চলতে লাগল গ্রামের দিকে, আর রিটা তাদের সঙ্গে চলতে লাগল। আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ আমাকেও সেই কাদার মধ্যে তাদের পেছন-পেছন চলতে হল। কিছু বলতেও পারি না, কিছু বাধা দিতেও পারি না। বাধা দিলেই আবার রিটা বিগড়ে যাবে। ডাক্তার বারণ করে দিয়েছে তা করতে।

সে-যে কী রাস্তা ডাক্তার, তোমাকে কী বলব। আমার প্যাণ্ট-মোজা-জুতোর যা অবস্থা হল, তা তুমি কল্পনা করে নাও। আর রিটার শাড়ির অবস্থা যা, তা বর্ণনা করা অসম্ভব। কিন্তু তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই তার। সে-ও বেশ হৈ-হৈ করতে-করতে চলেছে।

আমি তার অবস্থা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি তখন। কই, এখন তো কোনও পাগলামি নেই। যে মানুষ বাড়িতে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতে পারে না, রাত্রে আয়া পা না টিপলে যার ঘুম আসে না, সে মানুষ কী করে এত পরিশ্রম করছে, তা কল্পনা করাও যায় না।

আমি তো অবাক হয়ে গেলুম আমার স্ত্রীর উৎসাহ দেখে। সত্যি ডাক্তার, সেই আমার জল-কাদা ডিঙ্গিয়ে যাবার দৃশ্যটা কল্পনা করো। যে পলটু সেন তখন এয়ার কণ্ডিশন ঘর ছাড়া এক মিনিট থাকতে পারে না, সেই পলটু সেন কোন্ এক অচেনা গ্রামের জল-কাদা-ঘাসের মধ্যে হাঁটতে-হাঁটতে চলেছে। পাগলামিরও একটা শেষ আছে, কিন্তু রিটার পাগলামির যেন শেষও ছিল না।

শেষকালে সেই ছেলেটা একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, এইটেই আমাদের বাড়ি।

আমাদের দু'জনকে দেখে তখন পাড়ার সব লোক এসে ভিড় জমিয়েছে

সেখানে। তারা বুঝতে পারছে না কে আমরা, কী জন্যে এসেছি, কাকে চাই। আমাদের মত সাজপোষাক, আমাদের মত চেহারার লোক তারা আগে কখনও গ্রামে ঢুকতে দেখেনি। চিড়িয়াখানাতে মানুষ যে-দৃষ্টি দিয়ে বাঘের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখে, সেই দৃষ্টি দিয়েই তারা আমাদের দেখতে লাগল। তাদের চাউনি যেন বড় অস্বস্তিকর লাগতে লাগল আমার। তারা জানেও না আমি তাদের সমস্ত গ্রামসুদ্ধ লোককে চাকরি দিতে পারি, দরকার হলে তাদের গ্রামটা কিনেও নিতে পারি।

কিন্তু না, আমার তখন অন্য কথা মনে পড়ল। আমার তখন মনে হল। তাদের মধ্যে আমি যেন আমার আসল আমিকেই দেখতে পেলুম। একদিন ওদের মত অবস্থাই তো ছিল আমার। ওদের মত ময়লা কাপড় পরে আমি দিন কাটাতাম।

কতক্ষণ এমনি অন্যমনস্ক ছিলাম জানি না। হঠাৎ টনক নড়ল একজনের কথায়। একজন মহিলা তখন চীৎকার করে আমার স্ত্রীকে বলছে, টাকা? আমাকে টাকা দেখাচ্ছেন আপনি! আমি ছেলে বেচব? আপনারা আমার বাড়ীর সামনে থেকে চলে যান।

আমার স্ত্রীর হয়ে তখন আমাকেই এগিয়ে যেতে হল।

বললাম, মা, আপনি অত রেগে যাচ্ছেন কেন? আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়ে নেই, তাই আপনার ছেলেটিকে আমি নিজের ছেলের মত মানুষ করতে চাইছি, আর কিছু নয়। আপনি যদি ছেলেটিকে আমাদের কাছে দেন তো খুব সুখেই থাকবে। আর মাসে একবার করে তাকে আপনার কাছে নিয়ে এসে আপনাকে দেখিয়ে যাব। আপনি রাগারাগি করছেন কেন?

মহিলাটি বললে, তোমাদের তো খুব আস্পর্দা বাবু, আমরা গরীব লোক হতে পারি, কিন্তু আমাদের অভাব এত হয়নি যে, আমরা ছেলে বিক্রী করে টাকা উপায় করব।

আমি বললাম, না, বিক্রির কথা হচ্ছে না, আপনার তো তিনটি ছেলে, আমাদের ভগবান একটা ছেলেও দেন নি। আপনি না হয় একটিকে আমাদের দিলেন। আপনার ছেলেকে আমরা খুবই যত্নে রাখব, তাকে মাস্টার রেখে পড়াব, ভাল-ভাল জামা-কাপড় কিনে দেব। আর আপনারা যখন ইচ্ছে গিয়ে ছেলেকে দেখে আসবেন। ছেলেটিকে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে, তাই এত কথা বলা।

এতক্ষণে ছেলেটির বোধহয় বাপ এসে হাজির হল। সে বোধহয় কোথায় দূরে কাজ করতে গিয়েছিল। বললে, কী হয়েছে? কী হয়েছে? এত ভীড় কেন গা এখানে?

তার স্ত্রী ঘটনাটা বুঝিয়ে দিলে সমস্ত। ছেলে নেব শুনে বাপটা তো রেগেই অস্থির। আপনারা বড়লোক তো বড়লোক, কিন্তু গরীব বলে কি আমরা মানুষ নই? গরীব লোকদের কি মায়া-দয়া থাকতে নেই? আমাদের ছেলে আপনাদের কাছে থাকবে, আর আমাদের মুখে ভাত রুচবে, তাছাড়া একটু বড় হলেই ওই ছেলে আমার কত উপকারে লাগবে তা জানেন? আজকাল মজুরের রোজ দিনে তিন টাকা। ছেলে চলে যাওয়া মানে তো একখানা হাত চলে যাওয়া।

আমি বললাম, তা আমি এই ছেলের জন্যে মাসে-মাসে চিরকাল পাঁচশো করে টাকা পাঠিয়ে দেব, আমি কথা দিচ্ছি। আর আমার মুখের কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তো আমি স্ট্যাম্পের ওপর সই করে এ-কথা লিখে দেব।

এই সময় তার স্ত্রী হাত নেড়ে বলে উঠল, কেন তুমি ওদের সঙ্গে অত বাজে কথা বলছ? টাকা বড় না ছেলে বড়? আমি ছেলেকে দেব না, এই শেষ কথা আমাদের—বলে নিজের ছেলেকে টেনে নিয়ে বাড়ির ভেতরে পুরে আমাদের মুখের ওপর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলে, বললে, আয় তো বিশু, ভেতরে চল।

রিটা আমার দিকে চাইলো। তার চোখ দু'টো আবার করুণ হয়ে উঠেছে তখন। আমার ভয় হতে লাগল আবার তার রোগটা চাগিয়ে উঠবে নাকি?

আমি তার হাত ধরে বললুম, এসো, চল বাড়ি যাই।

গ্রামের অন্য সব লোক যারা এতক্ষণ সব কিছুর সাক্ষী ছিল, সব কিছু দেখছিল, তারা আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

বললে, বাবু, আপনারা কিছু মনে করবেন না, ওই ভুবনের বউটা ওইরকম, বড় ঝগড়েটে মেয়েছেলে। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

আমি বললাম, কলকাতা থেকে।

আমরা হাঁটতে-হাঁটতে গাড়ির দিকে আসতে লাগলাম। তারাও সদলবলে আমাদের পেছন-পেছন আসতে লাগল। আমরা যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, তখন একজন সাহস করে সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, বাবুরা কি অন্য কারো ছেলে নেবেন?

আমি বললাম, অন্য কারো ছেলে আছে নাকি?

সে লোকটা বললে, হ্যাঁ বাবু, ছেলের অভাব কী? ক'টা চাই আপনাদের?

বললাম, তোমরা দেখাতে পার?

সে বললে, পরে যদি আবার আসেন তো দেখাব। কবে আবার

আপনারা আসবেন বলুন ?

বললাম, পরে একদিন এলেই হবে, এখনই ঠিক বলতে পারছি না কবে আসব।

সে তখন বললে, তা'হলে আপনাদের কলকাতার ঠিকানাটা দিয়ে যান বাবু, আমি না হয় তাকে নিয়ে আপনাদের বাড়ি যাব।

আমি আমার ঠিকানাটা বললাম। আর তাকে একটা দশটাকার নোটও দিলুম। আমি তখন চলে যেতে পারলে বাঁচি। কাদায়-জলে ঘামে আমার জুতো-মোজা ভিজে চ্যাপচ্যাপে হয়ে গেছে।

মদনকে বললাম গাড়ি চালিয়ে দিতে। তাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যেন আমি বাঁচলাম। জানো ডাক্তার, মানুষকে যে কতরকম বিচিত্র অবস্থার মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাতে হয়, তারই একটা ঘটনা তোমাকে বললাম। অথচ এক ছেলে ছাড়া আমার আর কীসের অভাব ছিল বলো তুমি ? আমি তো টাকা দিয়ে সে অভাবকে ভরাট করতে পারতুম। কিন্তু যা হবার নয় তাই-ই যদি হত, তাহ'লে তো আর মানুষের ভাবনা করার কিছু থাকত না।

ডাক্তার বললে, তারপর ?

পলটু সেন বললেন, এর দিনকতক পরের ঘটনা। আমার তখন মেজাজ খারাপ হয়ে রয়েছে। আমি সেই ঘটনার পর ডাক্তারকে ডেকে পাঠালাম।

ডাক্তার এসে জিজ্ঞেস করলেন, রোগী কেমন আছে ?

আমি সমস্ত ঘটনাটা ডাক্তারকে বললাম, ডাক্তার মিসেসকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন। তারপর আমার ঘরে এসে বললেন, মনটা দেখলাম, খুব ডিস্টার্বড রয়েছে মিসেসের।

বললাম, তাহ'লে কী করব আমি ? আমাকে কী করতে বলেন ?

ডাক্তার বললেন, আপনি যদি পারেন তো কারো ছেলেকে দত্তক নিন্। এমন কোনও আত্মীয় আছে আপনার, যাঁর অনেক ছেলে-মেয়ে, তাদের মধ্যে একটাকে তিনি আপনার কাছে রাখতে পারেন ?

আমি বললাম, তেমন কোনও আত্মীয় তো আমার নেই ডাক্তার।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মিসেসের ?

বললাম, আমার মিসেসেরও কোন তেমন আত্মীয়-স্বজন নেই।

ডাক্তার বললেন, এক্ষেত্রে অন্য কোনও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মেডিকেল কলেজ থেকেও এমন অনেক বেবি পাওয়া যায়, যার মা হসপিটালেই মারা গেছে, কিংবা কোনো ক্লেমেণ্ট নেই—এ-রকম বেবিও আপনি নিতে পারেন।

আমি বললাম, আপনি সেরকম ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ?

ডাক্তার বললেন, ওটা তো আমার ডিপার্টমেন্ট নয়, কোনও নার্সিংহোমে চেষ্টা করলে ও'রকম বেবি আজকাল অনেক পাওয়া যায়।

আমি বললাম, আমি যে বেবি খুঁজছি একথা জানাজানি হলে আমি আমার ক্লাবে মুখ দেখাতে পারবো না। তার চেয়ে বরং আপনিই একটু চেষ্টা করুন। আপনার তো অনেক জানা-শোনা নার্সিংহোম আছে।

ডাক্তার রাজী হলেন।

আমি রিটাকে নিয়ে ঠিক আগের মতই ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। কখনও কখনও অফিসে টেলিফোন করে খবরাখবর নিতাম কাজকর্ম কেমন চলছে? দরকার হলে তারাও আসত। চালু কোম্পানীর এই একটা সুবিধা যে মালিক না থাকলেও কাজ চলতে এমন কিছু অসুবিধে হয় না। সেরকম বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত নেবার দরকার হলেই তখন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের খোঁজ পড়ে। সেটা আমি বাড়িতে বসেই করতে পারতাম। অফিসে সবাইকে বলে দিয়েছিলাম যে আমার শরীর খারাপ, কিছুদিন বিশ্রাম করে তারপর অফিসে যাব। তারপর যখন কোন উপায়ই পাচ্ছি না, ঠিক সেই সময়েই সেই ঘটনাটা ঘটল।

তুমি তো জান ডাক্তার সংসারী লোকের পক্ষে স্ত্রীর অসুখটা একটা মারাত্মক ব্যাপার। আমার সমস্ত কিছু থেকেও তখন আমার যেন কিছুই নেই। আমি যেন সেই আগেকার মতই আবার নিঃসহায় হয়ে পড়েছিলাম। তখন আমার কেবল মনে হচ্ছে সেই আগেকার অবস্থাই বুঝি ছিল ভাল।

সেদিন আমি ব্রেকফাস্ট করছি, হঠাৎ আমার দারোয়ান এসে খবর দিলে যে একটা লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমাকে কে ডাকবে?

বীর সিংকে বললাম, তাকে অফিসে যেতে বলে দে, বল আমি কারোর সঙ্গে বাড়িতে দেখা করি না।

বীর সিং বললে, না, আমি বলেছিলাম, কিন্তু তা শুনছে না।

'ব্যাপারটা আমার কাছে খারাপ লাগল। আমি বাড়িতে কারো সঙ্গে দেখা করব না, এ আমার নিয়মই। কেউ চাকরি চাইতে আসবে, কেউ প্রমোশন চাইতে আসবে। আবার এমন অনেকে আছে, যারা চ্যারিটি চায়। সমস্ত দিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি কোনও মানুষ একবারের জন্যও নিজের মধ্যে ডুব দেবার সময় না পায় তো তাকে আমি মানুষ বলতে রাজী নই ডাক্তার। মানুষ যদি সত্যিই মানুষ হতে চায় তো তাকে যেমন সকলের মধ্যে ছড়িয়েও দিতে হবে, আবার তেমনি নিজের মধ্যেই নিজেকে গুটিয়েও নিতে হবে। নিজেকে যে মানুষ বহুর মধ্যে এক করতে পারে তাকেই বলি

মানুষ। তা না হলে কলকাতা শহরে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার উপকরণের তো শেষ নেই। ধরো ফুটবল, ক্রিকেট, সিনেমা, রাজনীতি—এই সব উপকরণ এ-যুগে এত আছে যে, মানুষের ভাবার জন্য আর কোথাও ফাঁক নেই। তাই আমার মতে ডাক্তার, জীবনে একটু ফাঁক দরকার, যে ফাঁকের ফুটো দিয়ে আমরা নিজেকে উঁকি মেরে দেখব।

কিন্তু যখন শুনলুম যে লোকটা আমাকে দেখবার জন্যে একেবারে নাছোড়বান্দা, তখন বললাম, আচ্ছা তুই তাকে এঘরে ডেকে নিয়ে আয়।

লোকটা যখন ঘরে এল তখন তাকে দেখে মনে হল ঘরে ডেকে আনাটা আমার ভুল হয়েছে। গায়ে ময়লা জামা, খালি পা, সঙ্গে একটা পাঁচ-ছ' বছরের ছেলে। ছেলেটা কিন্তু দেখতে বড় সুন্দর। বুঝলাম, সাহায্য চাইতে এসেছে।

আমি বললাম, কী চাই ? আমি কোনও সাহায্য দিতে পারব না।

লোকটা বললে, আমি সাহায্য চাইতে আসিনি হুজুর, আমি একে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। আপনি ছেলে চেয়েছিলেন।

আমি তো শুনে অবাক। বললাম, আমি কবে ছেলে চেয়েছিলাম তোমার কাছে ?

লোকটা বললে, সেই যে আপনি আমাদের ময়রাডাঙায় গিয়েছিলেন, মনে পড়ছে আপনার !

আমার তখন আবার সব মনে পড়ল। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে ?

লোকটা বললে, আজ্ঞে আমার নাম ভৈরব আড্ডি—আমি ময়রাডাঙায় থাকি।

—এ তোমার ছেলে ?

ভৈরব আড্ডি বললে, আজ্ঞে না, আমার নিজের কোনও ছেলেমেয়ে নেই। এ ময়রাডাঙার একজন বিধবার বোনপো। বিধবাটির অবস্থা বড় খারাপ, বোনপোকে খেতে দেবার পয়সা নেই। এর ওর বাড়ি খেটে খায়। আপনি ছেলে চেয়েছিলেন, তাই একে এনেছি।

আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না। মনে পড়ে গেল ময়রাডাঙা থেকে সেদিন ফেরবার সময় কয়েকজনকে বলে এসেছিলাম যে যদি কোন ভাল ছেলে তারা পায় তো যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। মনে পড়ল আমি আমার কলকাতার বাড়ির ঠিকানাও দিয়ে এসেছিলাম তাদের কাছে। ছেলেটাকে কিন্তু আমার ভাল লাগল ডাক্তার।

ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী খোকা ?

ছেলেটাকে খুব স্মার্ট মনে হল। বললে, আমার নাম খোকা কে বললে ?

আমার নাম তো খোকন। আমার আর একটা ভাল নামও আছে। ভাল নামটা বলব ?

আমি বললাম, বলো—

ছেলেটা বললে, আমার ভাল নাম দেবব্রত। দেবব্রত সেন।

লোকটা বললে, মাসি বলেছে আপনি যদি একে আপনার কাছে রাখেন তো তার বড় উপকার হয়।

—মাসি বললে কেন ? মাসি কে ?

লোকটা বললে, এই খোকনের মাসিই আমার মাসি। ময়রাডাঙায় আমরা সবাই মাসি বলেই ডাকি তাকে। বিধবা মানুষ তো, ভদ্দরলোকের বাড়িতে কাজ-কর্ম করে হু'পাঁচ টাকা যা পায় তাইতেই মানুষটা সংসার চালায়। কিন্তু এই ছেলেটার জন্যে তার খুব ভাবনা। মাসি চায় এ লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক। আপনার কাছে থাকলে তবু পেট ভরে এ খেতে পাবে, পরতে পাবে, আর লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারবে। এ মানুষ হয়েছে জানতে পারলেই তার সুখ, আর কিছু সুখ সে চায় না হুজুর।

আমি কী করব, কী জবাব দেব ঠিক বুঝতে পারলাম না। তুমি আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছ তো ডাক্তার ? আমি অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবতে লাগলাম। ওদিকে ছেলেটা একটা কাণ্ড করে বসল।

আমাকে বললে, তোমাদের বাড়িতে পিয়ানো আছে ?

আমি অবাক। পিয়ানোর নাম জানলে কী করে ছেলেটা ?

বললাম, না, আমাদের এখানে পিয়ানো নেই।

ছেলেটা অবাক হয়ে গেল আমার বাড়িতে পিয়ানো নেই শুনে। জিজ্ঞেস করলে, পিয়ানো নেই ? আমাদের বাড়িতে আছে।

আমি লোকটার দিকে চেয়ে বললাম, এদের বাড়িতে পিয়ানো আছে নাকি ?

লোকটা বললে, পিয়ানো কী জিনিস ? আমি তো ওদের বাড়িতে ঢুকিনি, আমি জানি না পিয়ানো ওদের বাড়িতে আছে কি না।

ছেলেটা বললে, না, আছে, সত্যিই আছে পিয়ানো, মাসি বাক্সের মধ্যে পিয়ানোটা রেখে দিয়েছে।

বাক্সর মধ্যে পিয়ানো কী করে থাকে বুঝতে পারলাম না।

আমি বললাম, বাক্সর মধ্যে কখনও পিয়ানো থাকতে পারে ? সে কত বড় পিয়ানো !

ছেলেটা দুই হাত দিয়ে পিয়ানোর মাপ দেখিয়ে দিলে। মাপটা চার-পাঁচ ইঞ্চির বেশি নয়। বুঝলাম, সেটা খেলবার পিয়ানো। বললাম, ওটা

আসল পিয়ানো নয়, খেলনার পিয়ানো।

ছেলেটা বললে, না, খেলনার পিয়ানো নয়, মাসি বলেছে ওটাই আসল পিয়ানো। মাসি মিথ্যে কথা বলে না।

ছেলেটার কথা শুনে অবাক। আমার মস্ত বড় ঘরখানার মধ্যে সে ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছিল, আর এক-একবার আমাদের কাছে এসে কথা শুনছিল। একবার আমার কাছে জিজ্ঞেস করলে, ওটা কী গো ? কী ওটা ?

দেয়ালের গায়ে একটা ঘড়ি লাগানো ছিল, সেই দিকে তাকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, ওটা কী ?

বললাম, ঘড়ি।

ছেলেটা বললে, ওর নাম ঘড়ি কেন ?

কেন যে ওটার নাম ঘড়ি তা আমি কেমন করে বোঝাব বল তো ডাক্তার ? মানুষের নাম মানুষ কেন, তার কি কোনও ব্যখ্যা আছে ?

সব জিনিসের ওপরেই ছেলেটার অদম্য কৌতূহল। আমার ঘরে আলমারির ভেতরে বই ছিল, স্ত্রীর ফটো ছিল। তাও জানবার ইচ্ছে তার, ওটা কার ছবি।

লোকটা বললে, ছেলেটা ভারী দুঃখী হুজুর। মাসি আমাকে বার-বার করে বলে দিয়েছে, ওকে যেন আপনি রেখে দেন।

আমি ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এই বাড়িতে থাকবে ?

ছেলেটা বললে, আমি এই বাড়িতে থাকলে মাসি কোথায় থাকবে ?

বললাম, তোমার মাসি সেই ময়রাডাঙায় থাকবে।

ছেলেটার মুখটা যেন শুকিয়ে গেল। বললে, তাহ'লে আমি তোমাদের বাড়িতে থাকব না। আমি মাসির কাছে ময়রাডাঙায় থাকব।

লোকটা যেন একটু বিব্রত হল।

বললে, না-না খোকন, তুমি এখানে থাকো, মাসিকে কালকে এখানে নিয়ে আসব। তুমি আজ এখানেই থাক। দেখ না এ কত বড় বাড়ি, এখানে মোটরগাড়ি আছে, কত খেলনা আছে। এখানে কলকাতায় মস্ত বড় চিড়িয়াখানা আছে, সেখানে বাঘ-ভালুক-সিংহ সব আছে।

আমি বললাম, তুমি চিড়িয়াখানা দেখবে ?

ছেলেটা বললে, তুমি দেখাবে ?

বললাম, হ্যাঁ, দেখাতে পারি।

ছেলেটা বললে, তাহ'লে মাসি আর আমি দু'জনে একসঙ্গে দেখব।

লোকটা রেগে গেল। বললে, মাসি পরে দেখবে, এখন তুমি একলাই দেখতে যাও, বাবু তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাবেন।

ছেলেটা বললে, আমি একলা দেখব না।

লোকটা বললে, অমন কথা বলতে নেই, বাবু রাগ করবেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে লোকটা বললে, ছোটবেলায় এর মা মারা গেছে কিনা, তাই মাসিকে এ বড্ড ভালবাসে। মাসিকেই এ নিজের মা মনে করে।

ছেলেটা বললে, না, মাসিই তো আমার মা।

আমি বললাম, কে বলেছে মাসি তোমার মা ?

ছেলেটা বললে, হ্যাঁ মাসি নিজে আমাকে বলেছে, মাসিই আমার নিজের মা, তুমি কিচ্ছু জানো না।

আমি হাসতে লাগলাম ছেলেটার কথা শুনে, কিন্তু লোকটা রেগে গেল। বললে, বাড়িতে গেলে তাকে মাসি বকবে, কিন্তু তা বলে রাখছি।

খোকন বললে, কেন, আমি কী করেছি ?

লোকটা আমার দিকে চেয়ে বললে, দেখছেন তো আমাকে কি বলছে ? মাসি ওকে বার-বার করে বলে দিয়েছে যেন আপনার কাছে এসে একটু ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। তা সে শুনছে না। আমি আসবার সময় বলে দিয়েছিলাম যে বেশি যেন দুষ্টুমি করিস নি বাবুর বাড়িতে গিয়ে, তা মোটে শুনছে না। আপনি কিছু মনে করবেন না বাবু, তবে ছেলেটি খুব ভাল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লেখাপড়া কিছু করেছে ?

লেখাপড়া ? লোকটা বললে, হুজুর গাঁয়ে থাকি আমরা, কোথায় পাব ইস্কুল ? আমাদের গাঁয়ে ইস্কুল-টিস্কুল কিছু নেই। ইস্কুল আছে সেই কলতায়। তা সেখানে পড়তে গেলেও পয়সা লাগে বাবু ! সে পয়সা কোথায় পাব আমরা ? আপনি ওকে ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে নেন তো দেখবেন ও খুব বড় হবে, সকলের মাথায় উঠবে।

খোকনের কানে কথাটা গিয়েছিল সে বললে, তোমাদের এখানে ইস্কুল আছে ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

ডাক্তার, একটা কথা বলছি তোমাকে, ছেলেমানুষের কোন জাত নেই। বয়স বাড়বার সঙ্গেই ছোট ছেলেদের জাত ভাগাভাগি হয়। নইলে সেইদিন সেই ময়রাডাঙা গ্রামের সেই গরীবের ছেলেটাকে দেখে কেন আমার অত ভাল লাগল ? তখন তো আমার একবারও মনে হল না যে এর বাবা কে, এর মা-ই বা কে, কী জাত, কী গোত্র এর ? সেই জন্যেই বলছি ছোট ছেলেদের গায়ে তার জাত-ধর্ম কিছুই লেখা থাকে না। বাগানের ফুলও যা, আর ছোট ছেলেমেয়েরাও তাই।

লোকটা বললে, হুজুর, আমি তাহ'লে যাই ?

খোকন বললে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব দাদা।

আমি বললাম, না, তুমি আমার এখানে থাকো না।

খোকন বললে, তোমার কাছে থাকব না, তুমি আমার মাসীকে এখানে নিয়ে এস, তাহ'লে আমি থাকব।

লোকটা বললে, তাহ'লে কিন্তু মাসি তোকে বকবে খুব, এই বলে রাখছি। মাসি আমাকেও কিন্তু বকবে। তখন আমি কী বলব?

খোকন সে-সব কথা শুনলে না। বললে, না, আমি এখানে থাকব না, আমি তোমার সঙ্গে বাড়ি যাব।

কিছুতেই থাকবে না ছেলেটা। আমিও আর পীড়াপীড়ি করলাম না। লোকটা ছেলেটাকে নিয়ে বকতে-বকতে চলে গেল। আমি আর কী করব, চুপ করে রইলুম।

* * *

ডাক্তার বললে—তারপর আর আসে নি সে?

পলটু সেন বললেন, দেখ ডাক্তার, লোকের টাকার অভাব থাকে, স্বাস্থ্যের অভাব থাকে, সেটা বুঝি। সে অভাব আমি নিজে হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি তবে সারা জীবন তো টাকাই চেয়েছিলুম। টাকা ছাড়া তো আর কিছুই আমি চাই নি জীবনে। ভেবেছিলুম, টাকা পেলেই তো সব পাওয়া হয়ে যায় মানুষের। ভাবতুম, যার টাকা আছে সে-ই সংসারে সবচেয়ে সুখী কিন্তু ভুল ভাঙল টাকা হওয়ার পর। আমি যদি মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ হতুম তো আমার স্ত্রীর এই অসুখ হত না। সংসারের অভাব-অনটনের মধ্যে বাজে কথা ভাববার সময়ই পেত না সে, রান্না-খাওয়া, বাসন-মাজা করতে-করতেই দিন কেটে যেত। তাতে স্বাস্থ্যও ভাল থাকত।

কিন্তু অসুখ যত বড়লোকদের। বিশেষ করে বড়লোকদের বউদের। তাদের নিজের হাতে কিছু কাজই করতে হয় না। না রান্না করা, না বাসন মাজা, না ঘর ঝাঁট দেওয়া। কাপড়ও কাচতে হয় না নিজের হাতে। আর আমার স্ত্রীর তো আরো কম কাজ। চানও করতে হত না নিজে-নিজে। তার আয়া ছিল, সে রিটাকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে দিত, ঘুমোবার আগে পা টিপে দিত। এক গ্লাস জল গড়িয়ে খাওয়া সেটাও যেন ছিল তার কাছে কষ্টের।

তা এদের অসুখ হবে না তো কাদের হবে? সভ্যতার বিষ আমাদের বড়লোকদের ঘরে-ঘরে এখন ক্যানসারের মত আসন গেড়ে বসেছে। আমার বাথরুম পর্যন্ত এয়ার-কনডিশন করা। তাহ'লে রোগ ঢুকবে না কেন? রোগের কী অপরাধ?

যে লোকটা ছেলেটাকে নিয়ে এসেছিল তাকে দশটা টাকা দিয়েছিলাম। বলে দিয়েছিলাম, তোমাদের গাড়িভাড়ার জন্যে এই টাকাটা নাও, আর ছেলেটাকে কিছু খাইয়ে দিও। আর যদি এ আমার কাছে থাকতে চায় তো পরে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে এস।

লোকটা ওই কথা শুনে চলে গিয়েছিল। তার কিছুদিন পরে আমরা যথারীতি বিকেলবেলা বেরিয়ে যথারীতি রাত্রে ফিরেছি। বাড়িতে ফিরে দেখি সেই ছেলেটাকে নিয়ে সেই লোকটা সদর-গেটের সিঁড়ির ওপর শুয়ে আছে। আমার দারোয়ান বীর সিং তাদের ভেতরে ঢুকতে দেয় নি। আমি দেখেই চিনতে পেরেছি তাদের।

দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কখন এসেছে ?

দরোয়ান বললে, আপনি বেরিয়ে যাবার পরই এসেছে, আমি ওইখানে বসিয়ে রেখেছি। ওখানে বসে-বসেই ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভাবলাম, দরোয়ানের কী দোষ। তার ডিউটি সে করেছে।

রিটা বললে, কারা ওরা ?

বললাম, ওরা সেই ময়রাডাঙা থেকে এসেছে।

ময়রাডাঙার কথা শুনে রিটা যেন কেমন হয়ে গেল। রিটার বড় খারাপ অভিজ্ঞতা আছে ময়রাডাঙ্গা সম্বন্ধে। সেদিন সেখানে গিয়ে যে অপমান সে পেয়েছিল, তা বোধহয় সে এখনও ভুলতে পারে নি।

বললে, আবার কেন এসেছে ? ওদের সঙ্গে তুমি দেখা করো না, ওদের তাড়িয়ে দাও তুমি। ময়রাডাঙার লোক ভাল হয় না, ভারি বজ্জাত ওরা।

এ-কথার ওপর আমি কোনও মন্তব্য করলাম না। রিটা বাড়ির ভেতর চলে গেল। আমি দারোয়ানকে ডেকে বললাম, ওদের ঘুম ভাঙিয়ে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি ড্রয়িংরুমে আছি। দেখবে, মিষ্টি করে কথা বলবে ওদের সঙ্গে।

বলে আমিও ভেতরের ড্রয়িংরুমে গিয়ে ঢুকলাম।

আমার দরোয়ান তাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলে। লোকটা ধড়ফড় করে উঠে বসেছে। বললে, কী গো, কী ? কত রাত হল ? বাবু এসেছে ?

দরোয়ান বললে, হ্যাঁ, বাবু আ গয়া।

এত রাত পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে লোকটা ভয় পেয়ে গেল। এত রাতে বাড়ি ফিরবে সে কী করে ? এখন তো ময়রাডাঙায় যাবার বাস নেই আর। দরোয়ান বললে, চল, বাবু তোমাদের ডেকেছে।

লোকটা ঠেলতে লাগল ছেলেটাকে। বললে, ওরে খোকন, ওঠ্, ওঠ্, উঠে পড়, বাবু ডেকেছে।

সিমেন্টের রোয়াক। ধুলো-ময়লা ভর্তি, তবু তার ওপরেও ঘুমিয়ে পড়তে তাদের বাধে নি। বড় আরামে ঘুমোচ্ছিল তারা। খোকন উঠল। ঘুম জড়ানো চোখ, ঘুম যেন আর তার কাটতে চাইছে না।

লোকটা বললে, ওরে খোকন, ওঠ-ওঠ, উঠে পড়।

খোকনের যেন আর দাঁড়াবার ক্ষমতাও নেই। লোকটা তাকে বললে, চল্, হেঁটে চল্।

শেষকালে লোকটা খোকনকে নিজের কোলে তুলে নিলে। কোলে তুলে নিয়ে সেই ভাবেই দরোয়ানের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে লাগল। বিরাট বাড়ি। লোকটা আগে একবার এসেছিল এ-বাড়িতে। কিন্তু সে দিনের বেলা। আজ অন্ধকারে যেন সে দিক ঠিক করতে পারছে না। তার ওপর কোলে পাঁচ-ছ' বছরের একটা ছেলে। তারও তো একটা ভার আছে।আমার ঘরের সামনে এসে দরোয়ান বললে, এই যে হুজুর এসেছে।

আমি দেখলুম লোকটাকে। ছেলেটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস।

ঘরের মধ্যে একটা ডিভান ছিল। বললাম, ওইখানে শুইয়ে দাও, খুব কষ্ট হয়েছে তোমার।

লোকটা ছেলেটাকে ডিভানের ওপর শুইয়ে দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তারপর কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখের মাথার ঘাম মুছতে লাগল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কখন এসেছিলে তোমরা?

লোকটা বললে, আজ্ঞে ওকে মাসি খাইয়ে-দাইয়ে দুপুর বেলায় আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আর চারটে টাকা দিয়েছিল আমাকে। আমাদের যাতায়াতের গাড়ি-ভাড়া। বাসে করে আসছি, হঠাৎ বাসটার যন্তোর-পাতি বিগড়ে গেল, আর আমরা বাসের মধ্যে দু'ঘণ্টা বসে রইলুম। তাতেই এত দেরি হয়ে গেল। আমরা এসে শুনলুম আপনি বেরিয়ে গেছেন। দরোয়ান ঢুকতে দিলে না। তখন আর কী করি, ওই রোয়াকটায় একটু বসলুম। তারপর কখন রাত হয়েছে টের পাইনি, একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছি।

বললাম, তা'হলে তো তোমাদের এ-বেলা খাওয়া হয় নি।

লোকটা বললে, আজ্ঞে আমি বুড়ো মানুষ, আমার একদিন না খেলে কিছু আসে যায় না। তবে খোকনকে একটু খাইয়ে দিন, ওর হয়তো ক্ষিদে পেয়েছে খুব।

আমি তখুনি আমার লোককে দু'জনের খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে বলে দিলাম আর লোকটাকে বললাম, তোমরা আমার লোকের সঙ্গে যাও, খেয়ে এসো গে।

লোকটা ছেলেটাকে ডাকতে লাগল, ওরে খোকন, খাবি চল্, চল্ খেয়ে দেয়ে আসি গে। ওঠ্, উঠে পড়।

কিন্তু ছেলেটা তখন ঘুমে অসাড়। তার আর কোনও সাড়া-শব্দ নেই তখন। লোকটা যত তাকে ডাকে, তত সে আরো ঘুমের ঘোরে এক মুহূর্তের জন্যে চোখ চেয়ে আবার অন্য পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে।

লোকটা বললে, থাক হুজুর, ও বড় ঘুম কাতুরে ছেলে। একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর কেউ ওকে জাগাতে পারবে না। মাসি তাই বলে, ওর বড়লোকের ঘরে জন্মানো উচিত ছিল। ওকে দিন-রাত ওই বলে বকে।

জিজ্ঞেস করলাম, ছেলেটা খুব দুষ্টু বুঝি?

লোকটা যেন একটু ভয় পেয়ে গেল। ভাবলে আমি হয়তো ছেলেটাকে রাখব না। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল—না-না, সে-রকম দুষ্টু নয়। ওই একটু আয়েসী আর কি!

বললাম, আয়েসী মানে?

লোকটা বললে, আয়েসী মানে গতরে বেশি খাটতে পারে না। চাষী-ঘরের ছেলেরা যেমন গাছে উঠে আম পাড়ে, পুকুরে ঝাঁপায় জোড়ে, ক্ষেতে-খামারে কলাটা-মূলোটা চুরি করে পালায়, সে-রকম নয়। কেবল মাসির বড় ন্যাওটা।

—ন্যাওটা মানে?

লোকটা বুঝিয়ে দিলে। বললে, গাঁয়ের ছেলেরা তো দিন-রাত মাঠে ময়দানে হৈ-হৈ করে, ও তা নয়, ও কেবল মাসির আঁচল ধরে ঘুরে বেড়াবে। মাসি পরের বাড়িতে কাপড় কাচে, বাসন মাজে, ধান সেদ্ধ করে, দশ বাড়ি কাজ করে, ও-ও মাসির পেছনে-পেছনে ঘুরবে। মাসি যেখানে যাবে, ও-ও সেখানে যাবে।

—ওর মা-বাপ কেউ নেই তো, তাই মাসিকেই মা-র মতন ভালবাসে।

জিজ্ঞেস করলাম, ওর নিজের মা-বাপ কোথায়?

লোকটা বললে, ওর বাপ বজ্‌বজের জুটমিলে কাজ করত হুজুর, তারপরে সেখানেই মারা যায় একদিন, তখন ওর মা-র সবে এই ছেলেটা হয়েছে, সেই খবর শুনে ওর মাসি বজবজে দেখতে গেল বোনকে। এর জন্মের পর থেকেই ওর মা ভুগছিল। তারপর যখন খোকনের বয়েস এক-বছরটাক তখন ওর মাও মারা গেল। তখন থেকেই ও মাসির কাছে আছে।

ততক্ষণে খাবার ঘরে দু'জনের খাবার দেওয়া হয়েছে। বললাম, যাও, রাত বেড়েছে, তোমাদের আবার বাড়ি ফিরে যেতে হবে।

লোকটা বললে—হুজুর, ও এখানেই থাক, আমি একলাই ফিরে যাই—

বললাম, কিন্তু তুমি তো আর ছেলের কেউ নও, তোমার কথায় আমি ওকে আমার কাছে রাখি কী করে ? শেষকালে যদি ওর মাসি কিছু বলে ?

লোকটা বললে, না-না, ওর মাসি কিচ্ছু বলবে না। ওর মাসিই তো ওকে আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছে। আপনি ওকে রাখলে মাসি বরং খুশী হবে! মাসি যে ক'টা টাকা মাইনে পায়, পরের বাড়ির ঝিয়ের কাজ-কর্ম করে, তাতে নিজেরই পেট চলে না তার ওপর আবার বোনপোর খরচ চালায় কী করে বলুন হুজুর ?

কিন্তু আমার মনে হল যদি শেষকালে আবার কোন গণ্ডগোল হয় সেবারের মত, তাই বললাম—না হে, ওর মাসি নিজের মুখে যদি বলে যায়, তাহ'লেই আমি তোমাদের খোকনকে আমার কাছে রাখব, নইলে আমি রাখব না। তুমি ওর মাসিকে একদিন নিয়ে এসো আমার কাছে।

লোকটা আমার কথায় যেন একটু ভাবনায় পড়ল।

বললে, তাহলে আমি মাসিকে কী বলব হুজুর ?

বললাম, আমি তোমাকে যে কথাগুলো বললাম ওই কথাই বলো।

লোকটা বললে, কিন্তু আমি তো বলেছি হুজুর, আপনি নির্ভয়ে ওকে রাখুন। সেবারের মত এবার আর হবে না। এটা আমি জোর গলায় বলে দিতে পারি।

আমি বললাম, না তা হয় না। আমি রাজী হলেও আমার স্ত্রী তাতে রাজী হবে না। এবার আমি একেবারে দান-পত্র রেজেস্ট্রি করে স্ট্যাম্পের ওপর তোমার মাসির টিপসই দিয়ে পাকা কাজ করে নিতে চাই। নইলে আমার স্ত্রী একে রাখবে না। তুমি বরং আজ একে খাইয়ে-দাইয়ে বাড়ি নিয়ে যাও, তারপর ওর মাসিকে সঙ্গে নিয়ে আর একদিন এসো।

লোকটা কী আর করবে, তাইতেই রাজী হয়ে গেল। তারপর ঘুমন্ত ছেলেটাকে ডাকতে লাগল—ওরে খোকন ওঠ্, ওঠ্, খাবি চল, খেয়ে নিবি চল—রাত হচ্ছে। ফিরে যেতে হবে।

অনেক ঠেলাঠেলির পর ছেলেটা উঠল। চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। কিছুই চিনতে পারলে না। বললে, আমার মাসি কই, মাসি—

লোকটা বললে, মাসি ময়রাডাঙায় আছে, এখুনি তোর মাসির কাছে নিয়ে যাব—

বলে ছেলেটাকে ধরে ওঠাতে গেল। কিন্তু হঠাৎ কী যেন সন্দেহ হওয়াতে একেবারে চমকে উঠেছে।

বললে, তোর জ্বর হল নাকি ? দেখি—

কপালে হাত দিয়ে ভাল করে দেখে বললে, হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই—

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, এখন কী হবে হুজুর ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সত্যিই জ্বর হয়েছে ?

বলে আমিও তার কপালে ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখলাম, গা খুব গরম। তখন আমার বড় ভয় হল। সত্যিই যদি জ্বর হয় ছেলেটার, তাহলে কী করে এত রাত্রে আবার ময়রাডাঙায় যাবে ? তাতে যদি শরীর আরো খারাপ হয়, যদি তাতে জ্বর আরো বাড়ে ?

ছেলেটা তখন যেন চোখ মেলে চাইতে পারছে না। যতটুকু চাইছে, তাইতেই দেখা গেল চোখের ভেতরটা লাল টকটক করছে।

ভাবলাম, ছেলেটাকে এ-অবস্থায় ময়রাডাঙায় নিয়ে যেতে দেওয়া আমার পক্ষে উচিত হবে না। সঙ্গে-সঙ্গে তখনই ডাক্তারকে টেলিফোন করে দিলাম।

লোকটাকে বললাম, তুমি ততক্ষণে খেয়ে নাও গে যাও—আমি ডাক্তারকে ডেকে পাঠিয়েছি। ডাক্তার যদি যেতে বলে তো তুমি একে নিয়ে যেতে পারবে, নইলে এখানেই থাকুক তোমাদের ছেলে।

লোকটা চলে গেল খাবার জায়গায়। তারপরেই ডাক্তার এল। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন ছেলেটাকে।

তারপর বললেন, এ আপনার কে মিস্টার সেন ?

আমি বললাম, এ আমার কেউ নয় ডাক্তার। এ একটা গ্রামের ছেলে আমাদের বাড়িতে এসেছিল, সারাদিন রোদে পুড়ে এই রকম জ্বর হয়েছে। এই অবস্থায় এত রাত্রে কি সেই সেখানে পাঠানো উচিত হবে ?

ডাক্তার বললেন—না। জ্বর তো দেখছি একশো চারের ওপর।

বললাম, দেখুন ডাক্তার, ভাবছি একে আমি এ্যাডপ্ট্ করব।

—তার মানে ?

বললাম, আপনি যে আমাকে বলেছিলেন একটা ছেলেকে দত্তক নিতে, আমি ভাবছি একেই নেব। আপনি কী বলেন ? আপনার মত আছে ?

ডাক্তার বললেন, আমার যদি মত নেন তবে বলব আপনার সিলেক্শন ভাল।

আমি বললাম, না, এখনও মিসেসের অনুমতি নেওয়া হয় নি। আপনি যদি মিসেসকে একটু বলে দেন তা'হলে ভাল হয় ডাক্তার—আমার একটা মেজর প্রবলেম মেটে।

ডাক্তার রাজী হলেন। ভেতরে গেলেন তিনি। আমিও গেলাম সঙ্গে।

ডাক্তার বললেন, মিসেস সেন, আপনি দেখেছেন ছেলেটাকে ?

মিসেস সেন তখনও দেখেন নি। বললে, কোন্ ছেলেটা ? কার কথা বলছেন ডাক্তার ?

ডাক্তার বললেন, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি দেখাচ্ছি—

বাইরের রুমে এসে ডাক্তার দেখালেন—এই দেখুন, দিস ইজ্ দি বয়। আমার কথা যদি শোনেন তা আপনি একে আপনার কাছে রাখতে পারেন। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এ বড় হলে শাইন্ করবে।

ছেলেটা ডিভানের ওপর তখনও ঘুমে অচেতন হয়ে শুয়েছিল। সুন্দর স্বাস্থ্য, মুখখানা গোল। মাথাব চুলগুলো আগোছালো। সারা দুপুর রোদে তেতে-পুড়ে এসেছে। তার ওপরে তখন একশো চার জ্বর। সমস্ত মুখখানা লাল, থমথম করছে।

রিটা বললে, ওর বাবা-মা কেউ নেই?

আমি বললাম, না, কেউ নেই, তারা মারা গেছে। সেদিক থেকে কোনও অবজেক্‌শান উঠবে না। একজন বিধবা মাসি আছে শুধু, তার কাছেই এ বড় হয়েছে। তা সে বিধবা ও খুব গরীব।

রিটা বললে, এ শুয়ে আছে কেন অমন করে?

ডাক্তার বললেন, এর জ্বর হয়েছে।

রিটা বললে, এ বাড়ি যাবে কী করে?

ডাক্তার বললেন, একে আজ বাড়ি যেতে দেবেন না। এখানেই থাক, আমি বরং ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ডাক্তার চলে গেলেন। আমার বয়কে বলে আমি তার জন্যে বালিশ আনিয়ে তার মাথায় দিয়ে দিলাম। তারপর ওষুধ আসতেই তাকে খাইয়ে দিলাম। সে তখন অজ্ঞান—অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

লোকটা খাওয়া-দাওয়া সেরে এল।

জিজ্ঞেস করলাম, খেয়েছ? পেট ভরেছে?

সে বললে, হ্যাঁ হুজুর আমি তাহ'লে যাই? ও রইল এখানে।

আমি বললাম, ওর একশো চার জ্বর, এখনি ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, দেখে গেছেন। ওষুধ খাইয়ে দিয়েছি। ওর মাসিকে ভাবতে বারণ করে দিও। আর তিন-চারদিন পরে একটু সুস্থ হলে তুমি এসে ওকে নিয়ে যেও।

লোকটা নীচু হয়ে আমার পায়ে হাত ছুঁইয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, আমি তাহ'লে আসি হুজুর। আপনার কাছে যখন রেখে গেলুম, তখন আর আমাদের কোন ভাবনা নেই।

বললাম, কিন্তু ঘুম থেকে জেগে যদি তোমাদের না দেখতে পেয়ে কাঁদে, তাহ'লে কী বলব?

—বলবেন, আমি দু'একদিনের মধ্যেই আবার দেখতে আসব ওকে। ছেলেমানুষ তো, আপনাদের বাড়িতে থাকতে-থাকতে সব ভুলে যাবে।

আপনাদের কাছে ভাল খেতে-পরতে পাবে, তাহ'লে আর কোনও দুঃখ থাকবে না।

—কিন্তু ওর মাসি? মাসির তো খুব ভাবনা হবে ওর জন্যে?

লোকটা বললে, মাসির তো ভাল হল হুজুর। মাসি তো বাঁচল।

আমি তাকে আবার দশটা টাকা দিলাম, তার পথের খরচা বাবদ।

লোকটা বললে, আপনি আবার কেন টাকা দিচ্ছেন হুজুর? মাসি তো আমাদের যাতায়াতের গাড়ি-ভাড়া চার টাকা দিয়েছিল, তবু আপনি যখন দিচ্ছেন আমি মাথায় করে নিচ্ছি।

বলে নোটটা মাথায় ছুঁইয়ে জামার পকেটে রেখে দিলে। তারপর শেষ-বারের মত খোকনকে দেখে নিলে। ছেলেটা তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সে জানতেও পারছে না যে যার সঙ্গে সে এসেছিল তাকে ফেলেই সে চলে যাচ্ছে।

আমি বললাম, তোমার খোকনকে ডাকব? তুমি ওকে বলে যাবে।

লোকটা বললে, দরকার নেই বাবু, শেষকালে যদি আবার কান্নাকাটি করে। তার চেয়ে আমি চলেই যাই। আপনি ওকে একটু দেখবেন। আর ওর মাসির ঠিকানাটা লিখে রাখুন হুজুর, যদি তেমন মনে হয়, তাহ'লে একটা খবর দেবেন কেমন রইল।

আমি তার কথা মত ঠিকানাটা লিখে রাখবার পর সে চলে গেল।

*　　　*　　　*

ডাক্তার বলতে লাগল—এক-একদিন একটু-একটু করে গল্প শুনতুম, আর যেই মিস্টার সেনের বাড়ি থেকে ডিনার আসত, আমি চলে যেতুম নিজের কাজে। নার্সিংহোমের নিয়ম করে দিয়েছিলাম খুব কড়া। সকাল থেকে ঠিক মত কাজ হচ্ছে কিনা তা দেখাও ছিল আমার একটা কাজ। বিকেল চারটে থেকে ভিজিটার্স আসতে আরম্ভ করত। সেটা চলত ছ'টা পর্যন্ত। কিন্তু মিস্টার সেন বলে দিয়েছিলেন কাউকেই যেন তার সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়া হয়। বিশেষ করে তাঁর অফিসের লোকের তাঁর কাছে আসা একেবারে বারণ।

মিস্টার সেনের কেবিনে সারা দিন-রাত নার্স থাকত। দিনের বেলা একজন, রাত্রে আর একজন। তারা দু'জন পালা করে তাঁর দেখা-শোনা করত। সেদিন সকাল ন'টার সময়ে নার্স এসে আমাকে ডাকলে। বললে, আপনাকে মিস্টার সেন একবার ডাকছেন—

নিয়ম করে আটটার সময়ে আমি রোজ মিস্টার সেনের কেবিনে যেতাম। সেই সকাল আটটা থেকে সকাল সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত আমাকে সেখানে

গিয়ে তাঁর গল্প শুনতে হতো, এইটেই নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার বিকেল তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত তাঁর কেবিনে গিয়ে গল্প শুনতে হবে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই তাঁর কাছ থেকে ডাক আসবে। তিনি বলবেন—কই, আজ তুমি এলে না তো ডাক্তার।

আমার কিন্তু তাঁর কাছে যেতে, কাছে গিয়ে তাঁর কথা শুনতে খারাপ লাগত না। আমার এ্যাসিস্টেণ্টদের ওপর সব কাজের ভার তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতুম। সবাই জানত, আমি মিস্টার সেনের কেবিনেই সে সময়ে থাকি। সেদিনও যেতেই বললেন, কী ডাক্তার, আজ তুমি আসো নি কেন ? রোগী মানুষের কথা শুনতে দেখছি কারোরই ভাল লাগে না।

আমি বললাম, না মিস্টার সেন, সে-কী কথা, আপনার গল্প শুনতে তো আমার খুব ভাল লাগে, নইলে সব কাজ কর্ম ফেলে কেন আপনার কাছে আসি, বলুন ? আপনি বললেও আসব, না-বললেও আসব।

অসুখ হলে সব মানুষই বোধহয় আবার ছেলেমানুষ হয়ে যায়। আমি মিস্টার সেনের লোকের কাছ থেকে শুনেছিলুম যে, মিস্টার সেন নাকি খুব রাশভারি মানুষ। অফিসের সামান্য সাধারণ পিওন থেকে ডেপুটি পর্যন্ত সবাই তাঁকে ভয় করত। কেউ অকারণে তাঁর সামনে যেতে চাইত না।

অফিসের ডেপুটি অফিসার ভদ্রলোক মাঝে-মাঝে আসত আমার কাছে। আমার কাছে জানতে চাইত তার বস্ কেমন আছে।

আমি জিজ্ঞেস করতাম—আপনার বসের সঙ্গে দেখা করতে চান।

ডেপুটি বলত—না ডাক্তার, বস রাগ করবে। আমাদের অফিসে আমি নিজে সার্কুলার দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি যে, কেউ যেন দেখা করতে না আসে।

আমি বলতাম—সে কথা তো আমাকেও উনি জানিয়ে দিয়েছেন। আমিও এখানকার অফিসে সে কথা সকলকে জানিয়ে দিয়েছি। নার্স থেকে ডাক্তার সকলকে।

ডেপুটি বলত—আমি শুধু জানতে এসেছি উনি এখন কেমন আছেন ?

আমি বলতাম—এখন তো ভালই আছেন, দিন-দিন প্রগ্রেস করছেন।

ডেপুটি জিজ্ঞেস করত—কবে নাগাত ওঁকে রিলিজ্ করবেন আপনি ?

আমি বলতাম—তা বলতে পারব না। মিস্টার সেন যতদিন ইচ্ছে করবেন, ততদিন আমরা ওঁকে রাখব। ওঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করতে পারব না।

ডেপুটি বলত—তাহ'লে আমি এখন উঠি ডাক্তার, আমি যে এসে ওর খোঁজ-খবর করেছি, তা আর ওঁকে বলবেন না। আমি ওঁর জন্যে

ভাবনায় আছি।

বলতাম, তা তো আমি বুঝতেই পারি।

ডেপুটি বলত, না তার জন্যে নয়, আমার বস যে আমার কী উপকার করেছেন, তা আমি জানি আর আমার ঈশ্বর জানেন। আমি অর্ডিনারি এক ক্লার্ক ছিলাম ম্যাড্রাসে। বস তখন ম্যাড্রাসে যেতেন। একদিন আমার কাজ দেখে এত খুশী হয়েছিলেন যে আমাকে তিনি এখানে নিজের অফিসে নিয়ে এসেছিলেন। সামান্য তিরিশ টাকার ক্লার্ক থেকে এখন যে আমি গ্রীয়ারসন কোম্পানীর সাত হাজার টাকার ডেপুটি চিফ্, এ ওঁর দয়ায়। এ আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব না।

কথাগুলো বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন!

*　　*　　*

মিস্টার সেন একদিন আমায় বলেছিলেন, ডাক্তার, তোমার নার্সিংহোমে থাকতে যে আমার কী ভাল লাগছে, কী বলব! মনে হচ্ছে, এতদিনে আমি মানুষ হতে পেরেছি। একেবারে মানুষ!

আমি বলেছিলাম, কেন, এতদিন স্বাধীন ছিলেন না?

মিস্টার সেন বলেছিলেন, না ডাক্তার, আমি এর আগে কখনও স্বাধীন ছিলাম না। আমি কোম্পানীর মালিক ছিলাম না, কোম্পানীই ছিল আমার মালিক। কোম্পানীর ব্যালান্স-সীট যাতে ঠিক থাকে, কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডারদের স্বার্থ যাতে বজায় থাকে, কোম্পানী যাতে আরো বড় হয়, কোম্পানীর যাতে প্রফিট্ হয়, সেই চেষ্টাই আমি বরাবর করে এসেছি। কিন্তু কোম্পানীর কথা আমি যত ভেবেছি, লাইফ্ আমাকে তত পথে বসিয়েছে। লাইফ্ আমাকে ততো বিট্রে করেছে, ডাক্তার। আসলে আমি এতকাল শুধু কোম্পানীর দাসত্বই করেছি, আর আমার জীবন আমাকে তত ঠেলে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে।

আমি বলতাম, কেন, ও-কথা বলছেন কেন আপনি? তা'হলে আমিও যে এই নার্সিংহোম করেছি, আপনি কি বলতে চান আমি নার্সিংহোমে দাসত্ব করছি?

মিস্টার সেন বলতেন, তোমার কথা আলাদা ডাক্তার, তোমার নিশ্চয় ফ্যামিলি আছে, তোমার নিশ্চয়ই ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের তুমি নিশ্চয়ই ভালবাসো। দিনের মধ্যে একটা সময় নিশ্চয়ই তাদের জন্যে তুমি ডিভোট্ করো। কিন্তু আমি তো তা করি নি। কারণ আমি যে ফ্যামিলিকে দেখব, তা আমার ফ্যামিলি কোথায়? আমার ছেলে-মেয়ে কোথায়?

আমি বলতাম, সকলের কি ফ্যামিলি থাকে মিস্টার সেন?

মিস্টার সেন বলতেন, না থাকলে কিছু করবার নেই। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে ফ্যামিলি থেকেও নেই? যেখানে স্ত্রী স্বামীর বোঝা, সে ক্ষেত্রে? তোমাদের মেডিক্যাল শাস্ত্রে তার কি কোনও সলিউশন আছে? না নেই। থাকলে আমি তার সমাধান করতে চেষ্টা করতুম। সবটা শুনলে তুমি বুঝবে তার কী পরিণতি হয়েছিল।

আমি বলতাম, বলুন, আমি শুনব।

পলটু সেন আবার গল্প বলতে আরম্ভ করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের গল্প। বলতেন, জানো, ভেবেছিলাম একটা ছেলেকে যদি দত্তক নিতে পারি, তাহ'লে হয়তো ফ্যামিলির দিক থেকে পুরো শান্তি পাব। স্ত্রীর একটা খেলনা যুগিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আমার ব্যবসার দিকে আমার সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিতে পারব। যেমন কোম্পানী নিয়ে দিন-রাত পড়ে থাকতাম, আবার তেমনি পড়ে থাকব।

কিন্তু না, মিস্টার গ্রীয়ারসন সেদিন বোধহয় শনি হয়ে আমার মধ্যে ঢুকেছিলেন। আমার টাকা হয়েছিল স্বীকার করছি, কিন্তু তার ফলে আমার টাকার নেশা হয়ে গিয়েছিল। আমার জীবন, আমার ইহকাল পরকাল, ভবিষ্যৎ, সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেই সঙ্গে। কিন্তু ডাক্তার, যেদিন থেকে ময়রাডাঙা থেকে ওই ছেলেটা আবার বাড়িতে এসে জ্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়ল, সেইদিন থেকে যেন আমার জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয়ে গেল।

লোকটা তো টাকা নিয়ে চলে গেল, কিন্তু আমার বড় ভাবনা হতে লাগল। পরের ছেলে বাড়িতে রইল, তার যদি কোনও বিপদ হয়!

ডাক্তার চলে গিয়েছিল। আমি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলেট কেমন লাগছে তোমার?

রিটা বললে, তা থাকবে তো শেষ পর্যন্ত?

বললাম, ওর বাবা-মা কেউ নেই, থাকবে না কেন?

—বাবা-মা নেই তো আর কে আছে ওর?

বললাম, এক মাসি শুধু আছে ওর—আর কেউ নেই ওর পৃথিবীতে।

রিটা বললে, মাসি দেবে কেন বোনপোকে?

বললাম, গরীব লোক, বোনপোকে খাওয়াবার পয়সা নেই বলে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে, যদি আমরা রাখি।

রিটা বললে, এদের তুমি পেলে কোথায়?

বললাম, সেই যে আমরা ময়রাডাঙ্গায় গিয়েছিলাম, এও সেই জায়গার ছেলে ঘোরাঘুরি(?) খবর পেয়েছে আর তা-ছাড়া আমি তো বলেই

এসেছিলাম, যদি কেউ তার ছেলেকে আমার কাছে রাখে তাহ'লে যেন খবর দেয়। তাই একজন আমার কাছে একে নিয়ে এসেছে। এখন এর জ্বর হয়ে গেছে, এ-অবস্থায় পাঠাই কী করে বল তো ?

রিটা একদৃষ্টে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। খানিক পরে বললে, এ সারারাত এইখানে একলা পড়ে থাকবে ?

আমি বললাম, আমি বীর সিংকে বলছি এখানে ওর পাশে বসে থাকবে।

রিটা বললে, তার চেয়ে আমার আয়াকে বলছি, সে বরং এখানে থাকুক।

আমি বললাম, তোমার কাছে তাহ'লে কে থাকবে ?

রিটা বললে, আমার কাছে কারোর দরকার নেই।

তারপর হঠাৎ যেন তার কী মনে পড়ল। বললে, এর সঙ্গে কিছু একষ্ট্রা শার্ট-প্যান্ট নেই ? কাল সকালে এ কী পরবে ?

আমি ভাবলাম, তাই তো, সে-কথা তো আমার মাথায় আসে নি।

রিটা বললে, তুমি এখুনি তোমার দর্জিকে টেলিফোন করে দাও, সে এসে ওর মাপ নিয়ে যাক। কাল সকাল বেলা যেন এক ডজন শার্ট-প্যান্ট তৈরি করে দিয়ে যায়।

কথাটা ভালই মনে হল আমার। ভোরবেলাতেই তো আবার জামা-প্যান্ট বদলাতে হবে ওর।

সব ব্যবস্থাই পাকা হয়ে গেল। রিটার আয়াকে রেখে তাকে সব বলে দেওয়া হল। আমি আমার টেলারকে তখুনি টেলিফোন করে দিতেই সঙ্গে-সঙ্গে দর্জি এসে গেল। মাপ নিয়ে সে চলে গেল। বলে গেল সমস্ত রাত তারা কাজ করবে। সমস্ত রাত ধরে এক ডজন শার্ট-প্যান্ট তৈরি করে পরের দিন সকাল সাতটার আগেই সে আমার বাড়িতে ডেলিভারি দিয়ে যাবে।

আমি আর আমার স্ত্রী সব বন্দোবস্ত করে ডাইনিং-টেবিলে গিয়ে খেতে বসলাম। আমরা খাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘর থেকে ছেলেটার গলার আওয়াজ কানে এল—মাসি কোথায় ? মাসি ?

আয়া তাকে যেন কী কথা বলে ঠাণ্ডা করছে। খাওয়া ছেড়ে আমরা দু'জনেই সেই ঘরে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের দেখে ছেলেটা চিনতে পারলে না। বুঝতে পারলে না কোথায় এসেছে সে। বললে, মাসি কোথায় ?

আমি বললাম, তুমি মাসির জন্যে ভেবো না। আমরা তো আছি। জল খাবে ? জলতেষ্টা পেয়েছে তোমার ?

ছেলেটার তবু সেই এক কথা, আমার মাসি কোথায় ?

তাকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বললাম, আসবে-আসবে, তোমার মাসি

আসবে—তুমি ঘুমোও।

ছেলেটা তবু বললে, না, আমি মাসির কাছে যাব।

আমি বললাম, লক্ষ্মী ছেলে তুমি, কেঁদো না, তোমার মাসি এখানেই আছে, এখুনিই আসবে, তুমি ঘুমোও এখন।

বলে আমি আস্তে-আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

ছেলেটার তবু বায়না থামে না। বলতে লাগল, না তুমি চলে যাও, মাসিকে ডেকে দাও, আমি মাসির কাছে ঘুমোব।

আমি মহা মুশকিলে পড়লাম। চেয়ে দেখলাম, রিটার মুখখানাও যেন গম্ভীর-গম্ভীর। সে বললে, আমি তখনই বলছিলাম তোমাকে, এ মাসি-মাসি করবে। ও থাকবে না। কেন মিছিমিছি ওকে এখানে রেখে দিলে?

বললাম, ওর যে জ্বর হয়েছিল। জ্বর গায়ে তখন ওকে কী করে ফেরত পাঠাই বল? সেটা কি ভাল হত? তুমিই বলো না?

রিটা বললে, কিন্তু জ্বর ছাড়লেই কি ওর মন এখানে বসবে?

আমি বললাম, প্রথম-প্রথম অবশ্য বসবে না, কিন্তু পরে যখন অভ্যেস হয়ে যাবে, তখন নিশ্চয় বসবে। দেখে নিও।

রিটা বললে, কিন্তু যার ওপর এত টান, সেই মাসিরও তো এর ওপরে তেমনি টান নিশ্চয়ই। সেই মাসিও হয়তো আর বেশি দিন থাকতে পারবে না, একদিন হয়তো হুট্ করে বোনপোকে দেখতে এসে পড়বে।

আমি আর রিটার কথায় প্রতিবাদ করলাম না।

দেখলাম, ছেলেটা আস্তে-আস্তে আবার ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল।

তাকে ঘুমোতে দেখে মনে-মনে খুশী হলাম। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা যে যার ঘরে ঘুমোতে গেলাম।

* * *

পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে গিয়েছিল আমার। ঘুম থেকে উঠেই শুনলাম আমার ডাক্তার নাকি ভোরবেলাই আমাকে টেলিফোন করেছিল। আমিও সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারকে টেলিফোন করলাম।

ডাক্তার আমার টেলিফোন পেয়ে বললেন, আমার পেসেন্ট কেমন আছে মিস্টার সেন?

বললাম, আমি এখনও দেখিনি, কাল শুতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, তাই আমি এখন ঘুম থেকে উঠেছি—পরে আপনাকে ফোনে জানাব।

ডাক্তার আবার বললেন, কিছু ভয় পাবেন না, আমি ওর সব পরীক্ষা করেছি, হার্ট, পালস্, লান্স, সমস্ত ভাল আছে। আসলে মনে হচ্ছে ওটা 'হিট্ ফিভার', ওই ওষুধেই ভাল হয়ে যাবে, টেম্পারেচারও কমবে। আজকে

বেলা হলে আমি ওর ব্লাডটা নিয়ে আসব—আর মিসেস কী বলছেন ?

বললাম, মিসেসের সঙ্গে তো আমার এখনও দেখা হয় নি, বোধহয় তিনি এখনও ঘুমোচ্ছেন। কাল তো ওই জন্যে দু'জনেরই শুতে রাত হয়েছে।

ডাক্তার বললেন, কাল চলে আসবার পর পেসেন্ট কিছু করে নি তো ?

বললাম, একবার গোলমাল করেছিল। জ্বরের ঘোরে 'মাসি' 'মাসি' বলে দু'একবার কেঁদে উঠেছিল, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ডাক্তার বললেন, ঠিক আছে, আমি বেলা হলে একবার যাব।

বলে টেলিফোন-রিসিভারটা রেখে দিলেন।

তখন মুখ-হাত-পা ধুয়ে আমি তাড়াতাড়ি রোগীর ঘরে গেলাম। বীর সিং আর আয়াকেও তার ভার দিয়ে আসা হয়েছিল। তারা আমাদের খুব বিশ্বাসী লোক। আমাদের বিশ্বাস ছিল তারা যথাসাধ্য করবে। কিন্তু সে-ঘরে গিয়ে দেখলাম আশ্চর্য কাণ্ড।

দেখি রিটা খোকনকে কোলে নিয়ে বিছানার ওপর বসে আছে।

বললাম, এ কি, তুমি ?

রিটা গলা নীচু করে বললে, একটু আস্তে কথা বলো, এখুনি ঘুমোল।

গলা নিচু করেই বললাম, তুমি কখন এখানে এলে ? রাত্রে ঘুমোও নি নাকি ?

আয়া বললে, মেমসাব সারা রাত এখানে রয়েছে।

রিটা বললে, রাত্রে যে ঘুম এল না, আমি কী করব ? ঘুম না এসে ভালই হয়েছে। ঘুমের ঘোরে 'মাসি কোথায়' বলে আবার কাঁদছিল, আমি তখন বললাম, আমিই তোমার মাসি। বলতেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সেই তখন থেকে ওকে কোলে করে বসে আছি। কোল থেকে নামালে যদি ও কেঁদে ওঠে। পরের ছেলে বাড়িতে রেখে কী বিপদ করলে বলো তো ?

বললাম, তোমার তো তাহ'লে খুব কষ্ট হয়েছে। তুমি এখন বরং ওঠো, একে আমার কোলে দাও, দিয়ে তুমি মুখ-হাত-পা ধুয়ে নাও গিয়ে।

দেখলাম, রিটার সিল্কের শাড়িটায় দাগ লেগে গিয়েছে।

বললাম, তোমার শাড়িতে কীসের দাগ ?

রিটা বললে, একবার বমি করেছিল, আমি আমার শাড়ি দিয়ে মুছে দিয়েছি।

ততক্ষণে আয়া আস্তে-আস্তে খোকনকে কোলে তুলে নিয়েছে। রিটা উঠে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। আমি আশ্চর্য হয়ে তার যাওয়ার দিকে চেয়ে দেখলাম। সত্যি ডাক্তার, মেয়েমানুষের মন কি অদ্ভুত জিনিস, তা আমরা যারা পুরুষমানুষ, তারা কল্পনাও করতে পারি না। ওই রিটা যখন

আগে ক্লাবে গেছে, তখন সে ছিল অন্য মানুষ। রোজ তিন পেগ্ হুইস্কি না হলে তার মেজাজই ঠাণ্ডা হত না। বাবা ছিল কর্নেল। মিলিটারি সার্ভিসের লোক। তাদের সমাজে ওটা ছিল ফ্যাশন। যে মদ খাবে না, ওদের সমাজে তার জল অচল। মানে সে হরিজন। ডাঁটা-চচ্চড়ি শাকের ঘণ্ট খেলে ওদের সমাজে তার জাত যাবে। তেমনি হুইস্কি কি রাম খেতে পারলে সে আবার জাতে উঠবে। আমার সঙ্গে যখন রিটার বিয়ে হল, মনে আছে সেই দিন আমার বিয়ের উৎসবে মদের বিল হয়েছিল এগারো হাজার টাকা।

সারা জীবন হয়তো সেই রকমই চলত। এই ক্লাব, ককটেল পার্টি আর মদ। কিন্তু রিটাকে মারলে ভগবান। মানুষের স্বভাবের বিরুদ্ধে মানুষ গিয়েছে কি তার স্বভাবই একদিন তার চরম শত্রু হয়ে উঠবে। যেমন মানুষ যদি বনের সব বাঘ মেরে ফেলে তো বনের হরিণের সংখ্যা বেড়ে যাবে। আর হরিণের সংখ্যা যদি বেশি বেড়ে যায় তো বনের গাছপালা তারা সব খেয়ে উজাড় করে ফেলবে। আর দেশে গাছপালা কমে গেলে তো দেশ মরুভূমি হয়ে যাবে, একেবারে বৃষ্টি হবে না।

তেমনি আমাদের সমাজে এমন অনেক মেয়ে আছে ডাক্তার, তাদের শেষ পরিণতি দেখে আমার বড় কষ্ট হয়েছে। একদিন দেখলুম, একটি মহিলা একটা টেবিলে বসে ড্রিঙ্ক করছে আর দল বেঁধে তাস খেলছে। আমিও আছি সে টেবিলে। হঠাৎ মহিলাটি হো-হো-হো করে মদের নেশায় হেসে উঠল আর সঙ্গে-সঙ্গে তার সমস্ত শরীরের ডান দিকটা পক্ষাঘাত হয়ে পড়ে গেল। আসলে প্রকৃতি এমনি করেই তার প্রতিশোধ নেয়। যেমন পৃথিবীর ক্ষেত্রে তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও।

এ আমার দেখা ঘটনা ডাক্তার। রিটারও হয়তো শেষ পর্যন্ত তাই-ই হত, কিন্তু তা হল না, কারণ তার ওই রোগটা তাকে বাঁচিয়ে দিলে। তার ঐ হঠাৎ রেগে যাওয়া, হঠাৎ কাপ-ডিশ ভেঙে ফেলা। ওইসব ঘটতেই আমি ডাক্তার দেখালাম।

মনে আছে, একটু পরেই ডাক্তার এলেন। তাঁকে সব বললাম।

তিনি শুনে বললেন, খুব ভাল লক্ষণ। আপনি মিসেসের ওপর ওয়াচ্ রাখবেন, আর ছেলেটাকে খুব যত্ন করবেন, তাতেই আপনার স্ত্রী ভাল হয়ে যাবেন। দেখবেন, আপনার মিসেসের ওপর যেন ছেলেটার এ্যাটাচ্মেণ্ট হয়। বলে তিনি ব্লাড নিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাতে ঘুম ভেঙে যেতে পারে, তাই আর তা নিলেন না। বললেন, এখন জ্বরটাও কমে গেছে, আগেকার চেয়ে আরও আরাম করে ঘুমুচ্ছে, এমন অবস্থায় আর ব্লাড নেব না—কাল হোক, পরশু হোক, যে-কোনও একদিন নিলেই চলবে—

বিকেলবেলা খবরটা দেবেন কেমন থাকে ও - বলে ডাক্তার চলে গেলেন।

*　　　　*　　　　*

মিস্টার সেন বললেন, ডাক্তার, তোমার শুনতে ভাল লাগছে তো? খারাপ লাগলে বলবে। মানুষ যখন নিজের দুঃখ অন্য কাউকে বলে তখন সে মনে করে শ্রোতা তাকে তার দুঃখ সহানুভূতি জানাবে। আমি কিন্তু তোমার কাছে কোনও সহানুভূতি চাই না ডাক্তার। আমি গ্রীয়ারসন এ্যাণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। সুতরাং আমার কোন দুঃখ থাকতে নেই, আমার জীবনের কোনও দুর্বলতা থাকতে নেই। যদি তা থাকে তাহ'লে আমার নীচের লোকেরা আর আমাকে মানবে না, আমার হুকুমও তারা শুনবে না। কিন্তু এখানে তো আমি সে-সব কিছু নই। আমি মাত্র তোমার রোগী। তুমি ডাক্তার আর আমি তোমার রোগী। আমাদের মধ্যে এই-ই সম্পর্ক। তাই আমি তোমাকে সব কিছু মনের কথা বলে মনটাকে খালি করে ফেলছি। যদি তোমার শুনতে খারাপ লাগে তো স্পষ্ট বলে দিও, আমি আর কিছু বলব না।

আর একটা কথা। আমি নিজে চরম দারিদ্র্য কাকে বলে তা দেখেছি, আবার চরম ঐশ্বর্য কাকে বলে তাও জেনেছি। কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট করে জেনেছি যে দু'টোর মধ্যে কোনও তফাত নেই। আজ আমার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বটে, আজ আমার ব্যাঙ্কে অনেক টাকা আছে বটে, আজ আমার মাথার ওপর নিজের পয়সায় তৈরি করা একটা ছাদ আছে বটে, কিন্তু আমার 'আমি'টা সেই আগেকার 'আমি'ই আছে। অথচ আজকের এই 'আমি' হবার জন্যে সেদিনকার 'আমি'র কী লালসই না ছিল।

আজকে যে-লোকটা তোমার সঙ্গে শুয়ে-শুয়ে কথা বলছে, সে কিন্তু সেই আগেকার 'আমি'টা। সেই আগেকার আদিম মানুষটা। সে-মানুষটা আড়ালে এখনও সুখে হাসে, দুঃখে কাঁদে, হিংসে হলে প্রতিশোধ নেয়, ক্ষিদে পেলে সে বাঘের মত ছটফট করে। কিন্তু সবই আড়ালে। আগে সেটা সবাই দেখতে পেত, এখন তা আর কেউ দেখতে পায় না, এই যা তফাত।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর?

মিস্টার সেন বলতে লাগলেন, তারপর কী হল বলি। বাইরে থেকে দারোয়ান এসে খবর দিলে যে আগের রাত্রের সেই লোকটা আবার এসেছে।

আমি মনে-মনে বড়ই বিরক্ত হলাম। এখন আবার সে এল কেন? এই তো কাল রাত্রেই সে এসেছিল, আবার কেন এল আজকেই?

কিন্তু আমার মনে হল, তার আসা তো অন্যায় হয় নি। তাদের ছেলে, তারা তো আসবেই। তাদের কোলের ছেলেকে আমরা এখানে আটকে

রেখেছি, তার খোঁজ নিতে তারা তো আসবেই।

তারা এল। সঙ্গে দেখি একজন ঘোমটা দেওয়া মহিলা।

লোকটা পরিচয় করিয়ে দিলে—এ হচ্ছে হুজুর দেবব্রতের মাসি।

মহিলাটির দিকে চেয়ে দেখলাম ভাল করে। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না তার। একটা সাদা শাড়িতে সমস্ত শরীরটাকে ঢেকে রেখেছে, খালি পা, আর মুখটা পুরোপুরি ঘোমটায় ঢাকা।

লোকটা বললে, কাল এখানে জ্বর দেখে গিয়েছি, তাই মাসিকে গিয়ে সব বললাম, মাসি শুনে আর থাকতে পারলে না, তাই আমাকে নিয়ে এখানে ছুটে এল। সারা রাত মাসির ঘুমই হয় নি কাল বোনপোর জন্যে। এখন কেমন আছে খোকন ?

আমি সব বললাম। ডাক্তার এসে দেখে কী রিপোর্ট দিয়েছে, তাও বললাম। বললাম—ভয়ের কিছু নেই, তাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে।

মহিলাটি লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কী যেন বললে। তাই শুনে লোকটা আমাকে বললে, মাসি বলছে কাল রাত্তিরে খোকন কি মাসিকে খুঁজেছিল ?

বললাম, হ্যাঁ, অনেকবার খুঁজেছিল। তখনই জ্ঞান হয়েছে, তখনই 'মাসি' 'মাসি' বলে ডেকেছিল। তারপর আবার ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারবাবু সকাল বেলাই এসেছিলেন, তিনি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছেন, জ্বর কমেছে, দু'একদিন পরে রক্ত নেওয়া হবে, তখন বোঝা যাবে রোগটা কী।

তারপর মহিলাটির দিকে চেয়ে বললাম, আপনি কেন মিছি-মিছি কষ্ট করে আবার এলেন অত দূর থেকে ? মিছি-মিছি আপনার অনেকগুলো পয়সাও নষ্ট হল। দেবব্রত কেমন থাকে আমিই আপনার গিয়ে খবরটা দিয়ে আসব। আপনাদের আর কষ্ট করে এখানে আসতে হবে না।

মহিলাটি আবার লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কী যেন বললে। তাই শুনে লোকটা বললে, মাসি বলছে যে একবার তার বোনপোকে দেখবে।

আমি বললাম, দেখবে ? কিন্তু এখন তো সে ঘুমোচ্ছে।

লোকটা বললে, তবু একবার দেখতে চাইছে মাসি। হাজার হোক মাসির প্রাণ তো। বোনপো হলেও খোকন তো মাসির পেটের ছেলের মতই।

বললাম, কিন্তু মাসীর এত যদি টান তাহ'লে বোনপোকে ছেড়ে সেখানে থাকবে কী করে ?

মহিলাটি লোকটার কানে আবার কী বললে। লোকটা সে-কথা শুনে আমাকে বললে, মাসি বলছে তা থাকতে পারবে। শুধু অসুখ হয়েছে শুনেই একবার দেখতে এসেছে।

বললাম, আচ্ছা এস—

বলে আমি ভেতরের দিকে তাদের নিয়ে গেলাম। তারাও আমার পেছনে-পেছনে আসতে লাগল। সেখানে গিয়ে দেখি আমার স্ত্রী তখনও আসে নি ভেতর থেকে। ঘুমন্ত ছেলেটাকে কোলে নিয়ে আয়া বসে আছে।

লোকটার সঙ্গে খোকনের মাসিও সেখানে এসে দাঁড়াল। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগল খোকনের দিকে। সে দেখা যেন তার আর শেষ হয় না।

আমি বাধা দিলাম। বললাম, তোমার যদি বোনপোকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয় তাহ'লে বরং ও একটু সেরে উঠলেই ওকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেও তুমি। আমি তোমাকে কষ্ট দিয়ে ওকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাই না

তারপর ওদের দু'জনে কী কথা হল। লোকটা বললে, মাসি বলছে মাসি শুধু একবার খোকনের মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে যাবে। আপনি একটু আজ্ঞা দেবেন?

আমার আপত্তি নেই শুনেই মহিলাটি খোকনের মাথায় হাতটা ছোঁয়ালে। তারপর একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আমার নিজেকে যেন বড় অপরাধী মনে হচ্ছিল। আমার টাকা আছে, তাই আমি একজনের বুকের নিধিকে এমন করে কেড়ে নিতে পারছি। এক্ষেত্রে আমার যদি টাকা না থাকত তো আমি কী করতুম? আসলে কি তাহ'লে টাকাটাই সব? অথচ টাকার প্রাচুর্যের জন্যেই তো আমার স্ত্রীর এই অসুখ। টাকা না থাকলে হয়তো আমার নিজের ছেলেকেও এই রকম করে কোনও নিঃসন্তান বড়লোকের কাছে দিয়ে আসতে হত, তাকে মানুষ করে তোলবার জন্যে।

লোকটা বাইরে এসে দাঁড়াতেই আমি বললুম, তোমরা যাচ্ছ?

মহিলাটি তখনও মুখটা ঘোমটায় ঢেকে চোখ মুছছিল। লোকটা বললে, হ্যাঁ যাই, আমরা সেই রাত থাকতে বেরিয়েছি ময়রাডাঙা থেকে, আবার অনেক দূর যেতে হবে।

বললাম, যাবার আগে তোমরা খালি মুখে যেও না, কিছু মুখে দিয়ে যাও, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

লোকটা বোধহয় রাজীই ছিল, কিন্তু মহিলাটি রাজী হল না।

বললাম, তাহ'লে একটু দাঁড়াও—

বলে ভেতর থেকে কিছু টাকা নিয়ে এসে দিতে গেলাম মহিলাটিকে। বললাম, টাকাটা রাখুন আপনার কাছে। আপনি গরীব মানুষ, আপনার কাজে লাগতে পারে। এতে পাঁচশো টাকা আছে সব সুদ্ধু। নিন—

মহিলাটি যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল।

আমি তখনও টাকা সুদ্ধ হাতটা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

বললাম, নাও ধর—

মহিলাটি কিছুই করল না। যেমন ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটাও বললে, নাও না মাসি, নাও না। তোমার অভাবের সংসার। আর হুজুরের তো টাকার অভাব নেই, নিতে দোষ কি? নাও-নাও, নিয়ে নাও—

মাসি সে-কথার কোন জবাব দিলে না।

আমি বললাম, এতদিন যে তুমি খোকনকে মানুষ করেছ, তারও তো একটা খরচা আছে। তুমি পরের বাড়ি খেটে ওকে খাইয়েছ-পরিয়েছ, না-হয় তারই দামটা নিলে।

মহিলাটি এবার লোকটার কানে-কানে কী বললে। সে-কথা শুনে লোকটা বললে, মাসি কী বলছে জানেন হুজুর? মাসি বলছে যে ও-তো বোনপোকে বিক্রি করছে না, যে তার দাম নেবে। ও আপনাকে এমনিই দান করে দিচ্ছে। আপনি কিছু মনে করবেন না হুজুর, মাসি ভদ্দরঘরের মেয়ে, পেটের দায়ে তাকে পরের বাড়িতে আস দাসীবৃত্তি করতে হচ্ছে, নইলে ভাল ঘরেই বিয়ে হয়েছিল মাসির। মাসি বলে যে ওর কপালের কষ্ট কেউ ঘোচাতে পারবে না, তবে বোনপোটা যেন খাওয়া-পরার কষ্ট না পায়, এইটে দেখবেন। এর চেয়ে আর বেশি কিছু চায় না মাসি।

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না।

শেষকালে বললাম, তাহ'লে আমি এক কাজ করি। তোমাদের ঠিকানাটা আমি লিখে রাখি, ও ভাল হয়ে গেলে ওকে নিয়ে আমিই একদিন তোমাদের ওখানে যাব। তোমার নামটা কী বলো তো?

লোকটা বললে, আমার নামটা হলো ভৈরব— ভৈরব আড্ডি।

আমি নাম-ঠিকানা লিখে রাখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কী করো?

লোকটা হাসতে-হাসতে বললে, আমি কিছু করি নে আজ্ঞে, আগে যাত্রা করতুম, এখন কোনও কাজ নেই।

বললাম, ঠিক আছে। খোকনের অসুখ সেরে গেলেই আমি তোমার

মাসির কাছে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আসব খোকনকে।

সেই শুনে তারা চলে গেল। এর কিছুদিন পরেই খোকনের অসুখ সেরে গেল। প্রথম-প্রথম সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যেত মাঝে-মাঝে। হঠাৎ খেতে-খেতে হয়তো বলে উঠত—আর খাব না, আমার পেট ভরে গেছে।

রিটা বলত, খাও, খেয়ে নাও লক্ষ্মী ছেলে।

খোকন বলত, আর খেতে পারছি না যে।

রিটা বলত, খেয়ে নিলে তোমাকে আর একটা ছবির বই কিনে দেব।

ছবির বইয়ের আশ্বাস পেলেই আবার সে সব খেয়ে নিত। তারপর বলত—কই, ছবির বই দাও তাহ'লে?

তখন আমার স্ত্রী তাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিউ মার্কেটে নিয়ে যেত! সেখানে তার যা-খুশী তা সে কিনত। যত টাকা ইচ্ছে খরচ করত। যা সে চাইত, তাই সে পেত। তার জন্যে উদার ছিলাম আমরা দু'জনেই।

তারপর থেকে আমি যেন একটু নিশ্চিন্তের হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। তোমাকে তো আমি বলেছি ডাক্তার কেমন করে আমার অবস্থা ফিরে গিয়েছিল, কেমন করে কোন্ ঘটনাচক্রে আমার বিয়ে হয়েছিল। আবার বিয়ের পর কেমন করে স্ত্রীর অসুখ নিয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলুম।

এবার তা থেকে আমি নিষ্কৃতি পেলাম।

ভাবলুম, এবার আমি আবার আমার স্বাভাবিক কাজ-কর্ম চালিয়ে যেতে পারব। রিটাকে তো আমি সন্তান দিতে পেরেছি। সুতরাং স্ত্রীর ওপর আমার সমস্ত দায়িত্ব চুকে-বুকে গেছে! আমাকে অফিসে আসতে দেখে আবার আমার অফিসাররা খুব খুশী হল।

আমার ডেপুটি নরসিংহম্ এসে আমার বাড়ির খবর জিজ্ঞেস করলে।

এতদিন আমার অনুপস্থিতিতে আমার অফিসে যা-যা হয়েছে, যা-যা ঘটে গেছে, সমস্ত রিপোর্ট দিলে। ছেলেটি বড় ভাল, ডাক্তার। আমি যখন একবার সাউথ ইণ্ডিয়াতে গিয়েছিলুম, তখন তার সঙ্গে পরিচয় হয়। সামান্য মাইনে পেত সে তখন। আমি তার কাজ দেখে খুব খুশী হয়েছিলুম, তারপর বলেছিলুম যদি তার কখনও আমার অফিসে জয়েন করতে ইচ্ছে হয় তো তার জন্যে আমার অফিসের দরজা সব সময় খোলা থাকবে। তারপরে একদিন সে আসতেই আমি তাকে আমার অফিসে চাকরি দিয়ে দিয়েছিলুম। তারপরে ধাপে-ধাপে তার প্রমোশন হয়েছে। সে এখন ঠিক আমার নীচের ধাপে। আমি এখন তাকে আমার ডেপুটি করে নিয়েছে।

প্রথম সে ভাল কোয়ার্টার পায় নি। চাকরিতে যেমন-যেমন সে প্রমোশন পেয়েছে, তেমনি-তেমনি সে আরো ভাল বাড়ি ভাড়া করেছে।

তারপর যখন তার মাইনে আরো বেড়েছে, তখন অফিস থেকে লোন নিয়ে একটা বাড়ি করেছে। অফিস থেকে এ্যাডভান্স দিয়েছি।

আমার বাড়ির কাছাকাছি একটা খালি জমি ছিল, সেটাই সে কিনে নিয়েছিল। তারপর আস্তে-আস্তে সেখানে তার বাড়ি উঠল। আমি সে-বাড়ি দেখেছিলাম গৃহ-প্রবেশের দিনে।

সামান্য অবস্থা থেকে নরসিংহম্ নিজের অবস্থা ফেরাতে পেরেছিল বলে, আমার একটা স্নেহ ছিল তার ওপর। বাড়ি ছোট, কিন্তু বেশ সাজানো-গোছানো। বলেছিলাম এবার একটা বিয়ে কর তুমি নরসিংহম্।

নরসিংহম্ বলেছিল, হ্যাঁ স্যার এবার বিয়ে করব, তবে বাবা-মার ইচ্ছে আমি তাদের মত নিয়ে বিয়ে করি।

আমি বলেছিলুম, নিশ্চয়ই। যা কিছু করবে বাবা-মায়ের মত নিয়ে করবে। আমার বাবা-মা-ভাই-বোন কেউ কোথাও ছিল না তাই আমি নিজেই পছন্দ করেছিলাম। কিন্তু তুমি তা করো না নরসিংহম্, তুমি সব ব্যাপারে তাদের মত নেবে।

নরসিংহম্ বলেছিলে, বিয়ে করলে স্যার আমি ম্যাড্রাসে গিয়েই বিয়ে করব।

বলেছিলাম, নিশ্চয়ই, তুমি যখন ছুটি চাইবে আমাকে বোল।

সে বলেছিল, ঠিক আছে স্যার এখন অডিটিং হচ্ছে, অডিটিংটা হয়ে গেলেই আমি ছুটি নেব।

এই রকমই ঠিক হয়েছিল। কিন্তু তার পরেই আমার স্ত্রীর অসুখের ব্যাপারে আমিও আর অফিসে আসতে পারি নি, সে-ও সেইজন্যে আর ছুটি নিতে পারে নি, বিয়ে করতেও পারে নি।

এতদিন পরে আমি অফিসে জয়েন করেছি। বললাম, এখন তুমি ছুটি নিতে পার নরসিংহম্। এখন নেবে ছুটি? বিয়ের ঠিকঠাক কিছু হয়েছে?

নরসিংহম্ বললে, হ্যাঁ স্যার।

তাকে আমি ছুটি দিলাম। নরসিংহম্ ছুটি নিলে একমাসের। একমাস পরে বিয়ে করে সে নতুন বাড়িতে উঠল। আমাকে একদিন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বউ দেখালে। ভারী প্রতিমতী বউটি। আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। আমি তাকে আশীর্বাদ করলাম।

আমার স্ত্রীর সঙ্গে নরসিংহম্-এর স্ত্রীর তুলনা করে দেখলুম। পায়ে আলতা, মাথায় সিঁথিতে সিঁদুর, অথচ রিটা তো জীবনে কখনও পায়ে আলতা পরে না, মাথায় সিঁথিতে সিঁদুরও দেয় না। বরং চুল বব্ করে ছাঁটে।

সেদিন বেশিক্ষণ থাকি নি আমি নরসিংহম্-এর বাড়িতে। চা দিয়েছিল তার স্ত্রী। কিছু না খেলে খারাপ দেখায় বলে আমি তা খেয়েছিলুম। নরসিংহম্-এর স্ত্রী জানত যে আমিই নরসিংহম-এর দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। নরসিংহম্-এর জীবনের যা কিছু উন্নতি, তা আমিই করে দিয়েছি। আমি তাদের বাড়িতে যাওয়াতে সে খুব কৃতার্থ হয়েছে, এটাও তাদের আচারে-আপ্যায়নে বোঝা গেল।

ফিরছি, এমন সময় একটা ব্যাপার দেখে বড় অবাক হয়ে গেলাম। মাঝপথেই থমকে দাঁড়ালাম আমি। দেখি দেওয়ালের গায়ে আমার একটা ছবি টাঙানো।

সেই দিকে চেয়ে আছি দেখে নরসিংহম্ বললে, ওটা স্যার আমাদের অফিসের গ্রুপ ফটো থেকে আলাদা করে এনলার্জ করে নিয়েছি।

বললান, কেন এটা রাখলে আবার?

নরসিংহম্ বললে, না স্যার ওটা আমি রাখবই। আপনি বারণ করবেন না আমাকে। আপনি আমার জন্যে যা করছেন, তা আমি জীবনে ভুলব না। এর পরে আমার আর কী বলবার থাকতে পারে। বললাম, আমি আর কী করেছি নরসিংহম্, তুমি নিজের কাজ দেখিয়ে জীবনে উন্নতি করেছ। এই বলে আমি আমার বাড়ি চলে এলাম।

দেখ ডাক্তার, যে আমার কর্মচারী তার বাড়ির সুখ-শান্তি দেখে আমার আনন্দ হওয়ারই কথা। কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমার যেন একটু হিংসে হল নরসিংহম-এর ওপর। আমি তার মনিব, আর সে আমার ডেপুটি, আমার কর্মচারী। অথচ সে আমার চেয়েও সুখী, আমার চেয়েও ঐশ্বর্যবান।

বাড়িতে এসে দেখি রিটা তখনও ফেরে নি। আমার নিজের ঘরে গিয়ে জামা-প্যান্ট বদলে ড্রেসিং গাউনটা পরে নিলাম। যখন অনেক রাত হল, তখন রিটার বাড়ি ফেরার শব্দ পেলাম। আমারই গাড়ির শব্দ, আমারই গাড়ির হর্ন।

রিটা ভেতরে আসতেই দেখি খোকনও ফিরেছে। হাতে তার অনেক প্যাকেট। মুখটা হাসি-হাসি। বললাম ওটা কী?

খোকন বললে, কেন।

রিটা বললে, ও কেক খেতে চাইল তাই কিনে দিলাম। সেদিন খেয়ে ওর খুব ভাল লেগেছিল···

বললাম, এতক্ষণ কি শুধু নিউমার্কেটেই ছিলে নাকি?

রিটা বললে, না, সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম ওকে নিয়ে। একটা জঙ্গলের ছবি হচ্ছিল, ভাবলুম ওর হয়তো ছবিটা খুব ভাল লাগবে।

আমি খোকনকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলাম। বললাম, সিনেমা দেখতে তোমার খুব ভাল লেগেছে তো ?

খোকন বললে, একটা সিংহ দেখছি, সে একটা বাঘের সঙ্গে খুব লড়াই করছিল।

রিটা বললে, জানো সিনেমার সামনে একটা ভিখিরীর ছেলে পয়সা চাইছিল, তাকে দেখে ও হঠাৎ থেমে গেল। আমি তো অবাক! শেষকালে জিজ্ঞেস করলুম—ওর দিকে চেয়ে কী দেখছ খোকন? ও কি বললে জানো? বললে, ওকে একটা পয়সা দাও মাম্মি।

—কেন, পয়সা দিতে বললে কেন?

রিটা বললে, আমিও তো তাই ভাবলুম। ও তো এতদিন ভিখিরী দেখেনি।

খোকন বললে, আমাদের দেশে ওইরকম ছেলে আছে যে! ওইরকম খালি পা, খালি গা, গায়ে ময়লা, খেতে পায় না। তুমি দেখনি?

—ওসব কেন ওকে দেখালে বলো তো? ওর দেশের কথা হয়তো মনে পড়ে গিয়েছিল।

রিটা বললে, আমি ভিখারীটাকে তাড়িয়ে দিতে গেলুম। বললাম, ভাগ—ভাগ এখান থেকে কিন্তু খোকন হঠাৎ কেঁদে ফেললে। বললে, ওকে তাড়াচ্ছ কেন মাম্মি, ওকে পয়সা দাও।

বললাম, তারপর?

রিটা বললে, তারপর আমি একটা আধুলি দিলুম তাকে। সে আধুলিটা নিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেল। তারপর খোকন আবার বললে, ওই যে আর একটা রয়েছে, ওকেও পয়সা দাও।

* * *

আমি শুনছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

তারপর যে ঘটনার কথা শুনলাম, তাতে আরো অবাক হয়ে গেলাম। সিনেমার সামনে রিটা গাড়ি থেকে নেমে সব ভিখিরী ছেলেগুলোকে পয়সা দিচ্ছে দেখে আরো অনেক ভিখিরী এসে জুটল। যাকে দেখে তাকেই পয়সা দিতে বলে খোকন। বলে, ওকে পয়সা দাও ওকে। ওই ওদিকের ও ছেলেটাকে পয়সা দিলে না? সকলকে দাও।

রিটা বললে, আর সময় নেই খোকন, সিনেমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু খোকন কিছুতেই ছাড়বে না। বললে, ওকেও পয়সা দাও, ওকে ওকে পয়সা না দিলে আমি যাব না।

কী মুশকিল! রিটা বললে, আর বেশি পয়সা দিতে গেলে দেরি হয়ে

যাবে, সিনেমা আরম্ভ হয়ে যাবে।

কিন্তু এমন সময় একটা অবাক কাণ্ড ঘটল।

হঠাৎ একটা নোংরা ভিখিরীর ছেলে এসে খোকনের হাত ধরেছে। বললে, এই খোকন, তুই? তুই এখানে কেন রে?

খোকনও তাকে চিনতে পেরেছে। বললে, তুই এখেনে কী করছিস?

সেই ছেলেটা বললে, ভিক্ষে করতে এসেছি কলকাতায়।

রিটা শুনে অবাক! বললে, খোকন, এদিকে চলে এসো। ওদের ছুঁয়ো না। ওরা নোংরা ভিখিরী।

খোকন বললে, না মাম্মি, এ ভিখিরী নয়, আমাদের দেশের ছেলে, একে আমি চিনি, একে পয়সা দাও মাম্মি—

রিটা বললে, ওকে আগে ছেড়ে দাও, দেখছ কত নোংরা ও।

খোকন বললে, ও যে আমার বন্ধু মাণিক।

রিটা 'মাণিক' নামে ছেলেটার দিকে তেড়ে গেল। বললে, এই ভাগ হিঁয়াসে, ভাগ, ভিখ্ মাঙতা হ্যায়—

খোকন বললে, ওকে মারছো কেন মাম্মি? ও যে আমার বন্ধু হয়, ও যে ময়রাডাঙার ছেলে, ওকে মারছ কেন?

রিটা বললে, বেশ করব মারব। দেখছ না কী ডার্টি বয়, এরা সবাই চোর, ভিখিরী সেজে কলকাতা শহরে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। এরা দিনের বেলায় ভিক্ষে করে আর রাত্তিরে চুরি-ডাকাতি করে। ভাগো! ভাগো হিঁয়াসে। ভাগ যাও—

খোকন রিটার হাত ছাড়িয়ে মাণিকের দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল। বললে, মাণিক, তুই এখানে কী করছিস? চল, আমাদের বাড়িতে চল।

মাণিক বললে, ও কে রে তোর?

খোকন বললে, ও আমার মাম্মি।

মাণিক বললে, মাম্মি মানে?

খোকন বললে, মাম্মি মানে জানি না। ওরা আমাকে মাম্মি বলে ডাকতে বলে দিয়েছে ওকে। চল, আমাদের বাড়িতে তোকে নিয়ে যাব। তুই এমন করে রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষে করছিস কেন?

মাণিক বললে, আমি দু'দিন কিছু খাই নি রে! বড্ড খিদে পেয়েছে আমার। তোর বাড়িতে গেলে আমাকে খেতে দিবি তুই?

খোকন বললে, হ্যাঁ খেতে দেব। আমাদের বাড়িতে অনেক খাবার আছে, জানিস্? রসগোল্লা আছে, রাজভোগ আছে চকলেট আছে।

মাণিকের চোখ দু'টো গোল হয়ে উঠল। বললে, আমার রসগোল্লা

খেতে খুব ভাল লাগে ভাই, আমি কলকাতার খাবারের দোকানে রসগোল্লা দেখিনি।

হঠাৎ কথা শেষ হবার আগেই রিটা কোথা থেকে একটা পুলিস ডেকে নিয়ে এসেছে তখন। খোকন-মাণিক দু'জনের কেউই টের পায় নি, কথা বলতে ব্যস্ত ছিল। পুলিসটা এসে মাণিকের গলাটায় এক ধাক্কা দিতেই সে চমকে উঠেছে। চোখ তুলে পুলিসকে দেখেই সে ছুটে পালাতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই পুলিসটা তাকে ধরে ফেলেছে। ধরে ফেলে এক থাপ্পর মেরেছে, সঙ্গে-সঙ্গে মাণিক রাস্তার ওপর পড়ে গেছে।

খোকন চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করে উঠল—মারলে কেন? মারলে কেন ওকে?

রিটা তাকে ধরে নিজের কাছে জোর করে টেনে নিলে। বললে, ছি, ডোণ্ট বি নটি! দুষ্টুমি করতে নেই, পুলিস ঠিক করেছে, ওকে ওর ডিউটি করতে দাও।

কিন্তু খোকন, তবু শোনে না। বললে, ও যে আমার বন্ধু, ওকে যে আমি চিনি, ওকে পুলিস মারবে কেন? ও কী দোষ করেছে?

কিন্তু অত কথার জবাব দেওয়ার দরকার মনে করলে না রিটা। সে তাড়াতাড়ি খোকনকে নিয়ে সিনেমা-হলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আব তারপর সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকে আর কিছু ভাববার সময় পেল না খোকন। ছবি ততক্ষণে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ছবির পর্দায় তখন সিংহ আর বাঘের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। ছবির রোমাঞ্চের মধ্যে তখন কোথায় গেল মাণিক আর কোথায় গেল পুলিস। ছবির জগতের অতলে তখন মাণিক, পুলিস, ময়রাডাঙা সব কিছু তলিয়ে রসাতলে চলে গেছে।

* * *

ঘটনাটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে মনে ভাবনা হল, এটা তো ঠিক নয়।

খোকন তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। রিটা বললে, দিন-দিন বড় স্বভাব খারাপ হয়ে যাচ্ছে খোকনের। ওকে নিয়ে কী করি বল তো? আজ যদি পুলিসটাকে না ডাকতুম, তাহ'লে কিন্তু খুব বিপদ হত আমার। ভাগ্যিস সেই সময়ে পুলিসটাকে দেখতে পেলুম সেখানে।

কথাটা শুনে আমার নিজের জীবনের কথাও মনে পড়ে গেল। ওই মাণিকের মত আমাকেও তো কতদিন পুলিস গলা-ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই বিরাট কলকাতা শহরে কতদিন আমি খেতে পাইনি, ডাক্তার, কত দিন বর্ষার রাতে এমন একটা গাড়ি-বারান্দা পাইনি, যেখানে আশ্রয় নিয়ে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচি। যেখানেই গিয়েছি পুলিস আমাকে

তাড়া করেছে! আমিও ছিলুম ওই খোকনের বন্ধুর মতো আর একজন মাণিক।

গল্পটা শুনে আমি খোকনের ওপর রাগ করতে পারলুম না, সেই কোন্ এক মাণিকের ওপরও রাগ করতে পারলুম না। রাগ করব কী করে? রাগ করলে তো নিজের ওপরেই রাগ করতে হয়।

রিটা বললে, কাল খোকনকে তুমি একটু বকে দিও, বুঝলে?

আমি রাজী হলুম। মুখে বললুম, হ্যাঁ বকে দেব।

রিটা বললে, বলে দিও যে আগে সে যা ছিল, কিন্তু এখন সে এ-বাড়ির ছেলে, এ বাড়ির সম্মান রাখতে গেলে রাস্তার নোংরা ছেলেদের সঙ্গে সে যেন না মেশে।

বললাম, হ্যাঁ, তাই-ই বলে দেব।

বলে আমি শুয়ে পড়লাম। মনে-মনে ভাবলুম, কই, তারা তো আর আসে না, খবরও দেয় না। সেই ময়রাডাঙায় ভৈরব আড্ডি আর তার সেই মাসি। তা কেনই বা আর খবর নেবে? তাদের গলগ্রহ ছিল যে ছেলেটা তার ভার যখন আমি নিয়েছি, তখন তারা মুক্তি পেয়ে গেছে। তারা তো নিজেদের চোখেই দেখে গেছে, তাদের ছেলে বড়লোকের হাতে পড়েছে। তারা বুঝে গেছে যে এ-বাড়িতে থাকলে তাদের ছেলের খাওয়া-পরার অভাব জীবনে কোনও দিন হবে না। সুতরাং তারা সমস্ত ভাবনা-চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েছে।

তারপর ডাক্তার, সেই খোকন আরো একটু বড় হল।

তখন তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। কলকাতার সেরা স্কুল। শুধু কলকাতার ভি, আই, পি-দের ছেলেমেয়েরাই সেখানে পড়ে। এই যারা জর্জ, মন্ত্রী, রাইটার্সের সেক্রেটারি, তাদের ছেলেরই সব পড়ে সেখানে। দার্জিলিং কিংবা দেরাদুনেও ভাল-ভাল স্কুল আছে। সেখানে রেখে পড়ানোর মত টাকাও আমার ছিল ডাক্তার। কিন্তু আমাদের একমাত্র ছেলে, অনেক কষ্টে তাকে পেয়েছি, তাকে দূরে পাঠিয়ে আমরা কী করে থাকব? তাহ'লে যদি আবার রিটার অসুখটা বেড়ে যায়? আবার যদি সেইরকম পাগলামি শুরু হয়ে যায়?

ডাক্তার বলে দিয়েছিল, ছেলেকে সব সময়ে মিসেস সেনের কাছাকাছি রাখবেন। মিসেস সেনের কাছ থেকে ছেলেকে কখনও দূরে সরিয়ে দেবেন না। তাই সব দিক বিবেচনা করে একদিন রিটা নিজেই কলকাতার একটা ফ্যাশনের স্কুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিলে তাকে।

প্রিন্সিপ্যাল নিজে পরীক্ষা করলেন খোকনকে!

জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী ?

খোকন বললে, দেবব্রত সেন।

—তোমার ফাদারের নাম ?

খোকন বললে, মিস্টার পি, সেন।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, ভেরি গুড্।

বলে রিটার দিকে চেয়ে বললেন, মিসেস সেন, আপনার ছেলেটি ভেরি ব্রাইট। ভেরি ইনটেলিজেন্ট। আমি এর সম্বন্ধে স্পেশাল কেয়ার নেব, ইউ ডোণ্ট ওরি, আপনি কিছু ভাববেন না।

তারপরে কী খেয়াল হল, জিজ্ঞাসা করলেন, এ বুঝি খেলা খুব ভালবাসে ? স্পোর্টসের দিকে বুঝি খুব ঝোঁক এর।

মিসেস বললে, হ্যাঁ ; খুব ঝোঁক, খুব ফুটবল খেলা দেখতে ভালবাসে।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, তা-তো হবেই। মিস্টার সেনেরও বুঝি খুব স্পোর্টসের দিকে শখ আছে ?

মিসেস সেন বললে, তা-তো আছেই, আমারও খুব শখ ওদিকে, কিন্তু উনি তো সময় পান না।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, সেই জন্যেই এর হেলথ্ এত ভাল। বাবা-মা'র স্বভাবটা পেয়েছে। আমি বলছি এইটুকু বয়সেই যখন এর এত বুদ্ধি, তখন বড় হলে বুদ্ধি আরো ভাল হবে দেখে নেবেন আপনি। বড় হলে এ ঠিক এর ফাদারের মত ইনটেলিজেন্ট হবে।

সাধারণতঃ কোন স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল এত কথা বলে না কাউকে। কিন্তু ওই যে শুনেছে আমার নাম, অমনি ফ্ল্যাটারি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। সে যাহোক ডাক্তার, এ-সব ঘটনা নিয়ে আমি কিছু ভাবি না। আমার নিজের ছেলে নয় খোকন, সেটা আমি আর আমার মিসেস দু'জনেই জানি, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল ধরে নিয়েছ খোকন আমাদেরই ছেলে। তার ওপর জেনে নিয়েছে খোকন হল মিস্টার পলটু সেন, গ্রীয়ারসন এণ্ড কোং লিমিটের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ছেলে, তাই একটু খোসামোদ করে দিলে।

খোসামোদ জিনিসটা ভাল ডাক্তার। যে খোসামোদ পায় আর যে খোসামোদ করে, দু'জনের পক্ষেই সেটা ভাল। কিন্তু তারও তো একটা ডিগ্রী আছে, একটা মাত্রা আছে। সেই মাত্রাটি ছাড়িয়ে গেলে খোসামোদ-প্রাপক আর খোসামোদকারী দু'জনের পক্ষেই সেটা খুবই ক্ষতিকর।

কিন্তু ঘটনাটা আমার কাছে যত খারাপই লাগুক, শেষ পর্যন্ত যে খোকনকে একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে, এটা আমার পক্ষে সুখবর। সেইদিন থেকে ব্যবস্থা হয়ে গেল যে আমার নিজের ড্রাইভার মদন খোকনকে

নিয়ে সকালবেলা স্কুলে পৌঁছিয়ে দেবে, আর ছুটির আগে গাড়ি গিয়ে স্কুলের সামনে থাকবে। স্কুল ছুটি হলে তাকে সেখান থেকে আবার বাড়ি নিয়ে আসবে। আমি নিশ্চিন্ত।

সেইদিন থেকে আমি আবার অফিসের কাজে বেশি মন দিতে লাগলাম। আমাদের অফিসে তখন বাজেটের কাজ চলছে। আমি অফিসের হু'টো ব্যাপারে খুব বেশি মন দিই। আমাদের অফিসের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরর্স আছে বটে, তারাই সব কিছু ব্যাপারের জন্যে দায়ী। কিন্তু আমাকে সমস্ত ব্যাপারের জন্যেই দায়িত্ব নিতে হয়। প্রথম হচ্ছে বাজেট পাস, দ্বিতীয় হচ্ছে অডিট্। অর্থাৎ হিসেব-নিকেশ? আমার চ্যাটার্ড এ্যাকাউনটেন্ট যা-ই করুক, ওটা আমি নিজে দেখে তবে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরর্সের সামনে হাজির করি। এটা আমাকে মিস্টার গ্রীয়ারসন নিজে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

বাজেট তৈরি হবার পর আমার একবার বাইরে যাবার দরকার হল। অর্থাৎ ইণ্ডিয়ার বাইরে। অফিসের কাজেই যেতে হবে জার্মানীতে।

কিন্তু তার আগে একবার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম ডাক্তার, এই অবস্থায় আমি কি সাত দিনের জন্যে জার্মানীতে যেতে পারি।

ডাক্তার সবই জানত! জিজ্ঞেস করলে, এখন তো মিসেস নর্ম্যাল।

বললাম, হ্যাঁ, পুরোপুরি নর্ম্যাল। পুরোপুরি স্বাভাবিক।

ডাক্তার বললে, দেবব্রত স্কুলে যাচ্ছে।

বললাম, হ্যাঁ যাচ্ছে—খুব নিয়ম করেই যাচ্ছে। তার তো সকাল বেলায় স্কুল। সে ভোরবেলায় স্কুলে যায়, আবার বেলা বারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে। তারপর সারাদিন মিসেসের সঙ্গে কাটায়। সন্ধ্যেবেলা আমি মিসেসকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবে যাই, কিংবা নিউ মার্কেট, আর নয় তো গঙ্গার ধারে। তখন মিসেসের মেজাজও ভাল, আর খোকনও ভাল থাকে।

ডাক্তার বললে, সেই সেবারের মত আর রাস্তার স্ট্রীট-বয়দের সঙ্গে দেবব্রত মেলামেশা করে না তো?

বললাম, না, সে-ব্যাপারে তারপর থেকে আমরা খুব সাবধান হয়ে গিয়েছি। যার-তার সঙ্গে মেশবার কোনও সুযোগই পায় না। সব সময়ে আমাদের চোখে-চোখে রাখি তাকে।

ডাক্তার বললে, ভেরি গুড্, তাহ'লে সাতদিনের জন্যে আপনি বাইরে যেতে পারেন। তবে সেখান থেকে রোজ একবার করে মিসেসকে টেলিফোন করবেন।

আমার ডেপুটি নরসিংহমকেও আমি সমস্ত কাজ বুঝিয়ে দিলাম। আমি যতদিন কলকাতায় থাকব না, ততদিন তারই দায়িত্ব। একদিন যাত্রা

করলাম। যাত্রার সময় মিসেসকে বললাম, দেখো, খোকনকে চোখে-চোখে রাখবে সবসময়ে, ডাক্তার বিশেষ করে বলে দিয়েছে।

এরপর আমি বাইরে। কলকাতায় কী ঘটছে আমি জানি না। জার্মানীতে পৌঁছেই হোটেল থেকে আমি বাড়িতে টেলিফোন করলাম। রিটা ধরলো। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ভাল আছ রিটা?

রিটা বললে, হ্যাঁ।

—খোকন? খোকন কেমন আছে?

রিটা বললে, খুব ভাল।

—স্কুলে যাচ্ছে?

রিটা বললে, হ্যাঁ যাচ্ছে, আমি তার সঙ্গে হেভি টিফিন দিয়ে দিচ্ছি। এগ্স্ আর আটটা স্যাণ্ডুইচ দিই ওকে! ও খুব খুশি। বাড়ি আসার পর আমি ওর টিফিন-বক্স খুলে দেখি সব খেয়ে নিয়েছে। বাড়িতে এসেও ক্ষিধে থাকে ওর।

—আর লেখাপড়া? লেখাপড়া কেমন করছে?

রিটা বললে, আমি তো ওর খাতা খুলে দেখি, তাতেও খুব ভাল রিপোর্ট থাকে।

এর পরে আমার আর কথা বলার কিছু থাকে না। আমি রিসিভার রেখে দিই! পরের দিন রাত্রে আবার ওই কথা। একই কথা হয় প্রতিদিন। এমনি করে তিন-চার দিন কেটে গেল। হঠাৎ পাঁচ দিনের দিন একটা কাণ্ড শুনে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। বললাম, রিটা, কী হল, কেমন আছ?

এদিক থেকে রিটা জানালে, খোকনকে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি তো অবাক। জিজ্ঞেস করলাম—কেন? কী হল? শীগগির বলো। বেশি সময় নেই। পুলিশকে খবর দিয়েছ?

রিটার গলার সুরে কান্না মেশানো। বললে—খবর দিয়েছি, তারা খোঁজ করছে। তুমি এক্ষুণি চলে এস। আমার কিছু ভাল লাগছে না।

আর বেশি কথা বলবার ইচ্ছে হল না। রিসিভারটা ছেড়ে দিয়েই এয়ারপোর্টে টেলিফোন করে ইণ্ডিয়ায় ফেরার ব্যবস্থা করলাম। আর তারপর দিনই জার্মানী থেকে স্টার্ট করলাম। কলকাতায় ফিরে এসে সোজা বাড়ি। তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে।

আমার স্ত্রী জেগেই বসেছিল আমার জন্যে। আমাকে দেখেই গম্ভীর হয়ে গেল। কাঁদলে না, কোন অভিযোগও করলে না একেবারে গম্ভীর। আমার ভয় হয়ে গেল। আবার তার সেই পুরনো রোগটা ফিরে এল নাকি! আবার যদি তা হয় তাহ'লে আমি কী করব।

জানো ডাক্তার, আমাদের মানুষের জীবনটাই বোধহয় এই। এই ভয়, এই আবার আশা। এই মনে হল সব বুঝি আমরা হারালুম, আবার তখনই মনে হল - না কিছুই হারাইনি, কোনও ভয় নেই আমার, সমস্ত ঠিক আছে। সেই ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত এই ভাবেই আমার জীবন কেটেছে।

অথচ ক'দিন আগেই আমার কত আশা ছিল, কত আনন্দ। রিটা ভাল হয়ে গেছে, তার মনের আশা পূর্ণ হয়েছে খোকন এসেছে অযাচিত-ভাবে আমারে সংসারে। সে বড় হবে, সে আমার ফার্মের গৌরব বাড়াবে, তার হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে এই আশাই আমার মনে জেগেছিল। আমি আবার অনেক উৎসাহ নিয়ে অফিসের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু তখন কি জানি, আবার দু'দিন পরেই সব আশা-ভরসা এমন করে ধুলিসাৎ হয়ে গিয়ে আবার দুর্ভাবনায় অশান্ত হয়ে উঠব ?

আমি আর দেরি করলাম না। সঙ্গে-সঙ্গে পাড়ার থানায় টেলিফোন করলাম। আমি আমার নাম বললাম। সত্যি, নামের যে মহিমা আছে, তা যেদিন থেকে বড়লোক হয়েছিলাম, সেইদিন থেকেই বুঝে ছিলাম।

ও-সি বললে, হ্যাঁ স্যার, আমি এক্ষুণি খুঁজছি স্যার কোথায় আছে আপনার ছেলে।

জিজ্ঞেস করলাম, স্কুলে খবর নিয়েছিলেন আপনি ?

ও-সি বললে, হ্যাঁ স্যার, আমি মিসেসের কাছে কমপ্লেন পেয়েই সঙ্গে-সঙ্গে স্কুলে চলে গিয়েছিলাম। প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করে সব ঘটনাটা জেনে নিয়েছি। আপনার ড্রাইভার নাকি স্কুলে গিয়ে আপনার ছেলে দেবব্রতকে পায় নি। অথচ প্রতিদিন গাড়ির জন্যে সে অপেক্ষা করে। কিন্তু প্রিন্সিপাল কোনও সন্দেহ করেন নি। সে-যে সেদিন কোথায় গেল তা কেউ বলতে পারলে না। দরোয়ান তাকে স্কুল ছুটি হবার সময়ে দেখেছে—কিন্তু যখন ড্রাইভার এসেছে তখন আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

আমি বললাম, তাহ'লে এখন কী হবে ? এখন আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেল, এখনও যখন তাকে খুঁজে বার করতে পারলেন না, তাহ'লে আর কখন পাওয়া যাবে ? যদি তাকে গুণ্ডারা কোথাও বাইরে পাঠিয়ে দেয় ?

ও-সি বললে, আমি তো স্যার খোঁজ রাখছি ! সব থানায় ম্যাসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি ! আমি আশা করছি শীগগিরই তাকে উদ্ধার করতে পারব। আপনি স্যার আর একটা দিন আমাদের টাইম দিন।

আমি ফোন ছেড়ে দিলুম। তারপর মদনকে ডাকলুম। মদন আমার

ড্রাইভার। সে-ই খোকনকে স্কুলে পৌঁছে দিত, আর স্কুল থেকে নিয়ে আসত।

মদন আমার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে থর-থর করে কাঁপছিল।

সেদিন যা-যা ঘটেছিল, সবই সে আমাকে বলে গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তুই কী করলি?

মদন বললে, আমি হুজুর দরোয়ানকে গিয়ে বললুম। দরোয়ান বললে, আপনাদের ছেলে তো স্কুলে নেই ড্রাইভারজী।

মদন দরোয়ানকে বললে, স্কুলে নেই তো কোথায় গেল?

দরোয়ান তখন বিপদে পড়ে গেল বড়। তারও তো একটা দায়িত্ব আছে! সে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা সেখানে করে রইল। ভাবলে হয়তো স্কুলে কোনও ছেলের সঙ্গে কোথাও গল্প করছে। শেষকালে স্কুলের সব ছেলে যে-যার বাড়ি চলে গেল, স্কুল একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। যতগুলো গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও যে-যার ছাত্রদের নিয়ে চলে গেল। তখন কেবল একলা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মদন।

কিন্তু শেষকালে মদনেরও ভয় করতে লাগল। বাড়িতে ফিরে গিয়ে মেমসাহেবকে সে কী বলবে? তারই তো ডিউটি খোকনবাবুকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া আর স্কুল থেকে তাকে নিয়ে আসা খোকনবাবাকে না দেখতে খালি গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে সে মেমসাহেবের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবে?

শেষ পর্যন্ত যখন খোকনকে পাওয়া গেল না, তখন আর কোনও উপায় না পেয়ে খালি গাড়িটা ফিরিয়ে নিয়ে এল বাড়িতে।

মেমসাহেবের কাছে গিয়ে ঘটনাটা বলতেই মেমসাহেব গালাগালি দিয়ে উঠল—কাঁহা হ্যায় খোকনবাবা? দরোয়ানকো পুছা?

মদন বললে, হ্যাঁ মেমসাব, দরোয়ান তো বললে সে জানে না।

রিটা বললে, তা দরোয়ান বললে, আর তুইও তা বিশ্বাস করলি?

তখন আর মদন কোনও জবাব দিতে পারলে না, অপরাধীর মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তখন রিটা নিজেই গেল স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছে। সেখান থেকে কোনও সন্তোষজনক হদিশ না পেয়ে চলে গেল থানায়। থানায় গিয়ে একটা ডায়েরী করে দিলে।

আমি সব শুনলাম। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। আমি শুতে গেলাম। রিটাও তার ঘরে শুতে গেল। কিন্তু সে-রাত্রে দু'জনেরই ঘুম হল না। কী করেই বা ঘুম হবে!

পরের দিন বিছানা থেকে উঠেই আমি স্কুলে গেলাম। সেখানেও সেই একই উত্তর। প্রিন্সিপাল দোষ স্বীকার করলেন। স্টাফ্‌দের সামনে ডেকে বকা-ঝকা করলেন। কিন্তু তাতে কোনও ফল হল না।

সেখান থেকে গেলাম থানায়। সেখানেও সেই একই উত্তর। দেখছি, দেখব, এইসব কথা। কিন্তু জানতে পারলে না যে, সেদিন আমার আর অফিস যাওয়া হল না। অফিসে টেলিফোন করে দিলুম নরসিংহমকে যে আমি সেদিন এক বিশেষ কাজে অফিসে যেতে পারব না।

আমার বিপদটা এমনই যে আমি কাউকে বলতেই পারি না, যে কী আমার অশান্তি। এও এক রকমের লজ্জা! আমার নিজের সন্তান হয়নি; তার জন্যে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউই দায়ী নই। তবু যেন সেটা আমারই লজ্জা। টাকাকড়ি না-থাকার লজ্জার চেয়েই বড় লজ্জা।

সারাদিন ভাবতে লাগলাম—কী করি? অনেকবার থানায় টেলিফোন করে জানলাম যে তখনও কোনও সন্ধান পায়নি তারা খোকনের। আমি রিটার ঘরে গিয়ে তার দরজা ঠেললাম, তাতেও কোনও সাড়া নেই তার। আমি কতবার ডাকলাম—রিটা—রিটা—

ভেতর থেকে রিটার কোনও সাড়া নেই।

আবার ডাকলাম, তাতেও সাড়া নেই।

অথচ আমার অফিসে যদি একটু বেলটা তো সঙ্গে-সঙ্গে আমার চাপরাশী এসে আমাকে সেলাম করে দাঁড়ায়। আমার একটু হুকুমের জন্যে আফিসে সবাই তটস্থ হয়ে থাকে। সেখানে সবাই আমাকে ভয় যেমন করে, তেমনি আবার ভক্তিও করে। আমি শুধু মালিক নই, তাদের অন্নদাতাও যেমন, আমি, তেমনি আবার তাদের শুভাকাঙ্খীও বটে।

এ কী রকম জটিল জীবন আমার বল তো ডাক্তার? হয়তো এই জটিলতা নিয়েই সব মানুষের জীবন। আমরা একাধারে যেমন স্বামী, আবার পিতাও তো বটে। একদিকে আমরা প্রভু, আবার আর এক দিকে আমরা কর্মচারী। আমার যারা কর্মচারী, তারাও তো একজনের পিতা, কিংবা আর একজনের স্বামী। সেখানে তার নিজের পরিবারের ভেতরে সে প্রভু-মালিক সব কিছুই, আমার কাছে এসেই সে আবার ভৃত্য, আমার কর্মচারী। সেখানে তার কোনও স্বাধীন সত্তা নেই, আমি তাকে যেমন হুকুম করব, তেমনি সে-হুকুম সে তামিল করবে।

ভাবলাম, হয়তো খোকন তার মাসির কাছে সেই ময়রাডাঙায় চলে গেছে। ঠিক করলাম, সেদিন, সেই মরয়াডাঙাতেই আমি যাব। হয়তো সেখানে গেলেই তাকে পাওয়া যাবে।

বিকালবেলা রিটা ঘর থেকে বেরোতে আমি তাকে প্ল্যানটা বললাম।

কিন্তু রিটা কিছুতেই আমার সঙ্গে যেতে রাজী হল না। বললে—আমি কি ভিখিরী? আমি কি বেগার?

আমি বললাম, ভিখিরী কেন হবে তুমি? আমাদের ছেলে হারিয়ে গেছে, তার খোঁজ নিতে যাওয়া কি ভিক্ষে করা হল? মানুষ তো দূরের কথা, একটা গরু হারিয়ে গেলেও সবাই তার খোঁজ করে, পুলিসে খবর দেয়। আর এ তো একটা ছোট ছেলে! হয়তো সে তার মাসির কাছে গেছে, তাও তো হতে পারে।

এতদিন, এক বছর আমাদের কাছে খোকন ছিল, তাই তার ওপর একটা মায়াও পড়ে গিয়েছিল রিটার। কতদিন সে তাকে নিয়ে খেলা করেছে, কত জায়গায় তাকে নিয়ে সে বেড়াতে বেরিয়েছে, কত সিনেমা দেখেছে। খোকনও রিটাকে 'মাম্মি' বলে ডেকেছে। একটা স্বাভাবিক মায়া পড়ে গিয়েছিল আমারও তার ওপর যে-ও যেন আমাদের একজন হয়ে উঠেছিল একটা পাখী কি একটা কুকুব পুষলেও তার ওপর মায়া পড়ে যায়, আর ও তো তা নয়, ও একেবারে মানবশিশু।

আর আশ্চর্য! খোকনের মাসিই বা কী রকম! তার বোনপোকে আমাদের বাড়িতে সেই যে একেবার এসে তার অসুখ দেখে গিয়েছিল, তার-পর তো আর একবারও সে দেখতে এল না খোকনকে।

রিটাও তাই বলত—দেখ, খোকন কী রকম আমাদেব নিজের হয়ে গেছে

আমিও তাই দেখতুম। দেখে অবাক হয়ে যেতুম। যেহেতু আমাদের টাকা আছে, আমাদের সব রকম বিলাস উপকরণ আছে, তাই নিজের মাসিকে পর্যন্ত এমন করে ভুলে যেতে পারল। খোকনের জন্যে আমরা বাড়িতে কত পাখি পুষেছিলাম, ছোট ছেলেদের সাইকেল কিনে দিয়েছিলুম। যাতে সে তার মাসিকে ভুলে যেতে পারে, তার জন্যে আমরা আমাদের দিক থেকে কোনও ত্রুটি রাখিনি। নিউ মার্কেটে গিয়ে সে যখন যা কিনতে চেয়েছে তাই তাকে কিনে দেওয়া হয়েছে তার কোনও সাধ অপূর্ণ রাখা হয়নি কিন্তু আমার আর একটা মতলব ছিল যে, তাকে সঙ্গে-সঙ্গে লেখাপড়াও শেখাব। কারণ, একদিন বড় হয়ে যাকে আমার গ্রীয়ারসন কোম্পানীর হাল ধরতে হবে, তাকে সকলের আগে মানুষ হতে হবে। শুধু মানুষ নয় মানুষের মত মানুষ। এতদিনকার এত জল্পনা-কল্পনার কি সব এইভাবেই সমাধি হয়ে যাবে?

গাড়ি করে গেলাম ময়রাডাঙার দিকে। মদন আমার এক্সপার্ট ড্রাইভার সে জানে কোথায় ময়রাডাঙা, তাকে কিছু বলতে হবে না।

মদনকে আমি খুব বলেছিলাম, আসলে তোরই দোষ, তুই নিশ্চয়ই দেরি করে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলি! তোকে না দেখতে পেয়েই হয়ত সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে।

মদন বলেছিল, না স্যার, আমি রোজ যে-সময় গাড়ি নিয়ে যাই, ঠিক সময়েই গিয়েছিলাম।

ডাক্তার, আমি বরাবরই নিয়তি মানি। আমার নিজের জীবনটাই নিয়তির একটা খেলা। আমার গরীব অবস্থাটাও নিয়তির একটা খেলা, আমার বড়লোক হওয়াটাও তেমনি। কিন্তু মানুষের নিয়তিকে তো দেখা যায় না। তাই আমরা আমাদের বিপদের দিনে যুক্তি দিয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজতে যাই। তাই কখনও স্কুলের ঘাড়ে দোষ চাপাই, কখনও দোষ চাপাই স্কুলের দরোয়ানের ওপর, আবার কখনও দোষ চাপাই তৃতীয় কারও ওপর? কিন্তু তখনও কি জানি আমার জন্যে তখন কত বড় ট্র্যাজেডি নিয়তির হাতে লুকোনো রয়েছে।

তা সে-কথা আমি তোমাকে বলছি। এখন ময়রাডাঙার কথা বলি। সেই পুরানো ময়রাডাঙা। কাদা-ধুলো ভর্তি রাস্তা। আমার গাড়ির চাকা কাদার ভেতরে বসে যাবার মত অবস্থা হলো। শেষকালে আর গাড়ি গেল না। আমি রিটাকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম।

রিটা প্রথমে নামতে চায়নি। একদিন এই ময়রাডাঙাতেই সে অপমানিত হয়েছিল। একদিন এখান থেকেই সে কাঁদতে-কাঁদতে অপমান হজম করে আবার কলকাতায় ফিরে গিয়েছিল। সেই ময়রাডাঙাতেই সে আবার কোন মুখে গিয়ে দাঁড়াবে?

তবু আমার পীড়াপীড়িতে সে নামল গাড়ি থেকে।

তাকে বুঝিয়ে বললাম, খোকনের মাসি তো সে-রকম লোক নয়, সে তো নিজে এসেই তার বোনপোকে আমাদের কাছে দিয়ে গেছে। তার কাছে যেতে সঙ্কোচ কী? দেখবে, সে কোনও খারাপ ব্যবহার করবে না আমাদের সঙ্গে। এমনও তো হতে পারে যে খোকনের হয়তো মাসির কথা খুব মনে পড়েছে, তাই আর থাকতে পারেনি এখানে চলে এসেছে।

রিটা বললে, তা সে যদি বলে আসত তাহ'লে কি আমি তাকে আসতে দিতুম না? তাহ'লে কি আমি তাকে আসতে বারণ করতুম?

আমি বললাম, তুমি না-হয় সেই কথাটাই গিয়ে তাকে বোল।

রিটাকে নিয়ে আমি সেই কাদা-ভরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলুম। আগের বার যখন এসেছিলাম তখনও গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে-হাঁটতে এই রকম করেই গিয়েছিলাম। খানিকদূর যেতেই ময়রাডাঙার দু-একজন লোকের সঙ্গে দেখা হল। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা ভৈরব আড্ডি বলে কাউকে চেনো?

তাদের মধ্যে সবাই বললে, আজ্ঞে, ভৈরব আড্ডি তো মারা গেছে।

আমি বিস্ময়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেলাম। বললাম, মারা গেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো আজ ছ'মাসের ওপর হয়ে গেল। বেচারার কেউ ছিল না সংসারে, তাই আমরাই তাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে এসেছিলুম। বেচারার বড় দুঃখ-কষ্ট ছিল, কিন্তু বড় ভাল ছিল লোকটা, পরের উপকার করত খুব।

আমি বললাম, তাহ'লে তার যে মাসি ছিল, তাকে চেনো তোমরা?

—মাসি?

বললাম, হ্যাঁ, মাসি, তার একটা ছোট্ট বোনপো ছিল, তার নাম খোকন। তাদের বাড়িটা দেখিয়ে দিতে পারো?

তাদের মধ্যে একজনের মনে পড়ল যেন। বললে আজ্ঞে, সে বোনপোকে তো সে কলকাতায় তার এক বড়লোক আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই বোনপোকে তারা পুষ্যি নিয়েছিল। মেয়েটি ছিল বিধবা, পরের বাড়িতে কাজ করে পেট চালাত, নিজেরই তার চলত না। তারপর তো মাসি অন্য জায়গায় কাজ পেয়ে ময়রাডাঙা ছেড়ে চলে গিয়েছে। এখন সে বাবুদের বাড়িতেই খাওয়া-পরার কাজ পেয়েছে। সেখানেই থাকে।

আমি বললাম, তাহ'লে সে আর এখানে নেই?

তারা বললে, না—

তখন কী করবো বুঝতে পারলুম না।

রিটা বললে চল, এখানে আর থাকার দরকার নেই, চল ফিরে চল।

আমি আর কী বলব—আমার তখন কিছু আর বলবার নেই। আস্তে-আস্তে ফিরে এসে গাড়িতে বসলুম। মদনকে বললাম গাড়ি চালাতে। গাড়ি আবার চলতে লাগল কলকাতার দিকে।

ডাক্তার, আমার মনের অবস্থা তখন কল্পনা করতে পারো তুমি? তুমি হয়তো ভাবছ, এত সামান্য ব্যাপারে আমি এত মুষড়ে পড়ছি কেন? কিন্তু আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে এত মুষড়ে পড়ব না তো আর কিসে মুষড়ে পড়ব!

কলকাতায় ফিরে এলাম। ফাঁকা বাড়ি। অত বড় বাড়ি, লোক মাত্র আমরা তিনজন ছিলুম। মাত্র একজন নেই, কিন্তু তাতেই মনে হল সমস্ত বাড়িটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে।

তার পরের দিনই সকালবেলা আমার কাছে একটা টেলিফোন এল।

রিসিভার তুলতেই শুনি নরসিংহম।

নরসিংহম এত সকালে কেন টেলিফোন করছে, বুঝতে পারলুম না।

জিজ্ঞেস করলাম, কী খবর নরসিংহম? হঠাৎ টেলিফোন করছো কেন?

নরসিংহম বললে, আজকে আমি অফিস থেকে একটু ছুটি নিচ্ছি স্যার, আমি অফিসে যেতে পারব না আজ, খুব একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি আজকে।

—কী ঝামেলা ? তোমার আবার কী ঝামেলা হলো ?

নরসিংহম বললে, আমার একটি ছেলে হয়েছে, কাল রাত্রে নার্সিংহোম থেকে খবর এসেছে। আমি এক্ষুনি সেখানে যাচ্ছি।

—সেখানে কতক্ষণ দেরি হবে ?

তা জানি না, তাই আপনাকে খবর দিলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, পেসেন্ট কেমন আছে ?

নরসিংহম বললে, শুনছি নাকি অপারেশন করতে হয়েছে, এখনও স্ত্রীর জ্ঞান হয়নি।

বললাম, তাহ'লে তুমি চলে যাও, আমি একটা দিনের জন্যে অফিস যাব।

এর বেশি আর বললাম না।

রিসিভার রাখবার আগে শুধু বললাম, তুমি আমাকে একবার টেলিফোন করে জানিয়ে দিও তোমার স্ত্রী কেমন আছে।

নরসিংহম বললে, ঠিক আছে স্যার।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বাড়িতে তাহ'লে কে থাকবে ? তুমি যাচ্ছ কোথায় ? যদি অসুবিধে হয় তো আমাকে বলো।

নরসিংহম বললে, না স্যার, আমার কোনও অসুবিধে হবে না।

নরসিংহম বললে, না স্যার, আমি একটা রান্না করার লোক পেয়েছি। সে-ই আজ একমাস ধরে রান্না করছে আমার বাড়িতে। লোকটা খুব বিশ্বাসী।

বললাম, ঠিক আছে। অসুবিধে হলেই আমাকে বলবে তুমি। অফিসের কথা ভেবো না। আগে তোমার ফ্যামিলি তারপরে অফিস, বুঝলে ? জীবনে টাকা হয়তো অনেক উপায় করতে পারবে, কিন্তু স্ত্রীর দিকে যদি মনযোগ না দাও, তবে সারাজীবন তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। আমি ছাড়ছি এখন, আমি লাইন ছেড়ে দিলাম।

তারপর অফিসে যাবার জন্যে আমি তৈরি হতে লাগলুম। নরসিংহম-এর সন্তান হলো আর আমার সন্তান চলে গেল। অথচ আমি তার মনিব আর সে আমার কর্মচারী। আমি মনিব হয়েও একদিক থেকে তার চেয়ে ছোট হয়ে গেলাম।

কিন্তু মুখে আমি এসব কিছুই বললাম না নরসিংহমকে। পরের কাছে নিজের ছোটত্ব জাহির করতে কেমন যেন লজ্জা হলো। অর্থে যে বড় হয়

সে-যে সামর্থ্যেও বড় হবে, তার কোনও নিয়ম নেই। সেই লজ্জা নিয়েই আমরা সবাই গেলাম ডাক্তার। আর এই লজ্জার জন্যেই আমাদের সকলের এক যন্ত্রণা।

সেদিন সেই মন নিয়েই আমি অফিসে গেলাম। নরসিংহম নেই, অফিসের কাজ-কর্মের দিকটায় ঢিলে দিয়েছিল সবাই। আমাকে দেখে সবাই যেন একটু তটস্থ হলো। কাজকর্মের চাপের মধ্যেও খোকনের জন্যে মনের মধ্যে কেমন যেন একটা কাঁটা বিঁধতে লাগল। বাড়িতে রিটা আছে, তার কথাও মনে পড়তে লাগল। বইতে পড়েছি মনটা যখন চঞ্চল হয়ে উঠবে, তখন দাঁত দিয়ে জিভটা জোরে কামড়াবে। জিভ দিয়ে রক্ত পড়লেও ক্ষতি নেই। শরীরে যত কষ্ট হবে, মন তত শান্ত হবে। কোন্ বইতে এটা পড়েছি তা মনে নেই। কিন্তু প্রক্রিয়াটা করে যেতে লাগলুম বার-বার। মনটা খানিক পরেই একটু শান্ত হয়ে এল। অনেকক্ষণ পরে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলাম। অফিস থেকে বাড়ি যাবার সময় হয়েছে হঠাৎ তখন পার্ক স্ট্রীট থানা থেকে একটা টেলিফোন পেলাম। বললাম, কে ?

ওদিক থেকে আওয়াজ এল—আমি পার্ক স্ট্রীটের ও-সি বলছি স্যার। আপনার বাড়িতে টেলিফোন করেছিলুম, সেখান থেকে শুনলুম আপনি অফিসে আছেন। তাই অফিসে টেলিফোন করছি। আপনি একবার এখুনি থানায় চলে আসুন স্যার, আপনার ছেলেকে পাওয়া গেছে।

আমি আর না দাঁড়িয়ে সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি নিয়ে পৌঁছলাম থানায়।

যেতেই ও-সি উঠে দাঁড়াল। বললে, আসুন স্যার, আসুন—আপনার ছেলেকে এই পাশের ঘরেই রেখে দিয়েছি।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখি, যা ভেবেছি তাই। খোকনই বটে, সেই স্কুলের ইউনিফর্ম পরা, কিন্তু চেহারা একেবারে শুকিয়ে চিম্‌সে হয়ে গেছে। চোখ বসে গেছে। আমি ডাকলাম—খোকন, তুমি কোথায় গিয়েছিলে বাবা ?

খোকন মুখ নীচু করে বসেছিল। আমার দিকে মুখ তুলে চাইলেও আমার দিকে ভালো করে মুখ তুলে চাইতে তার সাহস হচ্ছিল না।

ও-সি আমাকে জিজ্ঞেস করলে, এই-ই তো আপনার ছেলে স্যার।

বললাম, হ্যাঁ, এই-ই আমার ছেলে। এর ভাল নাম দেবব্রত, ডাক-নাম খোকন। এখন আমি একে বাড়ি নিয়ে যেতে পারি ?

ও-সি বললে, নিশ্চয়ই নিয়ে যেতে পারেন। তবে কেসের দিন স্যার ওকে নিয়ে আপনাকে একবার কোর্টে হাজির করতে হবে।

আমি বললাম, তাহ'লে আমি আপনার এখান থেকে বাড়িতে একটা টেলিফোন করতে পারি ? আমি মিসেসকে একবার খবরটা দিতে চাই।

—নিশ্চয়-নিশ্চয়, এই তো টেলিফোন রয়েছে পাশের ঘরে।

আমি সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িতে রিটাকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলাম যে, খোকনকে খুঁজে পাওয়া গেছে, আর যদি সে আসতে চায় তো পার্ক স্ট্রীট থানায় চলে আসুক।

বলবার সঙ্গে-সঙ্গে রিটা যেমন অবস্থায় ছিল, তেমনি অবস্থায় থানায় চলে এল। এসেই জিজ্ঞেস করলে—কোথায় খোকন ? কোথায় সে ?

ও-সি ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে খোকনকে দেখালে।

—ওই দেখুন, ও-ই আপনার ছেলে তো ?

রিটা সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে খোকনকে জড়িয়ে ধরলে। বললে—তুমি আমাদের না বলে-কয়ে কোথায় গিয়েছিলে খোকন ? আমরা কত খুঁজেছি তোমাকে।

খোকন কিন্তু তখনও তেমনি মুখ নীচু করে বসে আছে। সে রিটার দিকে একবার চেয়েও দেখলে না।

রিটা জিজ্ঞেস করলে, তুমি কোথায় গিয়েছিলে খোকন, বল ? তুমি আমাদের একেবারে ভুলে গিয়েছিলে ? মদন গাড়ি নিয়ে তোমাকে কত খুঁজলে, তোমাকে কোথাও না পেয়ে শেষকালে খালি গাড়ি নিয়ে সে ফিরে এল। একবার আমাদের কথা তোমার মনেও পড়ল না ? আমরা কী দোষ করেছি তোমার কাছে ?

আমি ও-সিকে জিজ্ঞেস করলাম, ওকে শেষে পেলেন কোথায় ?

ও-সি বললে, নেবুবাগান বস্তিতে।

—নেবুবাগানের বস্তিতে ? বললাম, সে-তো আমার বাড়ির পেছনেই !

ও-সি বললে, হ্যাঁ স্যার, সেখানেই ওকে পাওয়া গেল।

আমি তো আরো অবাক। কেউ যদি পালায় তো সাধারণতঃ সে অনেক দূরে চলে যাবে, কেউ যাতে খুঁজে না পায়। কিন্তু বাড়ির পেছনেই লুকিয়ে থাকবার মানে ?

ও-সি বললে, একটা বদমাইশ ছেলের পাল্লায় পড়েছিল। সে-ই ওকে ভুলিয়ে-ভুলিয়ে ওখানে রেখে দিয়েছিল।

বললাম, তার উদ্দেশ্য কী ?

ও-সি বললে, এই পাশের ঘরটাতে আসুন, তাকেও ওখানে আটকে রেখে দিয়েছি। সে ভাঙবে, তবু মচ্‌কাবে না। অনেক জেরা করেছি, কিন্তু কিছুতেই তার মুখ থেকে কোনও কথা বার করতে পারিনি।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখলাম ছেলেটাকে। ছেলেটাকে দেখেই বোঝা যায় একটা বাচ্চা পকেটমার কিম্বা গুণ্ডা। ছেলেটাকে বোধহয় পুলিস খুবই

মেরেছে। তার শরীরে জখমের দাগ রয়েছে।

ও-সি বললে, এই ছেলেটার সঙ্গে আপনার ছেলে বস্তির সামনে একটা জলের কলের সামনে খেলা করছিল। আমার কনস্টেবল দেখতে পেয়েই সঙ্গে-সঙ্গে ওকে এ্যারেস্ট করে নিয়ে চলে এসেছে। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে এই ছেলেটাই আপনার ছেলেকে লোভ দেখিয়ে ওখানের বস্তিতে নিয়ে গেছে।

আমি তাকে বললাম, এই, তুই ওকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলি কেন ?

ছেলেটা ভয়ে-ভয়ে মুখ তুলল। প্রশ্নটা আবার করলাম। বললাম, কেন ওকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলি ?

ছেলেটা ভয়ে-ভয়ে বললে, আমি ওকে চুরি করে নিয়ে যাইনি হুজুর। ও-ই ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে চলে গিয়েছিল।

ও-সি জিজ্ঞেস করলে, বস্তিতে তোর আর কে আছে ?

ছেলেটা বললে, আমার কেউ নেই হুজুর। আমি ওর স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় ও আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি মাণিককে চিনি কিনা।

আমি বললাম, মাণিক ? ও মাণিকের নাম করেছিল তোর কাছে ?

ছেলেটা বললে, হ্যাঁ হুজুর, আমি ওকে বলেছিলুম যে মাণিককে আমি চিনি। বলেছিলাম, আমি তোমাকে মাণিকের কাছে নিয়ে যেতে পারি—তাই আমার সঙ্গে ও নেবুবাগান বস্তিতে গিয়েছিল।

এ-সব কথা পুলিসের জেরার উত্তরে ছেলেটা আগেও বলেছিল। কিন্তু পুলিস তখন তা বিশ্বাস করেনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের বস্তিতে মাণিক থাকে ?

ছেলেটা বললে, হ্যাঁ স্যার।

জিজ্ঞেস করলাম, সে কী কাজ করে ? চাকরি ?

ছেলেটা বললে, সে কিছু করে না।

বললাম, কিছু না করলে তার পেট চলে কী করে ?

—ভিক্ষে করে—আর কিছু কাজ জোটেনি তার। আমরা কেউই কোনও কাজ জোটাতে পারিনি।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তা মাণিকের কাছে তুমি খোকনকে নিয়ে গেলে ?

ছেলেটা বললে, হ্যাঁ স্যার।

—তারপর ?

ছেলেটা বলল, কিন্তু এ-মাণিক নয় স্যার, আমাদের মাণিক, আলাদা মাণিক, খোকনদের দেশের মাণিক আলাদা লোক। তাকেই খুঁজছিল।

ও-সি ভদ্রলোক এ-সব কথা আগেই শুনেছিলেন। বললেন, আপনারা খোকনকে বাড়ি নিয়ে যান স্যার, আপনাদের ছেলেকে যে শেষ-পর্যন্ত উদ্ধার করতে পেরেছি, এই যথেষ্ট। ও ব্যাটাকে আমি কালকেই চালান করে দিচ্ছি।

খোকন আমাদের সঙ্গেই আবার বাড়ি এল।

* * *

তুমি আমার গল্প শুনে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাচ্ছ ডাক্তার। চারিদিকে আজকাল যখন সবাই গরীব মানুষদের দুর্দশার কথাই বলছে, সাধারণ মানুষের কথা নিয়ে ভাবছে, চাল-ডাল-মাছ-তেলের দাম নিয়ে বিব্রত, তখন আমার মত বড়লোকের এই সামান্য সমস্যার কথা কেন তোমাকে বলছি, তা শুনতে নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে তোমার।

কিন্তু জানো তো, নিয়তি বড়লোক-গরীবলোক কাউকেই খাতির করে না। সুতরাং আমার সমস্যাও তো একটা সমস্যা! আমার এ-সমস্যাও যে কী সিরিয়াস সমস্যা, তা পরে তুমি বুঝতে পারবে। লোকে জানে যে টাকা না-থাকার কী যন্ত্রণা, আমিও সেটা জানি। আমি নিজে এককালে টাকা না-থাকার যন্ত্রণায় দিনের পর দিন ভুগেছি। কিন্তু টাকা না থাকার চেয়ে টাকা থাকার যন্ত্রণা যে কী নিদারুণ, তা এখন বুঝেছি। দরকারের বেশি টাকা থাকাটাই একটা উৎপাত। নইলে অমন স্ত্রীই বা আমার হবে কেন, আর নিজের ছেলে না-হওয়ার দুঃখে পরের ছেলেকে নিজের বাড়িতে আনবার দরকারই বা কেন হবে?

আমি ভেবে দেখেছি জীবনে কিছু না-পাওয়ার বিড়ম্বনার চেয়ে প্রয়োজনের বেশি পাওয়ার বিড়ম্বনা অনেক বেশি। নইলে আমার তো কোনও দুর্ভাবনাই ছিল না! আর যাও দুর্ভাবনা ছিল, তা পেলেই মিটে যেত। উপোষ করার দুঃখটা কিছু খেতে পেলেই মানুষের মিটে যায়। কিন্তু যে-চাওয়া কোনও কিছুতেই মেটে না, সেই চাওয়া যদি কেউ চায়, তখন? আমারও তখন সেই অবস্থা। পরের ছেলেকে নিজের করার আকাঙ্ক্ষা কি কারো মেটে? সেই অভাব কখনও টাকা দিয়ে মেটানো যায়?

আমি তো খোকনের সব দুঃখ মেটাতে চেয়েছিলাম টাকা দিয়ে। তার শার্ট-প্যান্ট, তার জুতো, তার খেলনা, তার গাড়ি, তার চাকর, আয়া, তাকে লেখাপড়া শেখানো, কোনও কিছুরই তো কার্পণ্য করিনি আমি! এই কলকাতা শহরের ক'টা ছেলে অত শার্ট, অত জুতো, অত খাওয়া খেতে পায়? কিন্তু কেন সে তার কোন এক মাণিককে খুঁজে বেড়ায়, কে সে মাণিক, কী তার আকর্ষণ—আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

সেই রাত্রেই খোকনের জ্বর হল। আর তাই থেকেই একেবারে টাইফয়েড।

ডাক্তার এলেন। তিন দিনের দিন ধরা পড়ল যে জ্বরটা টাইফয়েডে পরিণত হয়েছে। ওষুধ পড়ল, চিকিৎসাও চলতে লাগল ডাক্তারের ইচ্ছে অনুযায়ী। শেষকালে ডিলিরিয়াম হতে লাগল, প্রলাপ বকতে লাগল।

আমি রিটা আর বাড়িতে যত স্টাফ ছিল, সবাই মিলে তখন খোকনকে সেবা করে চলেছি। কেউ মাথায় আইস্‌ব্যাগ, কেউ স্পঞ্জ করে দেয়, কেউ যায় ওষুধের দোকানে। কয়েক সপ্তাহ ধরে বাড়িতে কেউ আর রাত্রে ঘুমোল না। রিটা, যে মেয়ে মাথায় চুল বব্ করে ক্লাবে গিয়ে ড্রিংক করে, সে-ও আর থাকতে না পেরে সোজা কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে ছেলের নামে পাঁচশো এক টাকার পুজো দিয়ে এল।

খোকন মাঝে-মাঝে হঠাৎ ঘুমের ঘোরে চোখ খোলে। চোখ খুলে কাকে বলে, আমাকে পিয়ানো দাও।

ডাক্তার তখন জ্বর দেখছিল। বললে, ও পিয়ানো চাইছে কেন?

আমি পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। বললাম, জ্বরের ঘোরে মাঝে-মাঝে ওই রকম আবোল-তাবোল বকে।

ডাক্তার বললে, তা পিয়ানো কিনে দেন না কেন? ও যা চাইবে তাই-ই দেবেন।

আমি বললাম, তাই-ই তো কিনে দিই। সেদিন 'মা-মা' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, রিটা কালীঘাটের মন্দিরে পুজো দিয়ে এসে প্রসাদী ফুল ওর মাথায় ছুঁইয়ে দিয়েছিল। ওই আলমারিটার ভেতরে চেয়ে দেখুন, যত খেলনা ওখানে রয়েছে, সব ওর জন্যে কেনা হয়েছে। ওই দেখুন একটা ভায়োলিন, ভেবেছিলুম ভায়োলিন দেখলে ও শান্ত হবে। কিন্তু ও ভায়োলিনটা নিলে না, ছুঁড়ে ফেলে দিলে। কেবল ওর পিয়ানো চাই—

ডাক্তার বললে, তা পিয়ানোই না হয় একটা কিনে দিলেন, আপনার মত লোকের একটা পিয়ানো কিনতে আর কিসের অসুবিধে?

এই কথা শুনে একদিন খোকনকে খুব বড় দেখে একটা পিয়ানোই কিনে দিলাম। ওকে শোনাবার জন্যে আনাড়ী হাতে টুং-টুং করে একটু বাজালুমও পিয়ানোটা। কিন্তু সেদিকে একবার চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলে।

বললে, ও পিয়ানো আমি নেব না।

খোকনের জন্যে হাজার-হাজার টাকা খরচ করেও ওর মুখে আমি হাসি ফোটাতে পারলাম না। কিন্তু শেষকালে একদিন একটা কাণ্ড ঘটল। আমি সেদিন ঘণ্টা খানেকের জন্যে একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরেছি বিকেল তিনটের সময়। সঙ্গে-সঙ্গে খোকনের ঘরে ঢুকেছি। ঢুকে দেখি খোকনের মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠেছে।

দেখে খুব আনন্দ হল আমার। পাশে রিটা দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম—আজকে খোকনের জ্বরটা ছেড়েছে বুঝি ?

রিটা বললে দেখ, ওর পিয়ানোটা দেখ—

পিয়ানো ! আমি বললাম, কই পিয়ানো ?

চেয়ে দেখি একটা সোনার সিগারেট কেস। আমার যেন মনে হল ওটা আমার চেনা-চেনা। ওটা যেন আমি আগে ব্যবহার করতুম। কিন্তু ঠিক স্পষ্ট করে ধরতে বা চিনতে পারলুম না।

রিটা বললে, এই দেখ, ওপরে কার নাম এনগ্রেভ করা রয়েছে—বি. এইচ. গ্রীয়ারসন।

আমিও দেখলুম সিগারেট-কেসটার ভেতর দিকে স্পষ্ট অক্ষরে খোদাই করা আমার সেই সাহেবের নাম। খাঁটি বিলিতি জিনিস। শেফিল্‌ডে তৈরি। এ জিনিস এতদিন পরে খোকনের কাছে কেমন করে এল ? কে তাকে আজ দিয়ে গেল ?

রিটাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ কে দিয়ে গেল ?

রিটা বললে, তা-তো জানি না। আমি আয়াকে এ-ঘরে রেখে বাথরুমে চান করতে গিয়েছিলুম। চান সেরে ড্রেস করে এসে দেখলুম ওর হাতে এইটে রয়েছে। খোকনের মুখের চেহারাও কেমন কেমন ভাল হয়ে গিয়েছে এইটে পেয়ে। হাসছিল খুব আর এইটে দেখালে আমাকে। বললে, এইটে আমার পিয়ানো।

সিগারেট-কেসটা বিচিত্র। ঢাকনাটা খুলতে গেলে বোতাম টিপতে হয়। আর ঢাকনাটা খোলার সময় বোতাম টিপলেই পিয়ানোর মতন টুং-টাং করে মিষ্টি একটা বাজনা বেজে ওঠে।

গ্রীয়ারসন সাহেব যখন ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে যায়, তখন ফেয়ারওয়েলের পর আমাকে তার ওই সিগারেট-কেসটা দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—সেন, এইটে তোমাকে দিলুম, হিয়ার ইজ্ মাই মোস্ট ভ্যালুয়েবল্ প্রেজেন্ট টু ইউ, তোমাকে এইটেই আমার সবচেয়ে দামী উপহার, টেক ইট্।

মনে আছে, সাহেবের সেই অকৃত্রিম ভালবাসার প্রমাণ পেয়ে সেদিন আমি আমার চোখের জল আর রুখতে পারিনি। একজন বিদেশী সাহেব কিনা আমাকে এতখানি ভালবাসা দিলে ! কোম্পানী তো দিয়ে গেলই, তার ওপর আবার এই এত দামী উপহার।

গ্রীয়ারসন সাহেব আমার চোখের জল দেখে বোধহয় আমার মনোভাবটা বুঝতে পেরেছিল। বললে, ডোণ্ট ক্রাই সেন। কেঁদো না সেন, ইউ রিজার্ভ ইট্। তুমি একদিন গুণ্ডাদের হাত থেকে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, ক্যান

আই ফরগেট্‌ দ্যাট্‌? আমি কি তা ভুলতে পারি?

রিটার কথায় আমার ভাবনার ছেদ পড়ল।

সে জিজ্ঞেস করলে, এ কার নাম লেখা? কোথা থেকে এল এটা?

বললাম, আমিও তাই ভাবছি, এ কোথা থেকে কে খোকনকে দিলে?

খোকন শুয়ে-শুয়ে বললে, এইটে আমার পিয়ানো।

আমি আয়াকে ডাকলুম। আয়া আসতেই জিজ্ঞেস করলুম, আয়া এ সিগারেট-কেসটা কে দিলে খোকনবাবুকে?

আয়া বললে, আমি তো জানি না, দরোয়ান এসে আমাকে দিলে এটা।

দারোয়ানকেও ডাকা হল। মধুকে বললাম, বীর সিংকে ডাক তো একবার।

বীর সিং এসে সেলাম করে দাঁড়াল। বললে, হুজুর—

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বীর সিং, এ সিগারেট-কেসটা কে তোমাকে দিলে? কে সে? তার নাম কী?

বীর সিং ভয় পেয়ে গেল কথার জবাব দিতে গিয়ে।

ধমক দিয়ে বললাম, বলো কে দিলে ওটা তোমাকে?

বীর সিং বললে, আমি হুজুর, চিনি না তাকে।

—কী বললে সে তোমাকে?

বীর সিং বললে, সে বললে বাড়ির ভেতর গিয়ে খোকনবাবুকে দিতে।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

বীর সিং বললে, তারপর আমি ভেতরে এসে আয়াকে জিনিসটা দিলুম।

—আর সেই লোকটা?

বীর সিং বললে, উ আদমী চলা গয়া।

আমি কিছু বুঝতে পারলুম না কে এসে দিয়ে গেল জিনিসটা। কতকাল আগের ঘটনা সেটা। সেই গ্রীয়ারসন সাহেবের দেওয়া সিগারেট-কেসটা আজ এতদিন পরে আবার আমার কাছে কী অলৌকিক ভাবে ফিরে এল। এও এক অবাক কাণ্ড!

খোকন বিছানার ওপর তেমনি করেই শুয়েছিল। বললে, আমার পিয়ানো দাও—দাও আমার পিয়ানোটা।

সিগারেট-কেসটা দিলাম খোকনকে। খোকন সেটা নিয়ে একবার খুলতে লাগল, আবার বন্ধ করতে লাগল! আর পিয়ানোর মত মিষ্টি টুং-টাং শব্দ হতে লাগল।

আমি তার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম বটে, কিন্তু আমার মন আট-দশ বছর আগেকার কোন এক যুগে পৌঁছে গিয়ে আমাকে অন্যমনস্ক করে দিলে।

আমার মন বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব কিছু অস্বীকার করে সুদূর অতীতে উধাও হয়ে গেল।

আমার পাশে যে রিটা দাঁড়িয়েছিল, সে খেয়াল আমার ছিল না তখন। হঠাৎ তার কথায় আমার যেন জ্ঞান ফিরে এল। এতদিন পরে এটা কে ফিরিয়ে দিয়ে গেল আমাকে? বলতে গেলে আমি এই সিগারেট কেসটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

হঠাৎ পাশ থেকে রিটা বললে, মিস্টার গ্রীয়ারসনের সিগারেট কেসটা এখানে এল কী করে?

আমি মিথ্যে কথা বললাম। বললাম, কী জানি!

রিটা আমাকে সন্দেহ করতে লাগল। বললে, তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমার কাছে বলছ না। নিশ্চয়ই তুমি জানো। বল এটা কোত্থেকে এতদিন পরে আমাদের বাড়িতে এল?

বললাম, বিশ্বাস কর রিটা, আমি বলছি জানি না। জানি না বলেই তো আমি বীর সিংকে ডেকে এত কথা জিজ্ঞেস করলাম।

রিটা বললে, গ্রীয়ারসন কি দেশে ফিরে যাবার সময় এটা তোমাকে দিয়ে গিয়েছিল?

আমি বুঝতে পারলুম না রিটাকে এ-কথার কী উত্তর দেব।

একটু ভেবে বললাম, না।

রিটা রেগে উঠল। বললে, না মানে? তুমি আমার কাছে সমস্ত লুকোচ্ছো।

বললাম, তোমার কাছে লুকোব কেন? তোমার কাছে লুকিয়ে আমার লাভ কী? যদি মিস্টার গ্রীয়ারসন এটা আমাকে দিয়ে যেত তো ভাবছ, আমি তোমাকে বলতুম না?

বললাম, হয়তো সিগারেট-কেসটা কেসটা কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।

রিটা বললে, চুরি করে নিয়ে গেলে এখন আবার এটা তোমার কাছে ফিরে এল কেন? যারা চুরি করে, তারা কি ফেরত দেয়? আসলে তুমি বলছ না আমাকে। বলো, এ সিগারেট-কেসটা কোত্থেকে এল?

আমি বললাম, কেন তুমি চেঁচাচ্ছ অমন করে? তুমি যদি আমাকে বিশ্বাসই না করবে তো তাহ'লে কেন আমাকে বিয়ে করেছিলে?

রিটা বললে, কী বললে? আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম?

আমারও বুঝি তখন ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। আমিও তখন চীৎকার করে বলে ওঠলাম, তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে না তো কি আমি তোমাকে

বিয়ে করতে সেধেছিলাম ?

রিটাও গলা চড়িয়ে দিলে। বললে, ইডিয়ট, লায়ার কোথাকার! আমি কি তোমাকে বিয়ে করবার জন্যে তোমার পায়ে ধরে সেধেছি ?

আমিও গলাটা আরো চড়িয়ে বললাম, স্টপ্ ইট্। থামো!

—কেন থামব ? আমি কেন থামতে যাব ? আমি কি তোমার খাই ? আমি কি তোমার টাকার পরোয়া করি ? আমার বাবার টাকায় আমি খাই। ভুলে যেও না, আমার বাবা কর্নেল চ্যাটার্জী, তিনিও তোমার চেয়ে কম বড়লোক ছিলেন না। তাঁর সব টাকা এখন আমার। সেই সব টাকার মালিক এখন আমি। তুমি জানো আমি তোমার গ্রীয়ারসন কোম্পানী কিনে নিতে পারি ?

আমি বলে উঠলাম, কী পাগলের মত সব যা-তা বকছ ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল ?

রিটা বলে উঠল, মাথা খারাপ আমার হয়েছে না তোমার ? তুমিই তো পাগলের মত যা-তা বকছ ? যাও, তোমার আমি মুখ দেখতে চাই না। বলে রিটা তার নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

আমি যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খানিকক্ষণ পাথরের মত সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমি যে কী করব, তা আমি বুঝতে পারলুম না। আমার ঘরের ভেতর তখন বীর সিং, আয়া, চাকর-বাকর-ঝি সবাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল। রাগের মাথায় তাদের সামনে এ আমি কী করে বসলুম। আমারও কি তাহ'লে এতক্ষণ মতিভ্রম হয়েছিল ?

খোকনের দিকে চেয়ে দেখলাম। তার তখন কোনও দিকে মন নেই। তখন সে একমাত্র সিগারেট-কেসটা নিয়ে তার ডালাটা একবার খুলছে, আর একবার বন্ধ করছে। আমি সেই ফাঁকে আর সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা রিটার ঘরের দিকে চলে গেলাম। দেখি রিটার ঘরটা ভেতর থেকে খিল বন্ধ।

দরজা ঠেলে ডাকলাম, রিটা, রিটা, দরজা খোল।

ভেতর থেকে কেউ জবাব দিলে না।

আমি আবার দরজা ঠেলতে লাগলাম।

আবার ডাকলাম, রিটা, আমার দোষ হয়ে গেছে, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, দরজা খোল। কিন্তু তবু ভেতর থেকে কোনও জবাব নেই।

তখন আমার ভয় করতে লাগল। এত গলা চড়িয়ে রিটাকে বকাবকি করা উচিত হয়নি আমার। যদি আবার রিটার সেই রোগটা ফিরে আসে ? ডাক্তার তো বার-বার বারণ করে দিয়েছিল তার সঙ্গে ঝগড়া না করতে। বলে দিয়েছিল যে স্ত্রী যতই বিব্রত করুক আপনাকে, আপনি কিছুই

বলবেন না, সব মাথা নীচু করে মেনে নেবেন।

কিন্তু এ আমি কী করলাম! রাগের মাথায় এ কী কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল! আবার জোরে-জোরে ডাকলুম, রিটা-রিটা, আমি দরজা খোল, তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

আর সঙ্গে-সঙ্গে জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম। চারিদিক থেকে আমার বাড়ির চাকর-ঝি সবাই দৌড়ে এসে আর এক মজা দেখতে লাগল। কিন্তু আমার তখন কোনও দিকে নজর নেই। তারা হয়তো আমার ব্যাপার দেখে মনে-মনে হাসছে, ভাবছে, আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছে। এ-লজ্জা যে কী লজ্জা, আমি তোমাকে কী বলে বোঝাব, বুঝতে পারছি না ডাক্তার। আমি তাদের মনিব, আমিই তাদের মালিক, অথচ আমরাই হাসির খোরাক।

শেষকালে যখন রিটা দরজা খুলল, তখন রিটার চেহারা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আগের দিন সারা রাত খোকনকে নিয়ে জেগে কাটিয়েছে, তার ওপর আমার সঙ্গে চেঁচামেচি ঝগড়া। দেখলাম, মাথার বব্‌করা চুল এলোমেলো, কান্নায় চোখ দু'টো লাল হয়ে গেছে। আমি ভেতরে ঢুকে পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর, তোমার সামনে বলতে আজ আমার লজ্জা নেই, স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে আমি ক্ষমা চাইলাম।

হঠাৎ বাইরে থেকে সেই সময় আমার আয়া দরজা ঠেলতে লাগল। বললে, হুজুর, থানা থেকে পুলিস সাহেব আপনাকে টেলিফোন করছে।

পুলিসের নাম শুনেই আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে ফোন ধরলাম।

ওপাশ থেকে গলার আওয়াজ এল, স্যার, কালকে সেই ছেলেটাকে কোর্টে হাজির করছি, আর একটা খবর আছে।

কী খবর?

ও-সি বললে, একটা মেয়েমানুষের নামও বলে দিয়েছে সে। সে-ই হচ্ছে আড়কাঠি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাই নাকি?

ও-সি বললে, হ্যাঁ স্যার, আজকাল কলকাতা শহরে এই রকম হচ্ছে খুব। ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের ধরে কিড্‌ন্যাপ করে যাচ্ছে মেয়েমানুষ দিয়ে। কি-সব ওষুধ খাইয়ে দিয়ে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কোর্টে হাজির হতে হবে নাকি কাল?

ও-সি বললে, না স্যার, আপনাকে না হাজির হলেও চলবে? আপনার ছেলে কেমন আছে?

আমি বললাম, ভাল। কিন্তু আর একটা কাণ্ড হয়েছে এদিকে। কে

একজন অচেনা লোক এসে আমার বাড়িতে একটা সিগারেট-কেস দিয়ে গেছে আমার খোকনকে।

—সে কী? সিগারেট-কেস আপনার ছেলেকে দিয়ে গেছে কেন?

আমি বললাম, তা জানি না আমি।

—কী রকম সিগারেট-কেস?

আমি বললাম, একটা সোনার সিগারেট-কেস। খুব দামী জিনিস। বিলিতি জিনিস। তাতে একজন সাহেবের নাম লেখা।

ও-সি বললে, আশ্চর্য তো! আচ্ছা ঠিক আছে। ওটাও আমার ইন্‌ভেসটিগেশনের পক্ষে কাজে লাগবে।

এর পর আমরা টেলিফোন ছেড়ে দিলাম।

কিন্তু ডাক্তার, জীবনে এত রকমের ধাক্কা আমি খেয়েছি যে ধাক্কাকে আর ভয় করি না। তাই তখনও বুঝতে পারিনি যে আমার জন্যে কী ধাক্কা অপেক্ষা করছে।

আমি সেদিন কোর্টে যাই নি। কারণ আমার তেমন সময় ছিল না।

একদিকে আমার অফিস আর অন্যদিকে আমার বাড়ি। অফিসটাও যত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, বাড়িটাও তেমনি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ রিটাকে আমি সারাক্ষণ চোখে-চোখে রাখি, আবার খোকনকেও তাই। কারণ আবার হয়তো কোনদিন সিগারেট-কেসটার মত অন্য কোনও জিনিস কেউ দিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, যদি কেউ কোনও দিন আমার খোকনকে কিছু খাইয়ে দিয়ে যায়। তার ওপর নরসিংহম-এর বাড়িতেও তখন খুব ঝামেলা চলছে।

অনেক বিপদ চলছে তার স্ত্রীকে নিয়ে। তার স্ত্রীর ডেলিভারির জন্যে অপারেশন করার পর তখন যমে-মানুষে টানাটানি। সে-ও পুরোপুরি অফিসের দিকে মন দিতে পারছে না। ভাগ্যিস একটা ভাল বিশ্বাসী লোক পেয়েছিলাম, তাই বাঁচোয়া।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলায় সে আমাকে টেলিফোন করলে।

সে বললে, স্যার আমি নরসিংহম বলছি।

বললাম, বলো কী খবর?

নরসিংহম বললে, স্যার, আমার স্ত্রীকে আমি বাড়ি নিয়ে এসেছি।

জিজ্ঞেস করলাম তোমার বেবি কেমন আছে?

নরসিংহম বললে, দু'জনেই বেশ ভাল। কিন্তু আজ সকালে একটা খুব বড় বিপদ হয়ে গেছে।

আমি চমকে উঠলাম। বললাম, বিপদ? আবার কী হল তোমার?

নরসিংহম বললে, আমি আপনাকে যে বলেছিলাম একজন খুব বিশ্বাসী

লোক পেয়েছিলাম।

বললাম, হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার মনে আছে। তার কী হল? তার কী অসুখ করল নাকি?

নরসিংহম বললে, না স্যার, তার অসুখ-টসুখ কিছু হয়নি। তাকে আজ পুলিস এ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।

আমি চমকে উঠলাম! বললাম, তাকে এ্যারেস্ট করলে কেন পুলিস? সে কী করেছিল? চুরি করেছিল? অচেনা লোক না জেনেশুনে তুমি রেখেছিলে। চুরি তো করবেই তোমার।

নরসিংহম বললে, না স্যার। আপনাকে তো বলেছিলাম সে খুবই বিশ্বাসী লোক। বড় চমৎকার কাজ করছিল সে এ ক'দিন। ব্যবহারও খুব ভাল তার। রান্নাও করত ভাল। তার বিরুদ্ধে আমার কোনও কমপ্লেন ছিল না।

—তাহ'লে। হঠাৎ পুলিস এ্যারেস্ট করল কেন?

নরসিংহম বললে, তা ঠিক জানি না স্যার। আমি তখন বাড়ি ছিলাম না। বাড়িতে এসে শুনলাম, পুলিস এসে তাকে এ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন তাহ'লে কী করবে? তোমার অসুস্থ স্ত্রী-র সেবা-টেবা করা তো রয়েছে।

নরসিংহম বললে, না, সেজন্যে তো আমি দিন-রাতের জন্যে দু'জন নার্স রেখেছি—তারাই আমার স্ত্রীকে দেখা-শোনা করে।

বললাম, কিন্তু বাড়ির কাজ করবার জন্যে কি রান্নার জন্যেও তো একজন লোক চাই।

নরসিংহম বললে, একজন লোক সেজন্যে পেয়েছি স্যার। আমার একজন বন্ধু আছে বালিগঞ্জে, সেই বন্ধুই মেয়েলোকটিকে দিয়েছে।

—কেমন কাজ করছে?

নরসিংহম বললে, মনে হচ্ছে তো ভালোই এখন, পরে কী রকম হবে জানি না। তবে আগেকার লোকটা আরো ভাল ছিল। সে সমস্ত কাজ নিঃশব্দে করত। তাকে কিছু বলতে হতো না। সে নিজেই বাজার করত, নিজেই রান্না করত, নিজেই কাপড়-চোপড় কাচত।

বললাম, কিন্তু আগের মেয়েলোকটাকে পুলিস গ্রেফতারই বা করল কেন? সে কী করেছিল?

নরসিংহম বললে, তা-তো আমি জানি না স্যার। আমি তো বললাম আপনাকে তখন আমি বাড়ি ছিলাম না।

বললাম, অফিস যাচ্ছ তো আজ?

নরসিংহম বললে, হ্যাঁ স্যার যাচ্ছি, তবে যেতে একটু দেরী হতে পারে। নতুন লোক তো, তার ওপর প্রথম দিন, তাই তাকে সব কাজ একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দিতে হবে।

বললাম, দেশ থেকে তোমার বাবা-মাকে নিয়ে আসছ না কেন ?

নরসিংহম বল,ল, আমি টেলিগ্রাম করেছিলাম স্যার দেশে, সেখান থেকে উত্তর এসেছে বাবার অসুখ হয়েছে, তাঁর প্রায় আশির ওপর বয়েস, সেইজন্যে আমার মা-ও আসতে পারবে না। তাঁরা এলে আমার আর ভাবনা করবার কিছু ছিল না।

এরপর আমি আর কী করব ডাক্তার। যে সময়ে আমার বাড়িতে বিপদ ঠিক সেই সময়েই আমার ডেপুটির বাড়িতেও কিনা বিপদ চলছে!

সেদিন অফিসে পার্ক স্ট্রীট থানার ও-সি এসে হাজির। বললাম, আপনি ?

ও-সি বললে, আপনার বাড়িতে টেলিফোন করে জানতে পারলাম আপনি অফিসে, তাই অফিসে এলাম দেখা করতে।

বললাম, কেস্‌টার নতুন কিছু ডেভলপমেণ্ট হয়েছে ?

ও-সি বললে, হ্যাঁ স্যার আমি আসামীদের এগেনস্ট চার্জ ফ্রেম করেছি।

জিজ্ঞেস করলাম, সেই যে মেয়েমানুষটাকে ধরেছিলেন, সে এ কেসে কীভাকে জড়িত ?

ও-সি বললে, তাকে স্যার আমি অনেক জেরা করেছি, কিছুতেই মুখ খুলতে চাইছে না। অনেক রকম ভয় দেখাচ্ছি তাকে।

বললাম, কিন্তু আমার ছেলেকে চুরি করার পেছনে তার কী লাভ থাকতে পারে।

ও-সি বললে, সেইটেই তো আমি এখনও বুঝতে পারছি না স্যার, তবে আরো ইনভেষ্টিগেশন করছি, দেখি কী হয় ? ছেলেটাকে তো আমি আমার হাজতে বন্ধ করে রেখেছি, আর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জেরা করে চলেছি। ছেলেটা খুব ধড়িবাজ। অনেক কষ্টে ওই মেয়েমানুষটার সন্ধান পেয়েছি।

আমি বললাম, কী হয় আমাকে জানাবেন।

সারাদিন অফিসে কাজ করার পর আমি বাড়ি চলে এলাম। বাড়ীতে এসে দেখি রিটার মুখটা হাসি-হাসি। সে খোকনের কাছে বসে গল্প করছে। আর খোকন সেই পিয়ানোটা নিয়ে খেলা করছে। একবার সেটা সে খুলছে, আবার একবার সে বন্ধ করছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছ তুমি খোকন ?

রিটা জিজ্ঞেস করলে, কিছু জানতে পারলে তুমি ওটা কার সিগারেট-কেস ?

বললাম, না, পুলিশ কিছু জানে না। মনে হয় ওটা চোরাই জিনিস। হয়তো সাহেবের সিগারেট-কেসটা কেউ চুরি করেছিল।

রিটা বললে, তা এতদিন পরে সেই চুরি করা জিনিসটা আবার কোথা থেকে বেরোল? আর আমাদের বাড়িতেই বা ওটা কে দিয়ে গেল?

বললাম, সেই কথাটাই তো আমি পুলিসের ও-সিকে বললাম, এর পেছনে কী রহস্য লুকিয়ে আছে আপনারা খোঁজ নিন। মনে হচ্ছে দু' একদিনের মধ্যেই সব খবরটা পাওয়া যাবে।

রিটা এ-নিয়ে আর মাথা ঘামালে না। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলাম।

* * *

আশ্চর্য ব্যাপারই বটে ডাক্তার। সেই যে সেই সিগারেট-কেসটা নিয়ে খেলা করতে লাগল, সে-খেলার নেশা আর তার গেল না। আস্তে-আস্তে আবার যেন সে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল।

সেদিন পার্ক স্ট্রীট থানার ও-সি আমাকে টেলিফোন করলে—স্যার, আজকে একবার কোর্টে আসতে হবে আপনাকে।

বললাম, কেন?

—আজকে দিন পড়েছে আপনার মামলাটার। আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে কোর্টে আসবেন। আপনার ছেলে তো এখন একটু ভাল হয়েছে! বেশিক্ষণ আপনাকে কষ্ট দেব না। আধ ঘণ্টার বেশি লাগবে না আপনার, কারণ আপনার ছেলেকে একবার দেখতে চাইবে ট্রাইং ম্যাজিস্ট্রেট।

বললাম, ঠিক আছে।

সেদিন আর অফিসে গেলাম না। যখন কোর্টে যেতে হবে, তখন অফিসে যাবার আর সময় পাব কখন? খোকনকে তৈরি হয়ে নেবার জন্যে আয়াকে বলে দিলাম। তাকে জামা-প্যান্ট পরানো হল।

রিটা বললে, কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

আমি বললাম সব। পুলিস চায় যে খোকন কোর্টে গিয়ে দাঁড়াবে। যদি ম্যাজিস্ট্রেট ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চায় তো তখন জেরা করবে।

রিটা বললে, কিন্তু খোকন এই তো সবে এখন অসুখ থেকে উঠেছে, এখন কি অত স্ট্রেন সহ্য করতে পারবে?

বললাম, সঙ্গে ডাক্তারও থাকবে, কোনও অসুবিধে হলে দেখার জন্যে তাকেও যেতে বলেছি।

রিটা বললে, তাহ'লে আমিও সঙ্গে যাব।

আমি বললাম, তা চল, তুমিও না হয় চল।

রিটাও তৈরি হয়ে নিতে চলে গেল। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতেও কিছু সময় লাগল। ডাক্তারকেও টেলিফোনে সোজা কোর্টে চলে যেতে বললাম।

যখন কোর্টে গিয়ে হাজির হলাম, দেখি তখন মামলা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ভেতরে লোকে লোকারণ্য। অনেকেই দেখতে এসেছে।

উকিল জেরা করছে ছেলেটাকে—তুমি কোথায় থাকো ?

—নেবুবাগানে।

—তাহ'লে তুমি দেবব্রত সেনকে চিনলে কী করে ?

ছেলেটা বললে, আমি তো রাস্তায় ভিক্ষে করি. আমি সব জায়গাতেই ভিক্ষে করতে যাই। কিন্তু ওই ইস্কুলের ছেলেটা একদিন আমাকে ডাকলে। জিজ্ঞেস করলে, তুমি মাণিককে চেনো ? আমি বললাম, চিনি। তাই জন্যে ও আমার সঙ্গে আমাদের নেবুবাগানে এল।

—তারপর ?

—তারপর আমাদের পাড়ার মাণিককে দেখে বললে, এ সে নয়, সে তার বন্ধু, অন্য মাণিক।

উকিল জিজ্ঞেস করলে, তারপর ? তারপর তুমি ওকে ইস্কুলে পৌঁছিয়ে দিলে না কেন ?

ছেলেটা বললে, ও যে যেতে চাইলে না। আমি অনেকবার বলেছি ওকে বাড়ি যেতে, কিন্তু ও বাড়ি যাবে না, ময়রাডাঙার যাবে।

—ময়রাডাঙায় কেন ?

ছেলেটা বললে, ময়রাডাঙায় ওর মাসি থাকে, সেখানেই যেতে চেয়েছিল সে। কিন্তু আমি তো ময়রাডাঙা চিনি না।

—কেন, ময়রাডাঙায় ওর কে থাকে ?

ছেলেটা বললে, ও বলেছে ময়রাডাঙায় ওর মাসি থাকে।

—কিন্তু মা ? মা কোথায় থাকে ?

ছেলেটা বললে, মা'কে ও মোটে ভালবাসে না।

—কেন ?

ছেলেটা বললে, খোকন বলেছে ওর কলকাতার মা হল মাম্মি, মা নয়।

আমি রিটার দিকে চেয়ে দেখলাম। রিটা করে তখন একদৃষ্টে চেয়ে আছে ছেলেটার দিকে। উকিল আবার জিজ্ঞেস করলে, তারপর যখন তোমাদের বাড়িতে রইল, তখন ও খেলো কোথায় ? শুলো কোথায় ?

ছেলেটা বললে, আমাদের নেবুবাগানের বস্তির পাশে একটা নতুন বাড়ি হয়েছিল। একজন ভদ্রলোকের বাড়ি। সেই বাড়িতে একটা ঝি ছিল।

আমি একটু চমকে উঠে সোজা হয়ে বসলাম। আমার একপাশে ডাক্তার

বসেছিল। ডাক্তারও শুনছিল মামলার হিয়ারিং।

আমি উকিলকে জিজ্ঞেস করলাম, আর কতক্ষণ চলবে ?

উকিল বললে, আর বেশিক্ষণ নয়, আজকে এই সাক্ষীর জেরার পরই মামলার দিন পড়বে।

খোকন এতক্ষণ কী দেখছিল, কী শুনছিল, জানি না। সে হঠাৎ বললে, ওকে ওরা ধরেছে কেন ?

আমি বললাম, ওই ছেলেটাই তোমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল ?

খোকন বললে, হ্যাঁ, ও যে বলেছিল ওদের পাড়ায় মাণিক থাকে।

আমি বললাম, মাণিকের সঙ্গে দেখা করবার এত লোভ তোমার কেন ? সে তোমার কী করেছে ?

খোকন বললে, সে যে বলেছিল আমাকে মাসির কাছে নিয়ে যাবে।

আমি বললাম, তুমি মাসির কাছে যেতে চাও বুঝি ?

খোকন হেসে বললে, হ্যাঁ।

আমি বললাম, কেন, মাসির কাছে তুমি যেতে চাইছ কেন ? মাসির কি এ-রকম আমাদের মত বাড়ি আছে ? মাসির কাছে কি এ-রকম মাছ-মাংস খেতে পেতে ? মাসি কি এ-রকম শার্ট-প্যাণ্ট পরতে দিত ?

খোকন চুপ করে রইল।

আমি বললাম, বলো, আমার কথার উত্তর দাও ?

খোকন শেষকালে বলল, মাসি যে আমায় খুব ভালবাসত।

বললাম, আর আমরা বুঝি তোময় ভালবাসি না ?

খোকন বললে, আর তোমরা যে আমাকে পিয়ানো দাও না, মাসি যে আমাকে পিয়ানো দিয়েছিল।

বললাম, তা এখন তো তোমাকে আমি পিয়ানো দিয়েছি ?

খোকন বললে, হ্যাঁ, এখন আমি তোমাকে ভালবাসব।

বললাম, এখন তো তুমি আর মাসির কাছে যেতে যাইবে না ?

খোকন আমার মুখের দিকে অসহায়ের মত চেয়ে রইল, কোনও উত্তর দিলে না। আমি তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, তুমি কিছু ভেবো না, আমিই তোমাকে মাসির কাছে নিয়ে যাব।

খোকন মুখের ভাবখানা এমন করল যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। বললে, তুমি নিয়ে যাবে ?

বললাম, হ্যাঁ, নিয়ে যাব।

খুব আস্তে-আস্তে কথা বলছিলাম আমরা। হঠাৎ কোর্ট বন্ধ হয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বন্ধ করে ভেতরে চলে গেল। প্রথম আসামীকে গাড়িতে

তুলে নিয়ে চলে গেল। প্রথম দিনের কোর্টের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা চলে এলাম। গাড়িতে রিটা বললে, সেই ঝি-টার এভিডেন্স কবে নেবে?

বললাম, পরে আবার দিন পড়বে।

রিটা বললে, কিন্তু সে মেয়েটা কে?

আমি বললাম আমাকে তো ও-সি বলেছে কলকাতায় এ-রকম অনেক মেয়ে পিক্‌-পকেট এসে জুটেছে। তারা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা চুরি করে, বাসে ট্রামে ভদ্রঘরের মহিলা সেজে ঘুরে বেড়ায়। ওই নরসিংহম, আমার ডেপুটি বলছিল, তার বাড়িতে একটা মেয়ে রান্না-বান্না করতো, তাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে।

* * *

সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে নরসিংহম আমার বাড়ি এল।

রিটাও তখন আমার কাছে বসে ছিল। আমরা তখন চা খাচ্ছি। নরসিংহমকেও চা দিলাম। অফিসের অনেক কাজের কথা ছিল তার সঙ্গে। সঙ্গে। ইউনিয়নের ছেলেরা ব্যালট্ নিচ্ছে স্ট্রাইকের জন্যে। যদি সত্যি-সত্যিই স্ট্রাইক হয়, তাহ'লে আমাদের অফিস থেকে কী-কী স্টেপ্ নেওয়া দরকার, সেই ব্যবস্থার কথাই বলছিল নরসিংহম।

নরসিংহমের হাতেই ছিল আমার অফিসের এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনের ভার। অফিসের এসটাবলিশমেন্টের দিকটা দেখা বড় শক্ত কাজ ডাক্তার অফিস একটা মেসিনের মত! মেসিন চলে বটে, কিন্তু যতক্ষণ মেসিন চলে, ততক্ষণ তার প্রত্যেকটা পার্টসের দিকে মেসিনম্যানকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ না হলে মেসিন বন্ধ হয়ে যায়।

আমার গ্রীয়ারসন কোম্পানীর সেই মেসিনম্যান ছিল নরসিংহম। এ-সব আলোচনা অফিসের মধ্যে হয় না। তাতে স্টাফের মধ্যে জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা। সেইজন্যেই তাকে বাড়িতে আসতে বলেছিলাম।

কাজের কথা হয়ে যাবার পর সে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ রিটা বললে, মিস্টার নরসিংহম, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি।

নরসিংহম দাঁড়িয়ে উঠেছিল, আবার বসল। বললে, বলুন মিসেস সেন।

রিটা বললে, আপনার বাড়ির মেড্‌সার্ভেন্টকে নাকি পুলিশে এ্যারেষ্ট্‌ করে নিয়ে গেছে?

নরসিংহম বললে, হ্যাঁ, দেখুন না, সে খুব ভাল কাজ করছিল। কিন্তু আমি তো বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকতে পারতাম না। আমার স্ত্রী থাকত নার্সিংহোমে আর আমি থাকতাম অফিসে। কিন্তু সে-যে এমন একজন অবিশ্বাসী লোক, তা আমি কী করে জানব?

রিটা বললে, কী চুরি করেছিল সে ?

নরসিংহম বললে, আমি তাকে বিশ্বাস করে রেখেছিলাম। চুরি করলেও আমি তো ধরতে পারিনি। কিন্তু পুলিস তাকে এ্যারেস্ট করতে গেল কেন ? নিশ্চয় তার এগেনষ্টে কিছু চার্জ আছে। দেখুন না, আমি পরের দিন লোক্যাল থানায় গিয়েছিলাম, গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন তাকে তারা এ্যারেস্ট করলে। তারা বললে, তার বিরুদ্ধে নাকি সিরিয়াস চার্জ আছে।

একটু থেমে নরসিংহম আবার বললে, তা এর পর আমি আর কী করব বলুন ? পুলিস আমাকে বললে, আজকাল নাকি কলকাতা শহরে এইসব প্রচুর এসেছে। এরা কোনও ভদ্রলোকের বাড়িতে রান্নার কাজ, ঝিয়ের কাজ নেয়। তারপর একদিন চুরি করে পালায়।

রিটা বললে, তা আপনি আগে কিছুই টের পাননি ?

নরসিংহম বললে, আমি তো বাড়িতে থাকতুমই না বলতে গেলে। রাত্রে শুধু বাড়িতে এসে খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতুম। দিনের বেলা সে বাড়িতে কী করত, তা আমি কী করে জানব ? দু'একটা ঘর আমি চাবি-বন্ধ করে যেতুম, কিন্তু ড্রয়িং-রুম, ষ্টোর-রুম, কিচেন, বাথরুম, সবই তো খোলা থাকত।

রিটা বললে, আপনাকে কে দিয়েছিল তাকে ?

নরসিংহম বললে, আমি পাড়ায় নতুন বাড়ি করেছি, পাড়ায় তো কাউকেই এখনও চিনি না। আমার যে ধোপাটা ছিল, কাপড় কাচত, তাকে লোকের কথা বলেছিলাম, সে-ই ওকে দিয়েছিল।

রিটা বললে, সেই ধোপাটা আপনাকে লোক দিলে আর আপনিও তাকে রাখলেন ?

নরসিংহম বললে, কী করব, রাখব না ? আমার যে তখন খুব লোকের দরকার। আমার স্ত্রী হসপিট্যালে, আমার বাড়িতে দেখবার কেউ লোক নেই, দেশে বাবার অসুখ, মা-রও বাবাকে ছেড়ে এখানে আসবার উপায় নেই, কী করব বলুন। বাধ্য হয়ে আমাকে ওই লোককে রাখতে হল।

তারপর একটু থেমে বললে, কিন্তু তবু বলবো মেয়েলোকটি খুব ভাল ছিল। কোনও দিন একটা পয়সা এদিক-ওদিক করেনি, কিন্তু কেন যে ওকে পুলিসে এ্যারেষ্ট করলো বুঝতে পারছি না।

কথাগুলো বলে নরসিংহম বাড়ি চলে গেল। অফিসের ফাইলগুলোও সে নিয়ে গেল তার সঙ্গে। ষ্ট্রাইক হবে অফিসে, সব কাগজপত্র তার কাছে।

নরসিংহম যাবার পর রিটা বললে, আবার কবে তাহ'লে কেসটা উঠবে ?

আমি বললাম, কেস যেদিন উঠুক, থানা থেকে খবর পেয়ে যাব।

কিন্তু আবার যখন খোকনকে স্কুলে পাঠাব, তখন যদি আবার কেউ ওকে

নিয়ে পালিয়ে যায় ?

বললাম, স্কুলে পড়ানো এখন কিছুদিন বন্ধ থাক, বাড়িতে আমি ওর টিচার রেখে দেব।

তা থানার ও-সি দিনকতক পরেই খবর পাঠালে আর কিছুদিন পরেই কেসটা উঠবে। কিন্তু মুশকিল হল কি, আমার কোম্পানীতেও সেইদিন থেকে স্ট্রাইক শুরু হয়ে গেল। আমার স্টাফের অনেকরকম দাবী। মাইনে বাড়াবার দাবী তো ছিলই, তার সঙ্গে ছিল ডাক্তারী সুযোগ-সুবিধে, বোনাস, প্রফিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনশন, হাজারো রকমের দাবীর ফিরিস্তি তাদের।

একদিন-ছ'দিন-তিনদিন ধরে অনেক চেষ্টা হল। ইউনিয়নের লীডারদের সঙ্গে মীটিং চলতে লাগল ফয়শালা করবার জন্যে। কোনও ব্যাপারেই তারা ফয়শালা করতে চায় না। একদিন অফিসের ইউনিয়নের সঙ্গে সারা দিনরাত ধরে মিটিং করেছি, হঠাৎ বাড়ি থেকে আমার ডাক্তারের টেলিফোন এল— স্যার, আপনি এখুনি চলে আসুন, বাড়িতে খুব বিপদ।

আমি চমকে উঠেছি। বললাম, কীসের বিপদ ? কী হয়েছে বলুন।

ডাক্তার বললে, মিসেস সেন খুব অসুস্থ।

আমি তো অবাক। জিজ্ঞেস করলাম, কেন, হঠাৎ অসুস্থ হলেন কেন ?

ডাক্তার বললে, আপনাকে থানার ও-সি কিছু বলেন নি ?

আমি বললাম, না, আমি তো সারাদিন অফিসের স্ট্রাইক মেটাবার চেষ্টা করছিলাম, আমার তো অন্য কোনও ব্যাপারে ভাববার সময় ছিল না। আমার অফিসের টেলিফোন-অপারেটাররাও স্ট্রাইক করেছে—আপনি লাইন পেলেন কী করে ?

ডাক্তার বললে, তাই আমি ও লাইনে অনেক চেষ্টা করেও আপনাকেও পাইনি। আমি এখন তাই ডাইরেক্ট লাইনে পেলাম। আজকে আপনার সেই কেসটার হিয়ারিং ছিল, তা জানেন তো ?

আ'ম বললাম, হ্যাঁ মনে পড়েছে।

ডাক্তার বললে, আপনি থানার ও-সির কাছে গেলেই সব জানতে পারবেন। আজকে আসামী ছাড়া পেয়ে গেছে শুনেছি।

বললাম, ছাড়া পেল কেন ? ছাড়া পেয়ে গেলে তারা আবার আমার ছেলেকে কিডন্যাপড্ করবে।

ডাক্তার বললে, তা জানি না, আপনি বাড়ি ফেরবার সময় থানার ও-সির সঙ্গে একবার দেখা করে কথা বলে আসবেন, আমি আপনার বাড়িতে আছি, মিসেস সেনকে দেখছি।

আমি আর অপেক্ষা করলাম না। নরসিংহমকে বললাম, তুমি অফিসে যা করবার কর, আমি আর অফিসে থাকতে পারব না। আমার বাড়িতে একটা জরুরী কাজ আছে, আমি চললাম।

বলে গাড়িটায় গিয়ে বসলাম। ষ্ট্রাইকাররা তখনও অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু তাদের ঠেলে আমি আমার গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। মদন আমাকে নিয়ে ফুল স্পীড়ে গাড়ি চালিয়ে দিলে।

আমি বললাম, বাড়ি নয়, সোজা থানায় চল।

থানার ও-সি আমাকে দেখে অবাক। ও-সি বললে, স্যার, আপনাকে টেলিফোন করে-করে কিছুতেই পাই না, শেষকালে হাল ছেড়ে দিলাম। ডাইরেক্ট লাইনটা কখনও চলে, আবার কখনও চলেও না।

ও-সি বললে, যাক্‌গে সে-কথা, আমি ছেলেটাকে ছেড়ে দিলাম, পাণিশমেণ্ট দিতে পারলাম না।

কেন ?

ও-সি বললে, যে মেয়েটা চুরি করেছে আপনার ছেলেকে, সে-মেয়েটা তো ওরই মা।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, তার মানে ?

ও-সি বললে, কোর্টে তো মেয়েটা সেই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বললে।

আমি চেয়ারে বসে ছিলাম, উঠে দাঁড়ালাম। উত্তেজনায় তখন আমি থর-থর করে কাঁপছি।

বললাম, আপনি বলছেন কী ? সমস্ত মিথ্যে কথা। আপনার উকিল জেরা করলেন না কেন ? ওর মাসি ও। ও তো নিজে থেকে বোনের ছেলেকে আমার কাছে দিয়ে গেছে। ওর বাপ-মা অনেকদিন আগে মারা গেছে। ওর সঙ্গে ভৈরব আঢ্যি নামে ওদের গ্রামের একজন লোক ছিল। সে এসে ওকে দিয়ে যায় আমার বাড়িতে।

ও-সি বললে—না, ও আপনার ছেলের মা।

আমি চেঁচিয়ে উঠে বললাম, কী বলছেন আপনি ? আপনাদের উকিল এটা ক্রস্‌ করে বার করতে পারলে না ?

ও-সি বললে, আমাদের পুলিস ল'ইয়ার আসামীকে জেরা করছিল। কিন্তু আপনি কি তাকে কোনও দিন একটা সিগারেট-কেস দিয়েছিলেন ?

—সিগারেট-কেস ?

ও-সি বললে, হ্যাঁ একটা সোনার সিগারেট-কেস। তার ওপর গ্রীয়ারসন সাহেবের নাম লেখা আছে। সিগারেট-কেস আপনি না দিলে সে কোথায় পাবে বলুন।

আমার মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কেন কথা বেরোল না। আমি পাথরের মত স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার স্মৃতি-শক্তির ওপর থেকে কে যেন একজন কালো পর্দা সরিয়ে দিলে।

জিজ্ঞেস করলাম, সে এখন কোথায় বলতে পারেন ?

ও-সি বললে, তা-তো বলতে পারব না—কোর্ট থেকে ছাড়া পেয়ে সে কোথায় চলে গেছে জানি না।

বললাম, কিন্তু তাকে তো আমার এখ্‌খুনি পাওয়া দরকার।

আমার মধ্যে তখন আগুন জ্বলছে ডাক্তার। ক'দিন ধরে অফিসের ষ্ট্রাইক নিয়ে তুমুল কাণ্ড চলছে। আমার আর নরসিংহমের দু'জনেরই খুব দুশ্চিন্তা চলছিল তাই নিয়ে। অফিসের স্টাফ্‌রাও যত উত্তেজিত, আমরাও ঠিক ততটা উত্তেজিত, গ্রীয়ারসন কোম্পানীর এতদিনকার ট্রাডিশনটা ভেঙে চুরে তছনছ হয়ে যাবার জোগাড়। তার ওপর এই ব্যক্তিগত পারিবারিক শান্তির প্রশ্ন ? আমি সারাদিন পরিশ্রমের পর কোথায় বাড়িতে গিয়ে বিশ্রামের কোলে এলিয়ে পড়ব, তা নয়, পুলিস-কোর্ট-ডাক্তার নিয়ে ঝামেলা।

তা ছাড়া খারাপ ছিল স্ত্রীর শরীর। মানুষ টাকা উপার্জন করে নিরাপত্তার জন্যে, সংসার করে শান্তি আর আরামের জন্যে। কিন্তু আশ্চর্য আমার কপালে কি সে-সব কিছুই থাকতে নেই। আমি টাকা চেয়েছিলাম, কিন্তু অমন স্ত্রীতো আমি চাইনি। আর এমন স্ত্রীও তো আমি চাইনি, যার দ্বারা আমার কোনও সন্তান হবে না।

মাথা তখন আমার ঘুরছিল। বললাম, কিন্তু কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে আপনি বলতে পারেন ?

ও-সি বললে, আপনি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন সে ঠিকানায়, যে বাড়ি থেকে আমরা তাকে এ্যারেস্ট করেছিলাম, সেই নেবুবাগানের বস্তির পাশের বাড়িটাতে।

জিজ্ঞেস করলাম, ঠিকানাটা কী সে-বাড়ির ?

ও-সি ঠিকানাটা দিলে।

বললাম, এ যে আমার অ্যাসিস্‌টেন্টের বাড়ি, মিস্টার নরসিংহম।

ও-সি বললে, আপনার অ্যাসিস্‌টেন্ট ? তা-তো জানতুম না। ওই বাড়িতেই তো সেই মহিলাটি ঝিয়ের কাজ করত। ওখান থেকেই তো আমি ওকে এ্যারেস্ট করেছিলাম

তারপর আমি আর দাঁড়ালাম না সেখানে ? মদন আমাকে গাড়ি চালিয়ে সোজা নরসিংহমের বাড়ি নিয়ে গেল। নিশ্চয় নরসিংহম এতক্ষণে

তার বাড়িতে এসে গেছে। হয়তো সেও এসে গেছে সেখানে। যাকে পুলিসে গ্রেফতার করেছে, তাকে কে আর বাড়িতে রাখবে? আর তা-ছাড়া নরসিংহম তো বলেই গিয়েছিল যে, তার জায়গায় সে অন্য একজন মহিলাকে পেয়ে গিয়েছে। তাদের স্বজাতি এক বালিগঞ্জের বন্ধু সেই অন্য মহিলাকে দিয়েছিল। এর পরেও কি সেই নরসিংহমের বাড়িতে যাবে?

তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে নরসিংহমের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

মদনকে বললাম দেখ, নরসিংহম সাহেব বাড়িতে এসেছেন কিনা।

মদন গিয়ে নরসিংহমের বাড়ির সদর-দরজার কলিংবেল টিপতেই একজন মহিলা বেরিয়ে এল।

জিজ্ঞেস করলে, কে আপনি? কোত্থেকে এসেছেন?

মদন বললে, নরসিংহম সাহেব অফিস থেকে এসেছেন?

দেখে মনে হল, মহিলাটি বাড়ির নতুন ঝি।

সে বললে, সাহেব তো তখনও আসেন নি।

মদন তাকে বললে, এলে সাহেবকে বলে দেবেন যে সেনসাহেব এসেছিলেন। আমি তাঁর ড্রাইভার। বলে দেবেন তিনি বাড়িতে আসবার সঙ্গে-সঙ্গে যেন একবার সেনসাহেবের বাড়িতে যান। খুব জরুরী দরকার।

মহিলাটি নিঃসন্দেহ হবার জন্যে আবার নামটা জিজ্ঞেস করে নিলে।

—সেনসাহেব?

মদন বললে হ্যাঁ, বলে দেবেন খোদ সেনসাহেব এসেছিলেন। নরসিংহম সাহেব এলেই তাঁকে সেনসাহেবের বাড়িতে যেতে বলবেন। ভুলবেন না।

মহিলাটি বললে, না, ভুলব না।

ওদিকে আমার মনে তখন বাড়ির কথা ঘুর-ঘুর করছিল। ডাক্তার হয়তো এখনও বাড়িতে বসে আছে। রিটার আবার শরীর খারাপ হয়েছে। কোর্টের মধ্যেই সব কিছু শুনে ফেলেছে সে! আসলে কী যে হয়েছে, তা তিনি জানেন না। কে সেই মহিলা? গ্রীয়ারসন সাহেবের সিগারেট-কেস সে কী করে পেলে? কে তাকে দিলে? আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। তাহ'লে সে খোকনের মাসি নয়, মা? তাহ'লে সে মাসি বলে পরিচয় দিয়েছিল?

কোর্টে বসেই খোকন নাকি 'মাসি' 'মাসি' বলে তাকে ডেকেছিল।

মদনকে বললাম, শীগ্‌গির বাড়ি চল মদন, যত তাড়াতাড়ি পারিস, দেরি করবি না মোটে।

নরসিংহমের বাড়ি থেকে আমার বাড়ি বেশি দূর নয়, এক মিনিটের মধ্যেই আমি বাড়ি পৌঁছিয়ে গেলাম।

গিয়ে দেখ লাম, রিটার সে কী চেহারা।

ডাক্তার ব সছিল তার সামনে। ডাক্তার বলছিল, আপনি কেন উত্তেজিত হচ্ছেন মিসেস সেন? আগে মিস্টার সেন আসুন, তিনি কী বলেন বলেন শুনুন, তার পর যা করবার করবেন।

রিটা বলছিল, ও কেন আমাকে এতদিন মিথ্যে কথা বলে এসেছে, তাই আমি আগে শুনতে চাই।

এই সময় আমি সেই ঘরে ঢুকলাম। আমাকে দেখেই রিটা ক্ষেপে উঠল। বললে, এক টা লায়ার কোথাকার, একটা স্কাউণ্ড্রেল, আমাকে এতদিন ব্লাফ্ দিয়ে এ সেছিলে? আমাকে এতদিন বলোনি কেন কিছু?

আমি বললাম, কী হয়েছে কী? কী বলছো তুমি?

রিটা বললে, তুমি এক টা ড্যাম্ লায়ার। কেন তুমি এতদিন আমাকে বলনি যে তুমি একটা মিস ট্রেস রেখেছিলে?

আমি বললাম, তার মা ন?

রিটা বললে, তার মানে তুমি জিজ্ঞেস করো ডাক্তারকে। ডাক্তার আপনি বলুন আজকে কোর্টে যা শুনে এলেন। বলুন আপনি।

ডাক্তারের মুখে কিন্তু তখনও কোন কথা নেই।

রিটা চীৎকার করে উঠল ডা ক্তারের দিকে চেয়ে। বললে, বলুন না ডাক্তার, বলুন। ভয় কি আপনার? কিসের ভয়? কত বড় স্কাউণ্ড্রেল মিস্টার সেন, সেইটে বলুন?

ডাক্তারের মুখে তখনও কোনও কথা নেই। শুধু রিটাকে বলে আপনি আবার একসাইটেড হচ্ছেন মিসে স সেন, আপনি একটু চুপ করুন একটু আস্তে কথা বলুন, পাশের ঘরে খোকা রয়েছে, আয়ারা আছে, তা শুনতে পাবে যে।

রিটা বললে, শুনুক গে, সবাই শুনুক, আমি কি কাউকে ভয় করি আমি সকলের সামনে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলব কত বড় স্কাউণ্ড্রেল এ আপনাদের সেন! একটা বেশ্যাকে রেখেছে আর তার ছেলেকে নিজে বাড়িতে এনেছে। ও বেশ্যার ছেলে, আমি ওকে বাড়ি থেকে দূর করে দে ও আমার কেউ না, আমি ওকে এখুনি রাস্তায় বার করে দেব, আই মাস জানেন ডাক্তার, আমি ওই ছেলের জন্যে কত হাজার-হাজার টাকা খ করেছি, আমি ওর জন্যে কী-ই না করেছি। ওর যখন অসুখ হয়েছি আমি তখন সারারাত ওকে কোলে নিয়ে জেগেছি, আর আজ জা পারলাম ও কিনা ওর মিসট্রেসের ছেলে, ও ওর বেশ্যার ছেলে।

আমি বললাম, এইসব কথা তোমাকে কে বললে? সব মিথ্যে কথ

রিটা যেন আগুন হয়ে জ্বলে উঠল। বললে, সব যদি মিথ্যে কথা হয় তাহ'লে ম্যাজিস্ট্রেট ও-মহিলাটিকে ছেড়ে দিলে কেন? ওকে খালাস করে দিলে কেন? ও কি সব মিথ্যে কথা বললে, বলতে চাও? ও মিথ্যেবাদী না তুমি মিথ্যেবাদী? বল, কে লায়ার? তুমি, না ও?

বললাম, আমি তো কোর্টে ছিলাম না, সে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কী বলেছে, তা আমি কী করে জানব? আমি তো আমার কোম্পানীর লেবার-সিচুয়েশন নিয়ে মীটিং করছিলাম।

রিটা বলে উঠল, তা মীটিং তো করবেই, নইলে কোর্টে গেলে যে তোমাকে সকলের সামনে বেইজ্জৎ হতে হত। সকলের সামনে তোমার নিজের স্ক্যাণ্ডাল যে নিজের কানে শুনতে হত।

আমি বললাম, চুপ করো, চেঁচিও না।

রিটা গলার আওয়াজ আরো চড়িয়ে দিয়ে বললে, কেন চুপ করব? তোমার হুকুমে? তুমি কেলেঙ্কারী করবে আর মনে করেছ আমি তা চেপে যাব? আমি গলা ফাটিয়ে চাকর-ঝি-আয়া-বাবুর্চি সকলকে শুনিয়ে ড্রাম পেটাব। তোমার মর‍্যাল ক্যারেকটার যে কী-রকম, তা সকলকে জানিয়ে তবে আমি চুপ করব, তার আগে নয়।

আমি বললাম, বেয়াদবির একটা সীমা আছে, তুমি দেখছি তাও মানবে না।

রিটা বললে, আমি বেয়াদব না তুমি বেয়াদব? স্কাউণ্ড্রেল, ইডিয়ট, ক্যারেকটারলেস বিস্ট্ কোথাকার! একটা জানোয়ার, পশু তুমি! আমাকে আবার গালাগালি দেওয়া হচ্ছে।

আমি বললাম, প্লিজ রিটা, তুমি চুপ কর, ও-ঘরে খোকন রয়েছে, সব জানতে পারবে।

রিটা বলে উঠল, ও জানতে পারলে আমার কী? ওকে আমি আর এ-বাড়িতে থাকতে দেব ভেবেছ? আমি যাচ্ছি, তাকে এক্ষুণি বাড়ি থেকে রাস্তায় বার করে দিচ্ছি। বলে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে ছুটে গেল।

আমি ডাক্তারের দিকে চেয়ে বললাম, দেখলেন তো ডাক্তার, রিটা কী-রকম একসাইটেড হয়ে উঠেছে অকারণে? কী-রকম চেঁচিয়ে উঠছে?

ডাক্তার বললে, আপনি একটু চুপ করে থাকুন না, আপনি একটু সহ্য করতে পারছেন না?

বললাম, আমি আর কত সহ্য করব বলতে পারেন ডাক্তার। আমিও তো মানুষ! আমারও তো সহ্যের একটা শেষ আছে! আমার মাথার ওপর তিন হাজার লোকের ভাবনা। আমার অফিসে তিন হাজার লোকে স্ট্রাইক-

নোটিস দিয়েছে। আমি তাই নিয়ে ভাবব, না স্ত্রীর পাগলামি সামলাব তাই বলুন।

ডাক্তার বললে, কিন্তু আপনার স্ত্রী তো নরম্যাল নয় মিস্টার সেন, আপনার স্ত্রী তো একজন মেণ্টাল পেশেণ্ট, ওঁর সঙ্গে আপনি ও রকম করে কথা বলেন কেন? একটু মিষ্টি করে কথা বলবেন ওঁর সঙ্গে।

বললাম, আপনি তো বলেই খালাস, আপনার নিজের যদি এ অবস্থা হত, তাহ'লে বুঝতেন কত কষ্ট করে আমাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়েছে। জানেন, আজ ক'বছর ধরে আমি অফিসের কাজ-কর্ম সব আমার ডেপুটির হাতের ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি শুধু রিটাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। কত সময় নষ্ট করেছি বলুন তো ডাক্তার? আর আজকে সেই রিটা আমাকে এই রকম যাচ্ছেতাই গালাগালি দিচ্ছে। আমার অফিসের কেউ হলে আজকে আমাকে আমি তাকে এখুনি স্যাক্ করে দিতুম, তা জানেন?

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে খোকনকে টানতে-টানতে ধরে নিয়ে এল। খোকনকে কান ধরে এক থাপ্পড় মারলে রিটা।

বললে, এক্ষুণি বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যা।

বলে একটা ঠ্যালা দিতেই খোকন পড়ে গেল শ্বেতপাথরের মেঝেতে ওপর। ডাক্তার আর আমি দু'জনেই তাকে ধরতে গেলাম। কিন্তু তার আগেই তার মাথাটা পাথরে লেগে ফেটে গেছে। গল-গল করে রক্ত ঝরতে লাগল মাথা দিয়ে। যন্ত্রণায় ছটফট করে সে কাতর হয়ে কেঁদে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তার তাকে ধরে তুলল।

কিন্তু রিটা তবু তাকে রেহাই দিলে না। ডাক্তারের হাত থেকে তাকে কেড়ে নিয়ে ঠেলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

বললে, মর-মর তুই, মরে যা।

আমি তখুনি গিয়ে রিটার হাতখানা জোরে ধরে ফেললাম।

বললাম, করছ কী? ওকে মেরে ফেলবে নাকি?

রিটাও চোখ বড়-বড় করে বললে, হ্যাঁ, মেরে ফেলব। আমার বাড়িতে আমার চোখের সামনে পরের ছেলেকে আমি থাকতে দেব না। ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও এখুনি।

বললাম, কিন্তু ও যদি মরে যায় তো তখন তুমিই তো খুনের দায়ে পড়বে।

রিটা বললে, আমি ওকে আগে খুন করব, তারপর আমার ফাঁসিই হোক আর যা-ই হোক আমি তার জন্যে কেয়ার করি না। যাও, তুমি রাস্তা ছাড়ো, আমাকে যেতে দাও।

বললাম, না—

—না মানে? তুমি কি আমাকে বোকা পেয়েছ? ভেবেছ আমি কিছু বুঝি না? বলো তুমি কেন এতদিন আমাকে বলোনি যে তোমার একটা ছেলে আছে। বলো, কেন বলো নি? বলো—

আমি বললাম, তোমার এখন মাথার ঠিক নেই, আমি হাজার বললেও তুমি তা বুঝবে না। তুমি আগে ঠাণ্ডা হও, তারপরে তোমাকে সব বুঝিয়ে বলব।

রিটা বললে না, আগে বল ও মহিলাটি কে? হু ইজ্ দ্যাট ব্লাডি ওম্যান?

বললাম, ও কেউ নয়, ও আমার কেউ নয়।

রিটা বললে, তাহ'লে এত এত লোক থাকতে ওর ছেলেটাকেই বা কেন তুমি এ-বাড়িতে নিয়ে এলে? আর কারো ছেলে ছিল না?

বললাম, তুমি ভুল করছ। ও ওর ছেলে নয়, ও ওর বোনপো, ওর বোনের ছেলে।

রিটা বললে, তাহ'লে কোর্টে দাঁড়িয়ে ও কেন নিজের মুখে বললে, যে ও ওরই ছেলে?

আমি বললাম, কোর্টে দাঁড়িয়ে ও কী বলেছে, তা আমি কী করে জানব?

রিটা বললে, নিশ্চয়ই তুমি জানো, সব জেনে তুমি আমাকে মিছে কথা বলছো আর তা যদি না হবে তাহ'লে গ্রীয়ারসন সাহেবের সোনার সিগারেট কেস ওর হাতে গেল কী করে?

আমি বললাম, হয়তো মিস্টার গ্রীয়ারসন দেশে যাবার আগে ওকে নিজেই দিয়ে গেছে।

রিটা বললে না, কখ্খনো না, ও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বলেছে যে তুমি ওকে ওটা দিয়েছ।

আমি বললাম, ও যদি মিথ্যে কথা বলে তো তার জন্যে কি আমি দায়ী?

রিটা বললে, দেখ, আমি অনেক সহ্য করেছি, এবার আর সহ্য করব না। তুমি একদিন পোর্ট কমিশনের ডকে গ্রীয়ারসন কোম্পানীর গোডাউনে টালি-ক্লার্কের কাজ করতে?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

রিটা বললে, গোডাউনের বড়বাবু অটল দে বলে কেউ ছিল?

বললাম, হ্যাঁ ছিল।

রিটা বললে, সেই রিটায়ার্ড বড়বাবু অটল দে নিজে কোর্টে দাঁড়িয়ে আইডেন্টিফাই করে বললে, তুমি যে হোটেলে তখন খেতে, ওই মেয়েটি ছিল সেখানকার মালিকের মেয়ে। সে সব বাবুদের টিফিনের সময় চা এনে দিত

মনে পড়ছে। তুমি গোডাউনে একশো তিরিশ টাকা মাইনে পেতে আর খাওয়ার জন্যে মাসে দিতে একশো টাকা। এবার মনে পড়ছে?

আমি কিছু জবাব দেবার আগেই রিটা আবার বলতে লাগল, কী, চুপ করে আছ যে? মনে পড়ছে?

আমি বললাম, সে যা খুশী বললে, আর তুমি তা-ই বিশ্বাস করলে?

রিটা বললে, আমি বিশ্বাস করবার কে? সে বিশ্বাস করবার কে? যে বিশ্বাস করবার সে-ই বিশ্বাস করলে। সেই ম্যাজিষ্ট্রেটই তার কথা বিশ্বাস করে মামলা ডিসমিস করে দিলে।

আমি আবার জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু রিটা বলে উঠল, আর কথা বলতে হবে না, তুমি একটা লায়ার, একটা স্কাউণ্ড্রেল, একটা বিস্ট, আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যাও তুমি, বেরিয়ে যাও।

বললাম, তুমি চেঁচিও না, ঠাণ্ডা হও, চুপ কর।

রিটা বলে উঠল, কেন আমি চুপ করব, কেন আমি চেঁচাব না? তুমি আমাকে ঠকাবে, আর ভেবেছ আমি সব সহ্য করব?

আমি তখন ধৈর্য হারিয়েছি। বললাম, চুপ করতে না পারো তো জাহান্নামে যাও, তুমি আমার সামনে থেকে দূরই হও।

রিটা বললে, ও, এই কথা? ঠিক আছে, আমিই তোমার সামনে থেকে চলে যাচ্ছি, আমি তোমার সামনে থেকে দূরই হয়ে যাচ্ছি।

বলে কাঁদতে-কাঁদতে তার নিজের ঘরের মধ্যে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলে।

ডাক্তার ততক্ষণে খোকনের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। খোকনের কান্না একটু থেমেছে। আমি তাকে আদর করে আয়ার হাতে দিলাম। সে বেচারা ছেলেমানুষ। সে বলতে গেলে কিছুই বুঝলে না। তাকে নিয়ে আমার সংসারে যে কত বড় বিপর্যয় ঘটে গেল এই ক'দিনের মধ্যে, তা বোধ-হয় পুরোপুরি জানতেও পারলে না।

আমি তখন নিজেকে নিয়ে বড় বিব্রত।

ডাক্তার বললেন, মিস্টার সেন আমি তাহ'লে এখন যাই।

বললাম, আপনি যাবেন ডাক্তার?

ডাক্তার বললেন, এখন আমি আর থেকে কী করব? মিসেস সেন তো রাগ করে চলে গেলেন। ওঁকে ডেকে একটু শান্ত করবেন। আবার যদি সেই রকম আগেকার মত মেলান্‌কোলিয়া হয় তো এবার আমি আর বাঁচাতে পারব না।

আমি বললাম, ওই মেলান্‌কোলিয়া রোগটা কেন হয় ডাক্তার?

ডাক্তার বললেন, অনেক সময় মেয়েদের সন্তান না হলেও হয়, আবার বেশী টাকা, বেশী আরাম থাকলেও হয়। এর চেয়ে যাদের টাকার অভাব আছে. যারা টাকা উপায়ের জন্য হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটে, তাদের এ-সব রোগ হয় না। আপনার স্ত্রীর কোনও কাজ করতে হয় না, নিজেকে এক গ্লাস জল গড়িয়েও খেতে হয় না, তার জন্যেই এই রোগ হয়েছে তার। এটা আসলে বর্তমান সভ্যতারই রোগ একটা। আপনি একটু চোখে-চোখে রাখবেন ওঁকে, ওঁকে আরো কম্প্যানি দেবেন, সঙ্গ দেবেন।

আমি বললাম, এতদিন তো তাই-ই করে এসেছি ডাক্তার, স্ত্রীর জন্যে আমার নিজের ব্যবসার দিকটাও আমি দেখিনি।

ডাক্তার বললেন, সেটা তো ভালই করেছেন, কিন্তু যে ঘটনাটা আজ ঘটে·গেল, তারপর আমাকে সে ব্যাপারে আরো বেশি কেয়ারফুল হতে হবে।

বলে ডাক্তার উঠে চলে গেলেন। ভাবছিলাম, কী করব? আমি সমস্ত জীবনটা পরিক্রমা করতে লাগলাম। ভাবলাম, আমি যা চেয়েছিলাম, তা কি আমি পেয়েছি? নাকি, আমি যা পেয়েছি তা আমি চেয়েছিলাম। তখন মনে হল, তুচ্ছ বলে আমি যা চাইনি তাই পেলেই বোধহয় আমি খুশি হতে পারতুম।

কিন্তু সে-সব কথা ভাববার আর আমার সময় নেই। চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে উঠে গিয়ে তখন আমি এমন এক মানসিক অবস্থার মধ্যে বাস করছি, যা আমার কল্পনার মধ্যেও ছিল না। একদিন তো প্রচুর টাকাই আমি চেয়েছিলাম ডাক্তার। আমি সংসার চাইনি, স্ত্রী চাইনি ছেলেও চাইনি। কিন্তু সেই টাকাই যে আমার এতবড় সর্বনাশ করবে কে জেনেছিল? মনে-মনে ভগবানকেও বললাম, ভগবান আমি তোমার কাছে টাকা চেয়েছিলাম স্বীকার করি। কিন্তু তা বলে এত কোটি-কোটি টাকা? এত টাকা না থাকলে হয়তো আমার স্ত্রীকে একটু পরিশ্রম করতে হত। তাকে ঘর ঝাঁট দিতে হত, বাটনা বাটতে হত, রান্না করতে হত। ঘর ঝাঁট দিয়ে বাটনা বেটে রান্না করে এত ক্লান্ত থাকত যে, আর বাজে ভাবনা করবার সময় পেত না সে, ঘুমের জন্যে তাকে আয়াকে দিয়ে আর পা টেপাতেও হত না।

কিন্তু এখন আমি কী করব?

রিটার ঘরের সামনে গিয়ে দরজা ঠেলতে লাগলাম, রিটা দরজা খোল, কথা শোন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

কিন্তু ভেতর থেকে আগের মতই কোন সাড়া-শব্দ এল না। আমার সমস্ত আমি'টা তখন ভেতরে-ভেতরে ছট্‌ফট্ করতে শুরু করেছে। ডাক্তার, জানি না তুমি আমার সেই মনের অবস্থা বুঝতে পারবে কিনা, কিন্তু তবু

তোমাকে বলি আমি সেই বাড়ির এয়ারে-কণ্ডিশন করা ঘরে বসেই দর-দর করে ঘামতে লাগলাম।

হঠাৎ ঘরে ঢুকল নরসিংহম।

ঢুকে বললে, স্যার, আপনি আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন ?

বললাম, হ্যাঁ, দেখ নরসিংহম, আমি অফিসের কোন কাজের কথা বলতে তোমার বাড়িতে যাইনি। আমি গিয়েছিলাম অন্য একটি জরুরী কাজে।

নরসিংহম বললে, আমিও তাই শুনলাম। আমার বাড়িতে যে ঝিটাকে পুলিস ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সে আজ ছাড়া পেয়েছে জেলহাজত থেকে। শুনলাম, সেই নাকি আপনার ছেলেকে চুরি করেছিল। আমি তো তা জানতাম না। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই সে আবার আমার বাড়িতে এসেছে। সে সব কথা আমি তার মুখেই সব শুনলাম এখন।

আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সে কোথায় বলো তো নরসিংহম ? তোমার বাড়িতে গেলে এখন তার সঙ্গে দেখা হবে ?

নরসিংহম বললে, আমি তো তার মুখে সব শুনে তাকে সঙ্গে করে এখানে এনেছি স্যার।

আমি চমকে উঠলাম, কই ? কোথায় সে ?

নরসিংহম বললে, আপনাকে উঠতে হবে না, আমি তাকে এখানে ডেকে আনছি।

আমি কিন্তু আর থাকতে পারলাম না। নরসিংহম-এর সঙ্গে আমিও বাইরের ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখি মুখখানা আগাগোড়া ঘোমটায় ঢেকে মেয়েটি অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

নরসিংহম তার কাছে গিয়ে বললে, এই সেনসাহেব এসেছেন, ইনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান মাসি।

কথাটা শুনে মেয়েটি মাথার ঘোমটা আরো নীচে নামিয়ে দিলে। কিন্তু কোন কথা বললে না।

নরসিংহম বললে, কথা বল মাসি, সেনসাহেব তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।

আমি বললাম, শোন, তোমার নামটা কী বল তো ?

মেয়েটি কোনও কথা না বলে চুপ করে রইল।

নরসিংহম বললে, বল না, কী নাম তোমার বল ?

মেয়েটি বললে, সবাই 'মাসি' বলে ডাকে আমাকে।

বললাম, মাসি বলে তো ডাকে, কিন্তু তোমার নাম তো কিছু একটা আছে, তোমার বাপ-মায়ের দেওয়া নামটি কী তাই বল।

এর জবাবে মেয়েটি কিছুই বললে না।

বললাম, কই, আমার কথার জবাব দাও।

মেয়েটি হঠাৎ আমার পায়ের ওপর বসে পড়ে হু-হু করে কাঁদতে লাগল। পায়ে মাথা ঠেকিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগল, আমায় আপনি দয়া করে ছেড়ে দিন।

বললাম, এ তো মহা মুশকিল হলো দেখছি! অতো কাঁদছ কেন? তোমার কি হয়েছে? পুলিস তো তোমায় ছেড়ে দিয়েছে।

মেয়েটা তবু কাঁদতে লাগল। সে কান্না তার আর কিছুতেই থামে না। বললাম, কাঁদছ কেন? তুমি করেছোটা কী? তুমি তো কোনও দোষ করনি, তাহ'লে কেন মিছিমিছি কাঁদছ?

মেয়েটি তবু কিছু বললে না। তেমনি একনাগাড়ে কেঁদে যেতে লাগল। বলতে লাগল, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন। আমি আর জীবনে কখনও আপনার কাছে আসব না, খোকনকেও আর দেখতে চাইব না। ওকে খুব দেখতে ইচ্ছে করতো তাই এই বাবুর বাড়িতে আমি ঝিয়ের চাকরি নিয়েছিলাম।

নরসিংহম বললে, খোকন কে তোমার?

মেয়েটা বললে, আমার বোনপো।

বললাম, না মিছে কথা বোল না, কাল তুমি কোর্টে হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে হলফ্‌নামা করে বলে এসেছ যে খোকন তোমার ছেলে।

নরসিংহমও কথাটা শুনে চমকে উঠেছে। বললে, সে কী, ও কোর্টে গিয়ে ওই কথা বলেছে নাকি? তাহ'লে তো বড় অন্যায় করেছে। তুমি কী করে বলতে গেলে খোকন তোমার ছেলে?

মেয়েটি সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, আপনি দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। আমাদের পাড়ার ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্যেই ওই সব কথা বলতে হয়েছে আমাকে। আপনার কোনও ক্ষতি করতে আমি চাইনি। আমি ওই কথা না বললে ওকেও জেলে পুরতো পুলিস।

বললাম, তুমি জানো তোমাকে খুঁজতে আমি ময়রাডাঙায় একবার গিয়েছিলাম, গিয়ে শুনলাম, সেই ভৈরব আঢ্যি নাকি মারা গিয়েছে। আর তোমার কথা জিজ্ঞেস করতে সবাই বললে তুমি নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছ। তা তুমি যে কলকাতায় আমার বাড়ির পাশে নরসিংহম-সাহেবের বাড়িতে চাকরি নিয়েছিলে, তা-তো আমি জানতাম না।

নরসিংহম বললে, আমার বাড়িতে যে ধোপা কাপড় কাচে, সে-ই ওকে আমাকে দিয়েছিল। আমি প্রায়ই দেখতাম ও বাড়ির ছাদে উঠে আপনার বাড়ির দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখত।

আমি জিজ্ঞেস করতাম—ওদিকে চেয়ে কী দেখছ ? ও সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে চলে যেত !

একটু থেমে নরসিংহম আবার বললে, আমার বাড়ির ড্রয়িং রুমে আপনার একটা অয়েলপেন্টিং ছবি টাঙানো আছে, আপনি দেখেছেন ? সেই ছবির দিকে চেয়ে ও প্রায়ই নমস্কার করত আমি দেখেছি, আমাকে দেখলেই ও পালিয়ে যেত। আমি এতদিন ভেবে-ভেবে বুঝতেই পারতাম না, কেন মাসি ও-রকম করে ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ছাদ থেকে আমার বাড়ির দিকে চেয়ে দেখতে কেন ?

মেয়েটি বললে, খোকনকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছে হত, তাই। আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন, আমি আর কোনদিন খোকনকে দেখতে চাইব না। আমি খোকনকে ভুলে যাব, বরাবরের জন্যে ভুলে যেতে চেষ্টা করব।

বললাম, না, তা তোমাকে করতে হবে না। তুমি অটল দে-কে চিনতে ? অটল দে বলে কাউকে চেনো? পোর্ট কমিশনের গোডাউনের যে বড়বাবু ছিল ?

মেয়েটি ঘাড় নাড়লে। বললে, হ্যাঁ, আজ তাকে অনেকদিন পরে দেখলাম।

বললাম, ভূতির মাকে তুমি চিনতে ? যে আমাদের চা-বিস্কুট দিত।

মেয়েটা মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

বললাম, আর তার মেয়ে নির্মলা ?

মেয়েটি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

আমি বললাম, কথার জবাব দাও, নির্মলাকে তুমি চিনতে ?

মেয়েটি এবার কাঁদতে লাগল।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, কী হল, কথার জবাব দিচ্ছ না যে, বল তুমি নির্মলাকে চিনতে কিনা ?

হঠাৎ খোকন দৌড়তে-দৌড়তে ঘরে ঢুকে অবাক। মেয়েটিকে দেখেই খোকন তাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলে। বললে, মাসি তুমি এসেছ ? মাসি আজ কোর্টে তোমাকে কত ডাকলাম, তুমি আবার দিকে ফিরেই দেখলে না, এবার আর তোমাকে ছাড়ব না, মাসি আমি তোমার সঙ্গে মরয়াডাঙায় যাব। আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে চল, আমার কলকাতায় থাকতে ভাল লাগছে না। আমি তোমার কাছে থাকব।

* * *

আমি একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলাম সেই দৃশ্য। আমার সব মনে পড়তে লাগল একে-একে। গ্রীয়ারসন সাহেব তখন দেশে ফিরে যাচ্ছে, সাহেবকে ফেয়ারওয়েল দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রীয়ারসন কোম্পানীর সমস্ত স্টাফ,

সেদিন ব্যস্ত। খাওয়া-দাওয়া, ফুল-পাতা, আনন্দ উৎসবের আয়োজন চলছে। লোকে লোকারণ্য চারিদিকে। সমস্ত অফিসময় হৈ-চৈ চলছে। সাহেব লেকচার দিতে উঠেছে। আমি ডায়াসের ওপর একপাশে বসে-বসে অনুষ্ঠান পরিচালনা করছি। এমন সময় গোডাউনের বড়বাবু অটল দে কাছে এল। বললে, স্যার, আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে চায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে ?

অটল দে বললে, একজন মহিলা আর তার মেয়ে।

আমি ভাবলাম, হয়তো কোনও নিমন্ত্রিত অতিথি-অভ্যাগত হবে। তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে দেখি ময়লা কাপড় পরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ভূতির মা। আর তার পাশে নির্মলা।

আমি তাদের দেখেই বললাম, আরে, তুমি ? তুমি এই অসময়ে ? যাও, যাও, এখন যাও, দেখছ আমি কাজে ব্যস্ত আছি, দেখছ আজকে গ্রীয়ারসন সাহেবের ফেয়ারওয়েল হচ্ছে, সব বড়-বড় সাহেব-মেমসাহেব এসেছে, আর তুমি কিনা এই ময়লা কাপড় পরে এইভাবে এখানে এসেছ ? তোমাদের ঢুকতে দিল কে ?

ভূতির মা বললে, তুমি কিছু মনে করো না বাবা, আমি অনেক বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। এই আমার মেয়ে, তোমার নির্মলা। পোড়ারমুখীর সর্বনাশ হয়েছে। ও গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিল আমি ওকে ধরে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। একমাত্র তুমিই ওকে বাঁচাতে পারো বাবা। তাই আর কোনও রাস্তা না পেয়ে তোমার কাছে ওকে রেখে দিতে এসেছি, একে তুমি এখন তোমার কাছে রাখ বাবা। তারপর তুমি ওকে খুন করেই ফেল আর বাড়িতে ঝি করেই রাখ, আমি আর তা দেখতে আসছি নে।

আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত তখন জ্বলে উঠল।

বললাম, দেখ ভূতির মা, এ-সব কথা এখন আমার শোনবার সময় নেই, তুমি এখন যাও, আর এই একশো টাকা নাও, না-হয় দুশো টাকাই দিচ্ছি কোনও হাসপাতালে গিয়ে ওর পেটের ছেলেকে নষ্ট করিয়ে ফেল। টাকা দিলে কলকাতায় কী-ই না হয়।

ভূতির মা বললে, কিন্তু বাবা, আমি মেয়েমানুষ কলকাতার কী বা জানি, ও-ও ছেলেমানুষ শেষকালে কী করতে কী হয়ে যাবে, ভাল করতে হয়তো মন্দ হয়ে যাবে, তখন ? তার চেয়ে তুমিই ওকে তোমার কাছে রাখ বাবা, আমি একটু নিশ্চিন্ত হই।

আমি বললাম, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি ভূতির মা ? তুমি কী সব যা-তা বলছ, এখন কি আর আমার এ-সব কথা শোনবার সময়

আছে ? তুমি বরং অন্য সময়ে এসো—আর না-হয় আমি কালকেই তোমার ওখানে যাব।

বলে একজন দারোয়ানকে ডেকে বলে দিলাম এদের দু'জনকে একটা ট্যাক্সি করে খিদিরপুর পাঠিয়ে দিতে। সঙ্গে-সঙ্গে ট্যাক্সিভাড়া বাবদ একটা দশ টাকার নোটও ভূতির মা-র হাতে গুঁজে দিলাম।

আর তারপর কতদিন কেটে গেল, কত বছর কেটে গেল, আর কোনও দিন তারাও আমার কাছে আসেনি, আর আমিও তাদের কাছে যায়নি। সেই ঘটনার এত বছর পরে যে আবার কোন ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে তারা আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে, তা আমি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি !

আমার তখনও জ্ঞান ফিরে আসেনি। তখনও আমি সেই অতীতের চক্রের মধ্যেই পরিক্রমা করছিলাম। হঠাৎ আমার বাড়ির মধ্যেই এক হৈ-চৈ শব্দে আমার জ্ঞান ফিরল।

আমার চাকর-ঝি-আয়া সবাই তখন চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে।

একজন খানসামা দৌড়তে-দৌড়তে আমার কাছে এসে হাজির।

বললে, হুজুর, মেমসাহেব ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

আগুন ! আমি চমকে উঠেছি আগুনের কথা শুনে ! সত্যিই তাই, এতক্ষণে খেয়াল হল নাকে যেন কিছু পোড়ার গন্ধ আসছে। রিটার ঘরের কাছে যেতেই জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি ভেতরে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে।

তখনই আমি দরজা ঠেলতে লাগলাম। দরজা খুলল না। তখন ভেতর থেকে খিল-দিয়ে আঁটা। সকলকে বললাম, দরজা ভেঙ্গে ফেলতে।

এক মুহূর্তের মাত্র ব্যাপার। কিন্তু আমার মনে হল যেন এক কল্পারম্ভ-কাল কেটে গেল সেই মজবুত দরজা ভাঙতে। দরজা ভাঙতেই আমি দৌড়ে ভেতরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম রিটার ওপর। চীৎকার করে উঠলাম, রিটা তুমি এ কী করলে ? এ কী করলে তুমি ?

কিন্তু ডাক্তার, তখন সব শেষ। হয়তো আমারও সব শেষ হয়ে গেল সেই সঙ্গে, কিন্তু আমি মরিনি ডাক্তার। আমার যখন জ্ঞান হলো তখন দেখলাম আমি তোমার নার্সিংহোমের কেবিনে শুয়ে।

এবার একবার সিগারেট খেতে পারি ডাক্তার ?

ডাক্তার বললে, না, আপনাকে আমি সব খেতে দিতে পারি, কিন্তু সিগারেট আমি আপনাকে খেতে দেব না মিস্টার সেন। বার্নিং কেসের পর এখনও সব ঘা শুকোয়নি, এখন সিগারেট খেলে আপনার খুব ক্ষতিই হবে।

পলটু সেন বললেন, তাহ'লে তুমি যখন বারণ করছো তখন খাব না।

ডাক্তার বললে, সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই তো আপনার

সামনেই রেখে দিয়েছি, ওইটে নিতে পারেন। কিন্তু আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া টানলেই সব সেলাইগুলো ছিঁড়ে যাবে, এখনও ওগুলো কাঁচা আছে।

পলটু সেন বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ তখন আর সিগারেট খাব না। আমার কথাগুলো সব শুনলে তো ডাক্তার? রিটা আগুনে পুড়ে মারা গেল, কিন্তু আমি কেন বেঁচে রইলাম? আমি কেন মরলাম না?

তারপর একটু থেমে পলটু সেন বললেন, কই ডাক্তার, তোমাকে যে বলেছিলাম তোমার জানা-শোনা কোনও লেখক আছে কিনা, তা তুমি তো কোনও লেখক নিয়ে এলে না আমার কাছে? আসলে আমার এই জীবনের কাহিনীটা শুনিয়ে যেতুম।

ডাক্তার বললে, আচ্ছা এইবার একদিন আমার সেই বন্ধুকে নিয়ে আসব আপনার কাছে।

* * *

এবার আমার ডাক্তার বন্ধু গল্প শেষ করলে। বললে, ভাই আজকে তুমি একবার চল নার্সিংহোমে, দেখবে কী অদ্ভুত পেশেণ্ট আমার। তোমাকে নিয়ে যেতেই আমি সব কাজ ফেলে এখন তোমার কাছে এসেছি।

আমি রাজী হলাম। বললাম, আচ্ছা চলো।

বলে জামা কাপড় বদলে নিয়ে তৈরি হয়ে বেরোচ্ছি, হঠাৎ হাসপাতাল থেকে একটা টেলিফোন এল। নার্সিংহোম থেকে আমার ডাক্তার বন্ধুকে টেলিফোন করছে।

খানিকক্ষণ কী কথা হল কে জানে। রিসিভারটা রেখে দিয়ে ডাক্তার বন্ধু বলে উঠল—ভাই সর্বনাশ হয়েছে, পলটু সেন মর-মর, এখ্খুনি যেতে হবে।

বললাম, কী হল? একটু আগেই তো মিস্টার সেন ভাল ছিলেন, এরই মধ্যে আবার কী এমন হল?

ডাক্তার বন্ধু বলল, যা ভয় করেছিলাম তাই। অনেক দিন সিগারেট খেতে দিই নি। এখন আর লোভ সামলাতে না পেরে সিগারেট টেনেছেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে কোলাপ্স্, চল-চল এখুনি যাই।

ডাক্তার বন্ধুর গাড়িতে সোজা তার নার্সিংহোমে গিয়ে পৌঁছলাম। দু'পাশে সার-সার কেবিন। সব কেবিন পেরিয়ে লিফ্‌টে উঠে একেবারে ছ'তলায় গিয়ে পৌঁছলাম দু'জনে। ডাক্তার বন্ধু নার্সিংহোমের মালিক। তাকে দেখতে পেয়ে নার্স-এ্যাসিস্‌টেণ্ট সবাই দৌড়ে এল।

ডাক্তার বন্ধু বললেন, ইনজেকশান দিতে হবে, সব রেডি রাখো।

কেবিনে দরজা খুলে ঢুকেই দেখি অন্য একজন ডাক্তার মিস্টার সেনকে

কোরামিন ইনজেকশান দিচ্ছে। মিস্টার সেন একটু জ্ঞান ফিরে পেলেন। কাকে যেন খুঁজতে লাগলেন চোখ দিয়ে। দেখলেন একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে তাঁর সেই ছেলে খোকন।

নীচু অস্পষ্ট গলায় ডাকলেন, খোকন?

খোকন কাছে গেল। বললে, আমার মাসি কাঁদছে কেন?

মিস্টার সেন বললেন, আর মাসি নয় খোকন, বলো মা-মা বলে ডাকো।

মিস্টার সেন নির্মলাকেও কাছে ডাকলেন। বললেন, আমার কাছে সিঁদুর নেই, কী করে তোমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিই?

কিন্তু আর বেশি কথা মুখ দিয়ে বেরোল না। তার আগেই আবার কাশতে লাগলেন। তারপর সেই কাশতে-কাশতেই এক সময়, চুপ হয়ে গেলেন।

আবার কী একটা ইন্‌জেকশান দিলে আমার বন্ধু। কিন্তু তা আর কোনওকাজে লাগল না। মিস্টার সেনের অনেক সাধ ছিল একজন লেখককে তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখের কড়চা শোনাবেন, কিন্তু তা আর হল না। সে সুযোগ তিনি আর পেলেন না। খানিকক্ষণ পরেই তার জীবনের সব শেষ হয়ে গেল।